পারের কড়ি

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী
মহারাজের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সাধন সঙ্ঘ
৬০, সিমলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের যুক্ত সংস্করণ—

১লা বৈশাখ, ১৩৬৬।

দ্বিতীয় সংস্করণ—ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৭১।

প্রাপ্তিস্থান:

১। শ্রীশ্রীসদ্গুরু সাধন সঙ্ঘ

২। মহেশ লাইব্রেরী

৩। শ্রীগুরু লাইব্রেরী

৪। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং

মুদ্রাকর

শ্রীঅজিতকুমার বসু,

শক্তি প্রেস

২৭।৩ বি, হরিঘোষ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

জটিয়া বাবা

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

(পরমহংস শ্রী ১০০৮ অচ্যুতানন্দ সরস্বতী)

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ-পঞ্চকম্

বামে করে কৃতকমণ্ডলু মূর্দ্ধকায়ং
দক্ষে তথা নিহিত দণ্ডমপেত মায়ম্
শীর্ষে জটাততি বিভূষিতমীশভক্তং
বন্দে যতিং বিজয়কৃষ্ণমকামসক্তম্। ১

প্রত্যাষয়ং কনককান্তি সমিদ্ধ দেহং
পুর্য্যাং নরেন্দ্র সরসীতট-পুণ্য-গেহম্।
ভক্তাবলি-কুশল-সাধনসিদ্ধ-শক্তিং
বন্দে যতিং বিজয়কৃষ্ণমুদীর্ণভক্তিম্। ২

যস্তামিতেন বিদিতেন তপোমহিম্না
শিষ্যত্বমেত্যবহবঃ প্রথিতা গরিম্না।
তং শান্তচিত্তমধিবীর্য্যমুপাত্তযোগং
বন্দে যতিং বিজয়কৃষ্ণমপেত ভোগ্যম্। ৩

যো ভিন্নধর্ম্মমত সারল-সদ্বিচারঃ
তত্ত্বাববোধবিধয়ে হ্যনুপাত্তসারঃ।
প্রাচীন ধর্ম্ম্যনিয়মেষু দধার বুদ্ধিং
বন্দেঽহন্ত তং বিজয়কৃষ্ণমুপেতসিদ্ধিম্। ৪

জয়তি বিজয়কৃষ্ণঃ সংস্মৃতো লুপ্তকৃষ্ণঃ
সকলজগতি নিত্যং ব্যাবতো যস্ত কৃষ্ণঃ।
তমতনু মহিমানং সর্ব্বভূতে সমানং
ভজত বিজয়কৃষ্ণং শান্তয়ে সাবধানম্। ৫

যোগানুগং প্রতিগতা যমযোগমায়ং
শান্তং শিবং তনুমতী ভুবি যোগমায়া।
তস্মৈ নমো নিখিল কামবিবর্জিতায়
দিব্যত্বিষে বিজয়কৃষ্ণ-কলেবরায়।

যোগরত মায়াশূন্য শান্ত শিব নেহারি যাহারে,
দিব্য দেহ করিয়া ধারণ, যোগমায়া করিলা আশ্রয় ;
নিখিল কামনাশূন্য দিব্যদীপ্তি যেই মহাজন বিজয়কৃষ্ণের
রূপে অবতীর্ণ অবনীমণ্ডলে, তাঁরে করি নমস্কার।

শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীকুলদানন্দ-বন্দনম্

পরিহৃত সংসৃতি দূষণগন্ধং
বিজিতদ্বন্দ্বং নির্গতবন্ধম্ ।
প্রতিপদমুপগত পূতচ্ছন্দং
বন্দে শ্রীমৎ কুলদানন্দম্ ।

পাদবিলম্বিত নিবিড় জটালং
চন্দন-পুণ্ড্রক-মণ্ডিত ভালম্ ।
কণ্ঠাসাদিত বহুগুণ মালং
কুলদানন্দং নৌমি বিশালম্ ।

শান্তবিলোচনমুজ্জ্বল রূপং
কামবিমুক্তং যতিগণভূপম্ ।
পদ্মাসনগতমায়তকায়ং
কুলদানন্দং নৌমি বিমায়ম্ ।

গুরুপদসেবালব্ধ বিভূতিং
শৈশবসঞ্চিত বিমলাকৃতিম্ ।
সুস্মিত বদনং জপবিধিনিরতং
বন্দে কুলদানন্দং নিয়তম্ ।

তস্য কৃপাভিঃ সততং ভক্তা
দধতু ক্ষেমং শুভবিধিসক্তাঃ ।
স্বমহিম-দীপ্তঃ কুলদানন্দঃ
স জয়তি লব্ধব্রহ্মানন্দঃ ।

সদ্গুরু প্রশস্তি

হে গুরু গঙ্গানন্দ !
ঘুচাতে কি পারো চির জ্বালাভরা
বন্দী মনের দ্বন্দ্ব ?
খুলে দিতে পারো সহস্র পাশ,
মিটাইতে পারো মুক্তি তিয়াষ ;
ছিঁড়ে দিতে পারো দুঃখ-মোহময়
মায়ার কঠিন বন্ধ ?

হে গুরু গঙ্গানন্দ !
তোমার চিত্ত সহস্র দল
বিকশি ভরেছে গন্ধ !
ভকতি প্রেমের কিরণেতে গলি
নাম-রস সেথা উঠিছে উছলি,
সহস্রধারে ঝরে পরিমল
ঝরিছে পরমানন্দ !

হে গুরু গঙ্গানন্দ !
তোমারি শান্তি বহিছে কি আজি
মলয় মন্দ মন্দ ?
দিনের আলোক আপনা ভুলিয়া,
তোমারি পুলক নিল কি তুলিয়া
তোমারি সুধায় স্নান করি হাসে
আজি কি নিশার চন্দ ?

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ—১৩৬৩

হে গুরু গঙ্গানন্দ !
তোমারি আলোকে ভরিবে কি মোর
এ দুটী নয়ন অন্ধ ?
রূপ হতে জাগি অরূপে পাওয়ার
সীমা হতে চির অসীমে যাওয়ার
বন্ধন হতে মুক্তির পথে
শিখাতে চলার ছন্দ—
সারথি আমার হও মনোরথে
হে গুরু গঙ্গানন্দ !

—বিভাবতী আচার্য্য চৌধুরী

———

জ্বালো দীপ

জ্বালো দীপ, খোলো খোলো দ্বার,
অতুল রহস্য যেই চির অজানার
এনেছ কি সেই ধন অতি সঙ্গোপনে
মনোমঞ্জুষায় ভরি পরম যতনে ?
অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা হতে,—
কত বিশ্ব প্রাণ পায় কালের জগতে,
পুন সে জীবন স্বপ্ন সেথা পায় লয়
পরমাণু রাখে লিখে শেষ পরিচয়।
পারো কিগো জানাইতে তারে,
বহে যে চেতনা-সিন্ধু জড়েরো মাঝারে
তরু পায় শ্যামলতা, ফুলে বর্ণ ফোটে,
শৈবালে শিশিরে তৃণে যে আনন্দ লোটে ?
কাঁদে শুধু অনাহত ভাষা,
তারায় তারায় ফিরে অনন্ত জিজ্ঞাসা,
চিত্ত ওঠে বহু ঊর্দ্ধে স্তর হতে স্তর,
তবু কোথা শেষ প্রশ্ন কোথায় উত্তর ?
ওগো গুরো ! ওগো কর্ণধার !
অগ্নি অভিষেক করি জ্বালো দীপ দীপ্ত প্রতিভার,
ভারতের তপোবনে শিষ্যগণে করো করো দান,
জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি সনে একাসনে দর্শন বিজ্ঞান।

—বিভাবতী আচার্য্য চৌধুরী

॥ শ্রীগুরু প্রশস্তি ॥

*

(১)

হে আমার প্রাণের ঠাকুর :

তুমি আমার আমি তোমার—

ভুবন মাঝে সবই মিছে,

পরম ধন তুমি সবার।

হৃদয়ে মোর অসীম আশা

তাসের ঘরে ভুলের বাসা,

নেশায় মাতি সর্বনাশা

আজি কিছু নেইকো দেবার।

হায়রে কেবল ঘুরে মরি

জীবন-নদীর কূলে কূলে,

অহঙ্কারে আপনহারা

চির আপন তোমায় ভুলে।

তুমিই আমার বরণীয়

আশিসকণা ভিক্ষা দিয়ো—

আমায় কেড়ে নাও গো প্রিয়

সর্বহারা ক'রে এবার।

তুমি আমার—আমি তোমার॥

(২)

হৃদয়ের মাঝে পাতিয়া আসন

সকল বাঁধন টুটি

নয়নের জলে ধোয়াই তোমার

রাতুল চরণ দুটী।

পরাণে মোদের কত না পিয়াসা,

ব্যাকুল বাসনা যত ভালবাসা,

বিরহ দহনে মিলনের আশা

ফুল হয়ে ওঠে ফুটি'।

সকল কালিমা ঘুচে যায় যবে

সেই ফুলে গাঁথি মালা,

সোহাগে দোলাই তব গলে, প্রভু,

ভুলি যত পাপজ্বালা।

ধুয়ে মুছে যাক গুরু অভিমান,

গাহি আজ শুধু তব জয়গান;

অঞ্জলি দিয়া তনু মন-প্রাণ

অভয় চরণে লুটি'।

নয়নের জলে ধোয়াই তোমার

রাতুল চরণ দুটী॥

—সৌরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

॥ নাগপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিভাষণ ॥

২৮।৪।৫৬ তারিখে নাগপুর টাউন হলে প্রবাসী বাঙালীরা এবং স্থানীয় বিশিষ্ট অধিবাসীবৃন্দ ঠাকুর শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। নাগপুর বিধানসভার তৎকালীন সভাপতি পণ্ডিত কুঞ্জীলাল দুবে, প্রধান অতিথি ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এ্যাডভোকেট এম-সাপকাল, ডাঃ মিসেস বলরাজ, মিঃ এম-জি-রাওয়েল, রাষ্ট্রীয় সেবক সঙ্ঘের বীর গোলওয়েলকার, সন্ত তুকড়োজী মহারাজ প্রমুখ সুধীবৃন্দ বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভগবান গোসাঁইজী, নীলকণ্ঠ কুলদানন্দজী এবং গুরুজীর মহিমা ও বিভিন্ন অবদান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। প্রত্যুত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর হিন্দীতে যে অভিভাষণ দান করেন, তার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ—

আমার মত নগণ্য ব্যক্তিকে আপনারা আজ যে সম্মানে ভূষিত করলেন, তা আমার গুরুদেব ও পরম গুরুজীরই প্রাপ্য। এই সভায় আপনারা শত শত ভক্ত নরনারী সমবেত হ'য়ে আমাকে বিচিত্র পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত করলেন, নানাভাবে ফটো তুললেন, কত শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন—এজন্য আমি আপনাদের কাছে সত্যই চিরকৃতজ্ঞ। আমি স্বভাবত নির্জনতাপ্রিয়, লোক সমাবেশ ও সমারোহ গোসাঁইজীর আদর্শেই সযত্নে এড়িয়ে চলি; তথাপি আমার প্রিয় শিষ্য গুমগাঁও মাইনের ম্যানেজার শ্রীলালমোহন পাঠক আমাকে এখানে নিয়ে এসে যে এই লজ্জায় ফেলবেন, তা পূর্বে কল্পনাও করতে পারিনি। তবে আপনাদের এই আয়োজন, শ্রদ্ধানিবেদন সবই সার্থক হবে যদি আমার সাহচর্যের মাধ্যমে পরমগুরু ও গুরুজীর মহান জীবনাদর্শ আপনাদের জীবনে

পথকে সুনিয়ন্ত্রিত করে, উচ্চ আধ্যাত্মিক চরিত্র গঠনে আপনাদের অন্তরে প্রকৃত অনুপ্রেরণা জাগ্রত করে, যদি আপনারা সকলে সুনাগরিক রূপে দেশ ও দশের সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেন।

মারাঠী ভাষায় লিখিত গোসাঁইজীর জীবনী এবং শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থগুলির হিন্দী অনুবাদ পাঠে আপনারা যে আমার পরমগুরুজীর অমূল্য উপদেশাবলী নিজ নিজ জীবনে রূপায়িত করবার জন্যে এত সচেষ্ট, তা দেখে অভিভূত হৃদয়ে আমি আপনাদের সকলের চরণে দণ্ডবৎ জানাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গোসাঁইজী ও ব্রহ্মচারিজীর অপূর্ব জীবনবেদ সকল দিক দিয়ে আপনাদের আদর্শ জীবনগঠনে অনুপ্রাণিত করবে এবং সবাই ধর্মপথে অগ্রসর হ'লে সামাজিক, রাষ্ট্রনীতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল প্রকার সমস্যারই সমাধান সহজতর হবে। দেশের সর্ববিধ অবনতি ও জাতীয় অধঃপতনে তাঁদের অমৃতবাণী আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক—সেই বাণী-সম্ভারের মর্মকথা বুঝতে হ'লে সর্বপ্রথমে উপলব্ধি করতে হবে তাঁদের জীবনাদর্শ ও দিগদর্শন। শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতার মহাবাণী অনুযায়ী দেশে যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান দেখা দেয়, তখন দুষ্কৃতের বিনাশ ও সাধুদের পরিত্রাণ ক'রে ধর্ম সংস্থাপনের তাগিদেই যুগে যুগে অবতীর্ণ হন স্বয়ং ভগবান। এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান যখন প্রভু বিজয়কৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হন, তখন অধ্যাত্ম ভারতের শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কীরূপ ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল এবং বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাবের ফলে কীভাবে ধর্মভূমি ভারতবর্ষে আবার শ্রীভগবানের কৃপাবর্ষণের ফলে ধর্ম সংস্থাপন সম্ভবপর হয়েছিল—সেই ইতিবৃত্ত ও লীলামৃতকথা আমাদের বিশেষভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখা একান্ত প্রয়োজন। তবেই আমরা ভগবান বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য ও তাঁর বিচিত্র জীবনবেদ সঠিকভাবে অনুভব করতে পারব।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলিম শাসকদের বিদ্বেষ ও প্রতিকূল আচরণে এবং হিন্দুদের ধর্ম-আচরণ ও শক্তি-সাধনার অভাবে ভারতের ধর্মক্ষেত্রে দেখা দেয় মর্মান্তিক গ্লানি, শোচনীয় অধঃপতন। সেই দারুণ দুর্দিনে ভারতের ভাগ্যগগনে পতিতপাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জ্যোতির্ময় আবির্ভাব—তাঁর উন্নত-রসোজ্জ্বল ভাববন্যায় প্লাবিত হয় আসমুদ্র-হিমাচল। তাঁর গভীর মনীষা ও প্রেমভক্তিতে, অপূর্ব তিতিক্ষা ও ত্যাগ-বৈরাগ্যে মুমূর্ষু জাতির অন্তরাত্মায় সঞ্চারিত হয় নব জাগরণ—মধুর সমন্বয় ও সর্বজনীন মানবপ্রীতির বিপুল প্রভাবে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সারা দেশে স্থাপন করেন মহান ঐক্য। শ্রীমন্ নারায়ণ প্রবর্তিত শাস্ত্রীয় ইষ্টনাম তিনি দান করেন মাত্র সাড়ে তিন জনকে—তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে; কিন্তু অজপা নাম-সাধনের পক্ষে দেশ তখনও প্রস্তুত হয়নি ব'লে তিনি প্রবর্তন করেন তারকব্রহ্ম হরিনাম 'হরে কৃষ্ণ…হরে রাম…'; নিত্যানন্দ প্রভুর সহযোগে মহাপ্রভু মনমাতান নাম-সংকীর্তন প্রচার করে এবং আচণ্ডালে আলিঙ্গন দিয়ে সুমহান প্রেমধর্মে আলোড়িত ও উদ্দীপিত করেন নিখিল ভারত।

মহাপ্রভুর তিরোধানের পর ধীরে ধীরে ভারত-গগনে আবার নেমে আসে ঘনঘোর অন্ধকার। ভেদাভেদ ও হিংসাদ্বন্দ্বে, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকদের অনাচার ব্যভিচারে অধঃপতিত হয় হিন্দু-সমাজ—জড়তা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন হয় সনাতন ধর্মশাস্ত্র। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ আমলে দেখা দেয় আরো সর্বনাশ—স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণের সঙ্গে সঙ্গে তারা হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মর্মমূলে কুঠারাঘাত করে। বৈদেশিক অপপ্রচারে বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয় সারা দেশ—লক্ষ লক্ষ অবহেলিত হিন্দু গ্রহণ করতে থাকে খ্রীষ্টান ধর্ম, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজও পাশ্চাত্য প্রভাবে হ'য়ে ওঠে স্বধর্মবিমুখ ও লালসামত্ত। এক কথায়, হিন্দু-সমাজে ও ধর্মশাস্ত্রে দেখা দেয় নিদারুণ গ্লানি, ব্যাপক অধর্মের প্রাবল্যে উপস্থিত হয় সারা ভারতের

নাভিশ্বাস। সেই নিদারুণ দুর্দিনে ভারতের মর্যাদা রক্ষার জন্যে সচেতন হয়ে ওঠেন মহাত্মা রামমোহন, সংস্কারের পথে এগিয়ে আসেন বিদ্যাসাগর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। কিন্তু সর্বনাশা বৈদেশিক অপপ্রচার প্রতিরোধ ক'রে স্বধর্ম রক্ষা ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য পুনরুদ্ধারের জন্যে উনবিংশ শতকে জীবন পণ করে রুখে দাঁড়ান প্রথম বিপ্লবী বিজয়কৃষ্ণ।

মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে নীলাচলে যাত্রা করেন, তখন তাঁর পথরোধ করেন অদ্বৈতাচার্য—দেশের কল্যাণের জন্যে তাঁকে শান্তিপুরে থেকে সাধনা করতে সকাতর প্রার্থনা করেন। পুরুষোত্তমের প্রবল আকর্ষণে মহাপ্রভু তবুও নীলাচলে রওনা হ'লে অদ্বৈত প্রভু সাশ্রুনেত্রে বলেন: সারা দেশকে কাঁদিয়ে তুমি যখন চললে, তখন এই শান্তিপুরে আমারই দশম বংশে তোমাকে আবার অবতীর্ণ হতে হবে। ·· স্মিতহাস্যে সে-কথায় সম্মতি দান করেন ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ।··· চারিশত বছর পরে ধর্মভূমি ভারতের চরম দুর্দিনে দেখা দিল সেই পরম শুভক্ষণ। অদ্বৈত প্রভুর আকুল প্রার্থনায় যেমন শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব, তেমনি অদ্বৈতাচার্যের নবম বংশধর আনন্দকিশোরের বিহ্বল ব্যাকুলতায় এবার ভগবান বিজয়কৃষ্ণের অবতরণ। আনন্দকিশোর সাষ্টাঙ্গ দিতে দিতে পুরীধামে গিয়ে ধ্যানমগ্ন হ'লে ৺জগন্নাথদেব প্রত্যাদেশ করেন: তুই ঘরে ফিরে যা—আমি তোর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করব।··· আনন্দকিশোর ঘরে ফিরলে অচিরে ঝুলন পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে কচুবন আলো করে আবির্ভূত হন অদ্বৈত প্রভুর দশম বংশধর নবগৌরাঙ্গ বিজয়কৃষ্ণ। এটা যে শুধু ভাবের বা কল্পনার কথা নয়, আবির্ভাব থেকেই তিরোভাব পর্যন্ত তাঁর দিব্য জীবনের পরিক্রমায় বহু বিচিত্র ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিশেষত, নীলকণ্ঠ মহাদেবের মত কলিযুগে কলিকলুষ নাশ ও আকণ্ঠ হলাহল পান ক'রে কৃপামৃত পরিবেশনের জন্যই যাঁর আবির্ভাব, সেই বিজয়কৃষ্ণের জন্ম-লগ্নেই বিষগ্রহণ, ৺শ্যামসুন্দরের সাথে তাঁর অপ্রাকৃত মধুর লীলা, তপোবন

সদৃশ গেণ্ডারিয়া আশ্রমে তাঁর জটাশীর্ষে সর্পরাজের অবস্থান, গেণ্ডারিয়ার আম্রবৃক্ষ হ'তে মধু বর্ষণ, মহাপ্রভুর ন্যায় তাঁর উদ্দণ্ড নৃত্য ও কীর্তন নিনাদে স্থাবরজঙ্গমের মহাভাব, নীলাচলে আবার সজ্ঞানে সুতীব্র বিষপান করেই জগন্নাথদেবের মাঝে বিলীন হ'য়ে তাঁর লীলা সংবরণ—এমনি বহু নিদর্শন ও স্বর্গীয় লীলামৃত-কথাই নবগৌরাঙ্গ রূপে তাঁর আবির্ভাবের পক্ষে অকাট্য যুক্তি ও সাক্ষ্য প্রদান করে।

দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ক'রে সনাতন ধর্মরক্ষার যে প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই ভগবান গোসাঁইজীর অবতরণ, সেই কাজ শুরু হয় তাঁর বাল্যকাল থেকেই। জমিদারের হুকুমে পাইকেরা যখন টাকা আদায়ের জন্যে দুস্থ প্রজাকে ধরাশায়ী করে গলায় বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে, তখন বালক বিজয়কৃষ্ণ তীব্র প্রতিবাদ ক'রে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লে অত্যাচারীর চৈতন্য হয়। অন্ধকার রাত্রে নৌকায় ডাকাত পড়লে নির্ভীক বিজয়কৃষ্ণের সস্নেহ আহ্বানে ডাকাত-সর্দার দুলাল চিরদিনের মত ডাকাতি ছেড়ে দেয়। কিশোর বিজয়কৃষ্ণ দুষ্টের দমনের জন্য দুর্নীতি নিবারণী সংঘ গঠন করেন—আবার আর্তের সেবা করেন এবং গঙ্গায় মেয়েদের পৃথক স্নানের ঘাট তৈরী করে দেন। মেডিকেল কলেজে পড়বার সময় অধ্যক্ষ চিবার্স সাহেব একটি ছাত্রকে চুরি করার মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করলে বৈদেশিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ছাত্রনেতা বিজয়কৃষ্ণ—সদলবলে ধর্মঘট করে সবকিছু নিবেদন করেন বিদ্যাসাগরের কাছে; বিদ্যাসাগরের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত অধ্যক্ষ সাহেবকে ক্ষমাভিক্ষা করতে হয়। এরপর, সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদেই গোস্বামী সন্তান হয়েও এবং বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি যোগদান করেন ব্রাহ্মসমাজে—খ্রীষ্টান মিশনারীদের জঘন্য অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মির্জাপুর ষ্ট্রীটের রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতার মাধ্যমে প্রথমে জানান সক্রিয় তীব্র প্রতিবাদ। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে অর্ধাহারে অনাহারে দুঃসহ দুঃখকষ্ট

সহ্য করে এবং দুর্লঙ্ঘ্য বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক রূপে যুগাচার্য বিজয়কৃষ্ণ সারা বাঙ্‌লা তথা নিখিল ভারতে প্রচার করেন ভারতীয় সত্যধর্ম, বেদ-উপনিষদের অভ্রান্ত শাস্ত্রবাণী—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রমুখ সহকর্মীদের সাহচর্যে ঘুমন্ত, বিভ্রান্ত, স্বধর্মবিমুখ দেশবাসীর অন্তরাত্মায় নবজাগরণ ও আত্মমর্যাদা সঞ্চারিত করেন—জড়, কূপমণ্ডুক ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে উদভ্রান্ত জাতিকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে প্রচার করেন গীতার মহাবাণী: "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।..." আচার্য বিজয়কৃষ্ণের সেই কম্বুকণ্ঠের সিংহনিনাদে টনক নড়ে বিলাতের পাদ্রী সাহেবদের—তাঁরা একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে অবিলম্বে ভারতে পাঠালে এলাহাবাদে বিজয়কৃষ্ণ ধর্ম সম্পর্কে তাঁকে ছয়টি প্রশ্ন করেন; কিন্তু তাঁর একটারও জবাব দিতে না পেরে স্তম্ভিত বিস্ময়ে শির নত করে পাদ্রী সাহেব। এইভাবে বৈদেশিক অপপ্রচার খর্ব করে আত্মবিস্মৃত জাতিকে স্বাজাত্যবোধে উদ্‌বুদ্ধ করেন বিজয়কৃষ্ণ, মুমূর্ষু ভারতকে স্বধর্মনিষ্ঠায় নবজাগ্রত করেন, মোহমুগ্ধ ধর্মভূমিকে আবার আত্মপ্রতিষ্ঠ করেন সনাতন আদর্শ ও প্রাচ্য সভ্যতার গঙ্গোত্রী ধারার অনুগামী শাস্ত্রসম্মত জীবনচর্যায়।

অতঃপর শুরু হয় বিজয়কৃষ্ণের দিব্য জীবনের অধিকতর মহিমান্বিত লীলাপর্ব। সারা ভারতের বনে পর্বতে তাঁর ব্যাকুল গুরু অন্বেষণ, গয়াধামে আকাশ গঙ্গা পাহাড়ে মানস-সরোবরবাসী সূক্ষ্মদেহী শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর নিকট অপ্রাকৃত দীক্ষালাভ, কাশীধামে পুনরায় উপবীত ও সন্ন্যাস গ্রহণ, জ্বালামুখীতে পঞ্চতপা সাধন ও পরিশেষে অষ্টসিদ্ধি লাভ, ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ ক'রে গেণ্ডারিয়া আশ্রম স্থাপন, সর্বধর্ম-সমন্বয়কারী অপূর্ব বক্তৃতায়, উপদেশে ও অপূর্ব নামকীর্তনে জাতিধর্ম নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রাণেপ্রাণে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও ধর্মভাবের উদ্বোধন—এইভাবে ধাপে ধাপে প্রমূর্ত হয়ে ওঠেন সদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণ। দক্ষিণেশ্বরে তখন নব-নিত্যানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ শাক্ত ও শৈব ধর্মের সমন্বয়ে শিব-শক্তির উপাসনায় আত্মমগ্ন। বিজয়কৃষ্ণ সপরিবারে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হ'লে চমৎকৃত শ্রীরামকৃষ্ণ সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সানন্দে বলেন: তুমি দেখি জনক ঋষির ধর্ম যাজন কচ্ছ। বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাবের অন্যতম তাৎপর্য এইভাবে প্রকাশ করেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। আশ্রমে স্ত্রীপুত্র-কন্যা সহ বাস করলেও আসলে গোস্বাইজী ছিলেন গৃহী-সন্ন্যাসী—দেশবাসীর সম্মুখে তিনি উপস্থাপিত করেন নিজের সুমহান জীবনাদর্শ। তিনি হাতে কলমে দেখিয়ে দেন যে কলিযুগে ভগবৎ ভজনার জন্য নিয়মবহুল যজ্ঞানুষ্ঠান বা কৃচ্ছ্রতা সাধন দূরে থাক, সংসার ত্যাগেরও প্রয়োজন নেই—বরং কামিনী-কাঞ্চনের সংস্পর্শে থেকেও শুধু নামের কৃপায় নামীর কৃপালাভ সম্ভবপর। মহাপ্রভু যে ইষ্টনাম মাত্র সাড়ে তিনজনকে দিয়েছিলেন, নবগৌরাঙ্গ বিজয়কৃষ্ণ মুনিঋষিদের সেই কলিজার ধন, সেই শাস্ত্রীয় মহাশক্তিযুত নামামৃত এবার নির্বিচারে পরিবেশন করেন আচণ্ডালে, হিন্দু-মুসলিম, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সর্ব মানবকে। সকলকে পরম অভয় দিয়ে বলেন: ভগবান শুধু মুখের কথা বা কল্পনা নয়—তাঁকে জানা যায়, দেখা যায়, স্পর্শ করাও যায়।...কিন্তু সেজন্য আর কিছু করতে হবে না, আর কিছুই চাই না—চাই শুধু নাম স্মরণ। চাকরি, ব্যবসা, গৃহস্থালি যার যা পেশা ও নেশা, যার যা প্রারব্ধ সবই করে যাও—শুধু উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে নাম করো,...হেলায় শ্রদ্ধায় যে কোন ভাবে শুচি-অশুচি যে-কোন অবস্থায় যে-কোন স্থানে দিনে-রাতে শুধু নাম মনন কর। না পার, তাতেও ক্ষতি নেই—যতটুকু পার নামের মধ্যদিয়ে নামদাতা ও স্বয়ং নামীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা কর—সময় হলে নাম ও নামী আপনিই কৃপা করবেন। আর সবই যদি তোমরাই করবে তবে আমি আছি কীজন্যে?... তোমরা তো গর্ভস্থ সন্তান—খাবে দাবে আর আনন্দ করবে। জেনো, যদি নরকেও যাও—তবু সেখানেও তোমাদের বুকে ক'রে রাখার একজন আছে।

বস্তুত, কলিযুগে এইটেই হচ্ছে latest prescription—ভগবান গোসাঁইজীর সর্বশেষ ব্যবস্থা ও ভরসার কথা। ধর্মশাস্ত্র, কাব্য-দর্শন, পুরাণ বা ইতিহাসে ঈশ্বর লাভের জন্যে এত সহজ পন্থা আর দেখা যায়নি, পাপী-তাপীদের উদ্ধার কল্পে ভগবানকে আর কোন যুগে এত বড় আশা ও আশ্বাস-বাণী উচ্চারণ করতে শোনা যায়নি,—এমনকি নরকে গিয়েও ভ্রষ্ট ও পতিতদের বুকে ক'রে রাখবার জন্যে অসীম করুণাময়ের এই যে অনন্ত ব্যাকুলতা, আমাদের মত অধমদের পক্ষে এর চেয়ে বড় ভরসার কথা আর কী হ'তে পারে?… গোসাঁইজী আরো বলেন: সাধন ক'রে কিছু হবে না, কারণ ঈশ্বরের কৃপা সর্বদাই অহেতুক—তবুও সাধ্যমত চেষ্টা ও সাধন ক'রে যেতে হবে যাতে কৃপাময়ের অসীম প্রেম ও করুণার মর্যাদা সময়মত আমরা বুঝতে পারি। সেজন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ একমাত্র অভ্রান্ত নিয়ম—অঙ্ক-বিজ্ঞান শিখবার জন্যে যদি গুরুর দরকার হয়, তবে ঈশ্বর-প্রাপ্তির জন্যও গুরুকৃপা অপরিহার্য। অবশ্য, কলিযুগে কলিরাজার প্রভাবে যারা দুর্নীতি ও অধর্মের পথে চলবে আপাতত তারাই সুখী ও সম্পদশালী হবে—আর যারা ধর্মপথে চলবে তাদের ভাগ্যেই জুটবে যত দুঃখ-জ্বালা। কিন্তু যখন বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, মহামারী প্রভৃতি মহাবিপর্যয় দেখা দেবে, পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে মহাপ্রলয়—তখন একমাত্র সদ্‌গুরুআশ্রিত যাঁরা শ্রীনামের কৃপায় তাঁরাই শুধু রক্ষা পাবেন।… কলিতে শ্রীগুরুর শরণাগতি একমাত্র পথ—আর শাস্ত্র ও সদাচার সম্মত পন্থায় নাম স্মরণই জীবের একমাত্র পাথেয়। "হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।…"

শুধু নরনারী নয়—প্রেতাত্মা, কুকুর-বিড়াল, পাখীকেও নামদান করেন গোসাঁইজী। কুম্ভমেলায় গিরি মহারাজ, কাঠিয়া বাবা প্রমুখ মহাত্মাদের কাছে তিনি সদ্‌গুরু অবতার রূপে স্বীকৃতিলাভ করায় হাজার হাজার সাধু সন্ন্যাসী তাঁর কাছে দীক্ষালাভ করে ধন্য হন। প্রেম, অহিংসা ও জীবে

দয়ার নিদর্শন হিসাবে নীলাচলে অপূর্ব সংগ্রাম ক'রে নিষ্ঠুর বানরবধ আইন উচ্ছেদ করেন—আকাশবৃত্তি অবলম্বন ক'রেও দানধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে কপর্দকহীন হ'য়েও প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি দানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এইভাবে কৃপা ও লীলামৃত ধারার বিচিত্র উৎস স্বরূপ তাঁর মহাজীবনে অধর্মের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের মহাব্রত উদযাপন করেন জগদ্গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ। তাঁর বিপুল মহিমা ও জনপ্রিয়তায় জনৈক পাণ্ডা যখন ঈর্ষাবশে মহাপ্রসাদ নামে সুতীব্র বিষের নাড়ু নিয়ে আসে, তখন সর্বজ্ঞ গোসাঁইজী সব জেনেও মহাপ্রসাদের মর্যাদা রক্ষার জন্যই সেই বিষ গ্রহণ ক'রে অচেতন হ'য়ে পড়েন। পরে চৈতন্যোদয় হ'লেও সেই বিষক্রিয়ায় দিনে দিনে তাঁর দেবদেহ অসুস্থ হ'য়ে পড়তে থাকে। সকলের সন্দেহে ক্রমে সত্য প্রকাশ হ'লেও সেই দুর্বৃত্তের নাম কিছুতেই কাউকে বলেন না গোসাঁইজী। মহাত্মা সক্রেটিশ ও যিশুখ্রীষ্ট বাধ্য হ'য়েই শয়তানদের হাতে জীবনদান করেন; কিন্তু সব জেনে শুনেও স্বেচ্ছায় ও অসীম ক্ষমায় গোসাঁইজীর এমনি আত্মদানের দৃষ্টান্ত দুনিয়ার ইতিহাসে অদ্বিতীয়। অল্পদিন পরেই ভগবান বিজয়কৃষ্ণ সজ্ঞানে উপবিষ্ট অবস্থায় লীলা সংবরণ ক'রে বিলীন হ'য়ে যান জগন্নাথদেবের মাঝে। গোসাঁইজীর তিরোধানের পর তাঁর মন্ত্রশিষ্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত ও মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা একএকজন দিক্‌পালরূপে অংশগ্রহণ করেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে—তাঁরা সকলে অগ্রসর হন গোসাঁইজী প্রদর্শিত প্রেম ও অহিংসা, সত্যধর্ম ও স্বাজাত্যবোধের পথেই। গোসাঁইজী ভবিষ্যৎবাণী করেন, অশরীরী ঋষি সমাজের প্রেরণায় ও আশীর্বাদে ধর্মভূমি ভারতের স্বাধীনতা লাভ হবে সত্যনিষ্ঠা ও অহিংসা সংগ্রামের পথে। বিংশ শতকের প্রারম্ভে মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাইকে শ্রীশ্রীসদ্গুরু-সঙ্গ এবং উপহার দেন গোসাঁই-শিষ্য তথা তৎকালীন 'জন' সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা

ও 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক স্বনামধন্য সতীশচন্দ্র। মহাদেব দেশাই সেই গ্রন্থ পাঠ ক'রে শোনালে গোসাঁইজীর বাণীর মধ্যদিয়ে মহাত্মাজী লাভ করেন অপূর্ব প্রেরণা। গোসাঁইজী এইভাবে অলক্ষ্যে থেকেও মহাত্মা গান্ধীর অন্তরে যে শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করেন, এই রহস্য দেশবাসীর কাছে আজো দুর্জ্ঞেয়। এও অনেকে জানেন না যে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর তাঁর নির্দেশে স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরণা লাভ করেন যুগের সদ্‌গুরু গোসাঁইজীর কাছ থেকেই।

সনাতন ধর্ম ও নাম প্রচারের ক্ষেত্রে গোসাঁইজী আপন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে যান তাঁরই মানসপুত্র ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর উপর। এজন্য প্রথম থেকেই তাঁকে নিজহস্তে গ'ড়ে তোলেন গোসাঁইজী—দান করেন আর্য-ঋষির নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত, স্বীয় মানস-দুলালকে শাস্ত্রীয় নীলকণ্ঠ বেশে স্বহস্তে সজ্জিত ক'রে অর্পণ করেন নীলকণ্ঠ মহাব্রত পালনের গুরুভার। পুরীধামে সমুদ্র স্নান কালে ব্রহ্মচারীজি তীব্র স্রোতের টানে বহুদূর চ'লে গেলে গোসাঁইজী বলে ওঠেন: সেকি—ব্রহ্মচারীকে দিয়ে আমার যে অনেক কাজ করাবার আছে।···সেকথা শুনে বরুণদেব ব্রহ্মচারীজিকে ঢেউয়ে ঢেউয়ে কূলে তুলে দিয়ে যান। তিরোধানের প্রাক্কালে গোসাঁইজী শোকাহত স্নেহের দুলালকে বুকে টেনে দান করেন পরম সান্ত্বনা ও গভীর প্রেরণা—গোপনে আপন রহস্য প্রকাশ করে বলেন: আমার এবারে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঘরে ঘরে সদ্‌গুরুর সেবাপূজা প্রতিষ্ঠা করা—জ্বালাময় সংসারে প্রেমধর্ম স্থাপন করা।··· এইভাবে অনন্ত গুরুশক্তি সুযোগ্য আধারে সঞ্চারিত করেন গোস্বামী প্রভু—আর ব্রহ্মচারীজিও সুকঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে গোসাঁইজীর ইঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেন সদ্‌গুরু রূপে। তিনি ছিলেন আজীবন গুরুগতপ্রাণ, ভগবান গোসাঁইজীর ভাবে ভাবিত, নব গৌরাঙ্গের কৃপাশক্তি প্রবাহের উপযুক্ত ধারক ও বাহক। কাজেই ঠাকুর জটাশংকরজীও কোল দেন আচণ্ডালে, পাপী-তাপীর উদ্ধারকল্পে নাম দান করেন নির্বিচারে হাজার হাজার

নরনারীকে, তাঁর মধ্যদিয়ে শ্রীভগবানের কৃপাশক্তি সঞ্চারিত হয় অজস্র ধারায়। গোসাঁইজী প্রদত্ত নীলকণ্ঠ মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে ধর্মবিমুখ মানব সমাজের সমস্ত হলাহল আকণ্ঠ পান করে সবাইকে তিনি দান করেন পরমামৃত, দুঃখী ও পতিতকে দুর্নীতি ও ব্যভিচারের পথ থেকে আকর্ষণ করেন সত্যধর্ম ও প্রেমভক্তির পথে—নিন্দাগ্লানি, অপমান সবকিছু হাসিমুখে বরণ করে আত্মদান করেন শিষ্টের পালনে ও ধর্ম সংস্থাপনে—ঘরে ঘরে সদ্‌গুরু অবতার গোসাঁইজীর সেবাপূজা প্রতিষ্ঠা করে পূর্ণ করেন মহাব্রত।···

নবগৌরাঙ্গ বিজয়কৃষ্ণ ও ভগবান গুরুদেব আজ দেহে নেই—কিন্তু কলিহত জীবের উদ্ধারকল্পে আজিকার ব্যাপক দুর্নীতি, অধর্ম ও স্বেচ্ছাচারের মরুবালিরাশির মধ্যদিয়েও সেই অনন্ত কৃপাশক্তি ফল্গুধারার ন্যায় লক্ষকোটী নরনারীর অন্তরে সঙ্গোপনে আজো সঞ্চারিত ও ক্রিয়াশীল। বিশেষত গোসাঁইজী ভারতের জন্য যে সর্বশেষ ব্যবস্থা, latest prescription দিয়ে গিয়েছেন, ভবরোগীদের শত জ্বালাযন্ত্রণার হাত থেকে সেই অমৃত-রসায়ণ সমানভাবে উদ্ধার করে মনেপ্রাণে পরাশান্তি ও বিমল আনন্দ দান করে চলেছে। শত মোহ-প্রলোভন, হিংসা-হানাহানির মধ্যদিয়ে ভগবান গোসাঁইজীর মহাজীবন দিগদিশারী হ'য়ে আছে—সহস্র দুঃখ-দৈন্য, বিপদ বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে তাঁর প্রদত্ত নামানন্দ ও কৃপাগঙ্গাধারা কোটী কোটী নরনারীকে নবজীবন লাভে উদ্‌বুদ্ধ করছে। বস্তুত, তাঁর দিব্য জীবনের উচ্চাদর্শ ও অমৃত মধুর বাণীসম্ভার সমুদ্রের মতই অসীম, অপার, অচিন্ত্যনীয়—নিজেদের প্রয়োজনে, দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে আমরা তাঁর এতটুকু গণ্ডুষ ভ'রে পান করতে পারি মাত্র। আমার মত অভাজনের পক্ষে আপনাদের কাছে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া, সেই অমৃত সাগরের পরিমাপ করতে যাওয়ার চেষ্টা করা সত্যই বাতুলতা। জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি বলে

এই অধম সেই কৃপাশক্তির বাহক, শতভাগ্য বলে দেশবাসী সেই অমৃত প্রবাহের উত্তরাধিকারী। তাঁর অমূল্য জীবনাদর্শ ও অপার মহিমার মূল্যায়ণ আজো সম্ভব হয় নি, যথাসময়ে ভবিষ্য ভারতে হয়ত সেই রহস্য যথোচিত ভাবে উদ্‌ঘাটিত হবে। এইজন্যে শ্রীঅরবিন্দ বলে গিয়েছেন : "The truth of the future that Bijoykrishna Goswami hid within Himself has not yet been revealed utterly to His disciples." তবু ধর্মই অধ্যাত্ম ভারতের প্রাণ—আমাদের শিক্ষা-সভ্যতা, রাজনীতি-অর্থনীতি যতই ধর্মভিত্তিক হবে, ততই দেখা দেবে ভারতের পরম কল্যাণ। কাজেই গোসাঁইজীর নির্দেশে সমস্ত বিদ্বেষ, ভেদাভেদ ও সংকীর্ণতা ভুলে গিয়ে আমরা যাতে ক'রে সনাতন ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তিতে মধুর প্রেম ও ঐক্যের পথে অগ্রসর হ'তে পারি—পরম করুণাময় ভগবান গোসাঁইজীর কাছে সর্বান্তকরণে সেই প্রার্থনা জানাই।

প্রবাসী বাঙালীরা এই দূরদেশে এসেও বাঙলার সংস্কৃতি আদর্শ ও ঐতিহ্য ভুলে না গিয়ে তার সাথে যে সযত্নে আত্মিক যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলেছেন, আবার প্রকৃত ভারতবাসী হিসাবে আপনাদের সকলের সঙ্গে একাত্মভাবে মিলেমিশে সানন্দে বসবাস কচ্ছেন এবং আপনারাও যে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা ভুলে গিয়ে গভীর প্রেম ও উদারতায় তাঁদের একান্ত আপন করে নিয়েছেন—তা দেখে খুব আনন্দলাভ করলাম। এটা সত্যই বড় ভরসার কথা—সারা দেশে নানা বৈষম্যের মধ্যদিয়েও এমনি মধুর ঐক্য ও সমন্বয় দেখা দিলে তবেই নবজাগ্রত ভারত এগিয়ে যাবে পরম সার্থকতার পথে—মানব সভ্যতার আদি যুগে যে ভারত থেকে প্রথম উচ্চারিত ও প্রচারিত হয় মহা ওঁ-কার ধ্বনি। সেই ভারতের মহান আদর্শ ও মহামিলনের বাণীর ঝঙ্কার তবেই আবার মধুরতর সুরে প্রতিধ্বনিত হবে সারা দুনিয়ার আকাশে বাতাসে, দিগদিগন্তে।

সন্ত তুকড়োজী ধর্মবিষয়ে যে ইঙ্গিত দিলেন, বীর গোলওয়েলকার দেশ সংগঠন সম্পর্কে যা বলেছেন—তা অনুসরণ করলে আপনারা বিশেষ উপকৃত হবেন। আমিও বিভিন্ন বক্তার মুখে যা শুনলাম সেজন্য সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ—সেইসব কথা নিজ জীবনে পালন করবার চেষ্টা অবশ্য করব, কারণ আমি চির-শিক্ষার্থী। একদিন গুরুদেব আমাকে বলেন: যা তোমার উপলব্ধ সত্য নয়, এমন কথা কাউকে বলবে না।" জীবনে উপলব্ধ সত্য বস্তুত কিছুই নেই বলে সেই অবধি আমার মুখ প্রায় বন্ধ, কোন সভায় বক্তৃতাদি করবার কোন যোগ্যতাও আমার নেই। তবু ঠাকুর আমার মুখ দিয়ে যা কিছু প্রকাশ করলেন সে তাঁরই কৃপা—আর আপনারা দয়া ক'রে এমনি সুযোগ দেওয়ায় আমি যে সবার সঙ্গে আমার গুরুজী ও পরম গুরুর উদ্দেশে অন্তরের অনাবিল ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করতে পারলাম, এতক্ষণ ধরে সবাই মিলে যে তাঁদের লীলামৃত-সাগরে অবগাহন করতে পারলাম, সেজন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু-গোসাঁইজী।

———

[১৩৫১ সালে চন্দননগর 'ঠাকুরবাড়ীতে' অনুষ্ঠিত মহাহোম সম্মিলনে স্বীয় গুরুভ্রাতা ও গুরুভগ্নিগণের প্রতি ঠাকুর শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের নিবেদন]

"আয়রে তোরা তপোবনে সাধনকামী আয়রে সব,
শতেক ভায়ের বক্ষমাঝে দেখরে মায়ার পরাভব।
রূপে রসে গন্ধে যে প্রাণ পূর্ণতর এই লগনে,
সরে গেছে আঁধার মায়া আপন মনে সঙ্গোপনে।
তাদের সাথে মিলে মিশে দেখরে চেয়ে নিজের পানে—
তোদের সাথে রয়েছি যে শয়নে বা জাগরণে।
অজয় তোরা, অমর তোরা, তোরা যে মোর সাধন ধন ;
ধরম তরে জন্ম তোদের দেখতে পাবি পরম জন।
জ্বলবে হেথা করম-পোড়া মহাহোমের অনল রাশি,
সফল করে বিফল সাধন সরল করে জটিল নাশি।
অরূপ হেথা পাবে যে রূপ মাধুরী তার মনোলোভা
নিজের মনে দেখতে পাবি বিশ্বরূপের পরম শোভা।"

আশা আকাঙ্ক্ষা, ভয় ভক্তির পর্য্যায় সৃষ্টি ক'রে মহাষ্টমী আবার আমাদের মধ্যে এসে পড়েছে। সেই হোমানল, সেই অগ্নিহোত্রীর দল, ভক্তবৃন্দের সেই আকুল কোলাহল; সেই ভোগরাগ, পূজা আরতি, সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি, সপ্তশতী চণ্ডীর সেই সুমধুর আবৃত্তি সবই আছে—তবু যেন কিছুই নাই। আমরা চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছি সেই নরদেবতাকে—যিনি এই সেবাপূজার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, এই হোমের আগুন জ্বেলে গেছেন। আগুন নিয়ে খেলা করার গুরুভার আমাদের উপর ন্যস্ত করে তিনি মহাপ্রয়াণ করেছেন।

কিন্তু কেন গেলেন তিনি? যাদি'কে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবেসেছিলেন, তাদি'কে অকূলে ভাসিয়ে তিনি অন্তর্হিত হ'লেন কেন? যাঁর হৃদয়ে নিহিত ছিল করুণার প্রস্রবণ, তিনি এমন অকরুণ ভাবে ভক্তদি'কে কাঁদিয়ে গেলেন, এর অর্থ কি? এ কি তাঁর আশীর্ব্বাদ, না অভিসম্পাত?

তাঁর দেহাশ্রিত অবস্থায় যেমন তাঁর মধ্যে কখনও করুণার অভাব লক্ষিত হয় নাই, তাঁর দেহান্তেও তেমনি তাঁর করুণার অপলাপ হয় নাই, বরং আরও ব্যাপকভাবে বর্ষিত হয়েছে। এই মিলন ক্ষেত্রে, আমাদের এই মহাতীর্থে তাঁর সহস্র সহস্র ভক্ত-পরিবেষ্টিত হয়ে ঠাকুর অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন, তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হত। কিন্তু এ বেদনা তাঁর হৃদয়ে ততখানি বাজত না, যতখানি বেদনা তিনি অনুভব করতেন তাঁর ভক্তদের বাসনা অপূর্ণ থেকে যাওয়ার জন্য। একটিবার পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্য সেই আকুল জনস্রোতের ঠেলাঠেলি, একবারমাত্র চোখের দেখা দেখবার জন্য তাদের আকুলিবিকুলি, মাথা গোঁজার মত একটুখানি স্থান সংগ্রহের জন্য তাদের কাকুতিমিনতি স্বচক্ষে এ সব দর্শন করেও তিনি কোনপ্রকার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে উঠতে পারতেন না। আমাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভক্ত, যাঁরা তাঁর আশেপাশে থেকে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর

সেবার সুযোগ লাভ করেছিলেন, ঠাকুরের প্রতি অত্যধিক মমত্ববোধ বশতঃ তাঁরা সাধ্যমত অন্যান্য ভাইদি'কে ঠাকুরের সংস্পর্শ হতে দূরে রেখে তাঁর বিশুদ্ধতা রক্ষা করে চলতে চাইতেন। এই প্রকার আচরণ তাঁদের কাছে মোটেই বিসদৃশ বলে মনে না হ'লেও বঞ্চিত সতীর্থগণের পক্ষে এটা মানসিক ক্ষোভের কারণ হত। অথচ এরাই ছিলেন সংখ্যায় অধিক—ষোল আনার মধ্যে পনের আনা তিন পয়সারও বেশী। কিন্তু যে সকল ভক্ত ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করে নিজেদি'কে আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর শিখরে অধিষ্ঠিত মনে করতেন, তাঁদের আত্মশ্লাঘায় আঘাত করার মত মনোবৃত্তি ঠাকুরের ছিল না। কাজেই যে অবিচার তাঁর চোখের সম্মুখে সংঘটিত হতে দেখতেন তার বিরুদ্ধে অঙ্গুলি উত্তোলন না করে নীরবে তিনি সমস্ত সহ্য করেছিলেন। এই প্রকারে একটা উৎকট অন্তর্বেদনাকে চেপে রাখার ফলে তাঁর দেহ জীর্ণ হয়ে ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগল। অবশেষে অমাবস্যার এক নিদারুণ দুর্য্যোগে তাঁর অমর আত্মা অনন্তের সঙ্গে মিশে গেল।

তিনি একা ছিলেন বলে অগণিত ভক্তকে সেবার সুযোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হ'ত না। এই কারণে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে আকাশে, বাতাসে, প্রত্যেক বিষয়বস্তুতে, জীব জগতের অণুপরমাণুতে তিনি নিজেকে মিশিয়ে দিলেন। কাজেই তাঁর জীবদ্দশায় সেই স্থূল সচল বিগ্রহের সেবাপূজাকেই পরমার্থ ভেবে যাঁরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন, যাঁরা সূক্ষ্ম প্রাণবস্তুর বা আত্মতত্ত্বের সন্ধান রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না, তাঁরা তাঁকে একান্তভাবে হারিয়ে ফেললেন। অপর পক্ষে সেই সকল বঞ্চিত এবং অবাঞ্ছিত ভক্ত যারা সেই জীবন্ত বিগ্রহের সেবাধিকার লাভে অসমর্থ হ'য়ে তাঁর সূক্ষ্ম আত্মবস্তুর ধ্যানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, ঠাকুরের দেহান্তে তারা বিশ্বের সর্ব্বস্থানে তাঁর প্রকাশ অনুভব করলেন।

এইভাবে তিনি সমতা রক্ষা করেছিলেন, এই ভাবে স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন

দিয়ে তিনি ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু এত বড় একটা জীবন আমাদের চোখের সম্মুখে শুকিয়ে ঝরে পড়া সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে আত্মগ্লানি এল না, আমাদের আত্মচৈতন্য জাগ্রত হ'ল না। এখনও আমরা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করে চলেছি। ঠাকুরের জীবদ্দশায় যাদি'কে তাঁর সেবাধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত করেছি, তাঁর অন্তর্দ্ধানের পর তাঁর প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালন অধিকার নিজেদের জন্য কায়েম করে তা'দিকে দূরে রাখার প্রচেষ্টায় আজও আমরা বিরত নই। পদে পদে এর কুফল প্রত্যক্ষ করেও আমাদের মোহ ছুটল না। ভ্রাতৃ-দ্রোহিতার বিষ হ'তে আমরা এখনও মুক্ত হতে পারলাম না।

ঠাকুরের এই মহাহোম প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, একটা কথা খুব সুস্পষ্ট যে, তিনি এই হোমের অনুষ্ঠান দ্বারা আমাদের জীবনকে সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য করার আশা করেছিলেন। নিকৃষ্ট ধাতু মিশ্রিত সোণাকে খাঁটী সোণায় পরিণত করবার জন্য স্বর্ণকার যেমন তাকে আগুনে পুড়িয়ে খাদ বের করে নেয়, ঠাকুর তেমনি আমাদের জীবনকে এই হোমাগ্নির দ্বারা পুড়িয়ে আমাদের সমস্ত গলদ দূর ক'রে আমাদি'কে নির্দ্দোষ ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহাহোমের এই উদ্দেশ্য কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, এই অনুষ্ঠানের ফলে আমাদের জীবন কতখানি বিশুদ্ধ হয়েছে, তার হিসাব নিকাশ করার আজ সময় এসেছে। গতানুগতিকতায় অনুসরণ করে আমরা অন্ধভাবে ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করছি, অথবা গুরুরূপ অগ্নিবৃক্ষের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত নিখিল বিশ্বে গুরুরূপ দর্শন করছি—এইটা ভেবে দেখার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে। ঐ যে গীতায় আছে—ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা।* গুরুর উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদানের কালে যে অবস্থার

হোমের উপকরণসমূহ, হোমাগ্নি, এমন কি হোতা নিজেও গুরুময় হয়ে যায়, অর্থাৎ যে অবস্থায় বিশ্বের সর্ব্ববস্তুতে গুরু দর্শন হয়, সেই অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্ত না হ'লেও আমরা ক্রমশঃ সেদিকে অগ্রসর হচ্ছি কিনা, সেদিকে আমাদিগকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

গভীর পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আমাদের আচরণ এরূপ কোন অগ্রগতির সাক্ষ্য প্রদান করে না। আমাদের ঠাকুর একদিকে যেমন ছিলেন সদ্‌গুরু, অপরদিকে তিনি তেমনি ছিলেন জগদ্‌গুরু। সদ্‌গুরুর বৈশিষ্ট্য এই যে প্রত্যেক শিষ্যের অন্তরে তিনি তাঁর ছাপ এঁকে দেন, প্রতি ভক্ত-হৃদয়ে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। জগদ্‌গুরু হিসাবে আমাদের ঠাকুর জাগতিক প্রত্যেক বস্তুতে এবং প্রতি জীব-হৃদয়ে তাঁর ছাপ অঙ্কিত করেছেন—যদিও প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কৃপা-প্রাপ্ত কয়েক সহস্র ভক্তের হৃদয়ে তাঁর যে ছাপ অঙ্কিত আছে, তা অধিকতর সুস্পষ্ট। আমাদের অনুষ্ঠিত মহাহোমের উদ্দেশ্য যদি সফল হ'ত, তবে গীতোক্ত ব্রহ্মার্পণং মন্ত্র অনুসারে আমরা বিশ্বের সর্ব্বত্র গুরুরূপ দর্শনে সক্ষম হতাম। অন্ততঃ আমাদের সতীর্থগণের অন্তরে তাঁর যে প্রতিকৃতি সুস্পষ্ট এবং গভীরভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে, তা আমাদের দৃষ্টি এড়াত না। কিন্তু নিখিল বিশ্বে গুরুরূপ দর্শন করা দূরে থাকুক, আমরা আমাদের সতীর্থ-গণের মধ্যেও গুরুকে খুঁজে পাই না এবং এই কারণে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ-বিবাদ, ক্ষোভ, হিংসা প্রভৃতির অবসান হয় না।

ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত বলে আমরা নিজেদি'কে জাহির করে থাকি, কিন্তু তিনি যে বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতে অনুস্যূত, তাঁর ক্ষুদ্রতম একটা ভগ্নাংশের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন করে বৃহত্তর জগতের প্রতি উদাসীন হওয়া কেমন করে গুরুনিষ্ঠা নামে আখ্যাত হতে পারে, তা বুঝে ওঠা দুরূহ। এই যে আজ আমরা এখানে গুরুরূপী প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি

প্রদান করছি অথবা এই যে জটাশঙ্কর মূর্ত্তিকে সুচারুরূপে সাজিয়ে পুষ্প-চন্দন দিয়ে পূজা করছি—মূঢ়তার বশবর্ত্তী হয়ে যদি আমরা ধারণা করি যে ঠাকুর শুধু এই আগুনের মধ্যে অথবা ঐ ছবিখানার মধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন এবং এই প্রকার চিন্তার ফলে যদি আমাদের ষোল আনা মন এদের উপর ঢেলে দিয়ে বিশ্বের অপরাপর বিষয়বস্তুর প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব প্রদর্শন করি, তবে আমাদের সংকীর্ণ বুদ্ধি তাঁকে ক্ষোভে, লজ্জায় এবং অপমানে ম্রিয়মান করে তুলবে।

ঠাকুর এখানে আছেন ওখানে নাই, আমার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকেই তিনি প্রাণবন্ত করে তুলেছেন, অপরে যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সজীবতা নাই—ইত্যাদি সংকীর্ণ এবং বিকৃত বুদ্ধির জন্য আমাদের হৃদয়ে কোন প্রকার অনুভূতি জাগে না। বাইরে তাঁর পূজা আরতি হোম যাগ যজ্ঞ করা সত্ত্বেও অন্তরে তাঁকে খুঁজে পাই না। উপনিষদ্ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—"অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে" অর্থাৎ ঠাকুরের পূজা হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও যদি অনুভূতি না জাগে, তবে আমাদের উৎসব বা আনন্দকোলাহল এ সবের কোন অর্থ হয় না। আজ এখানে যে আনন্দের মেলা বসে গেছে, ধর্ম্মের ছাপ মেরে তাকে আমরা ব্রহ্মানন্দ বলে চালাতে চাই, কিন্তু আসলে এটা নাচ গান বা হৈ-চৈ করার আনন্দ অথবা ভোজনানন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ একটা অতি নিম্নস্তরের সাময়িক আনন্দ যার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের কোন সম্পর্ক নাই—যা বাইরে প্রকাশ পায় কিন্তু অন্তর স্পর্শ করে না। ব্রহ্মানন্দ যখন হৃদয় ছাপিয়ে উঠে বাইরে উপচিত হয়, তখনই উৎসবরূপে প্রকাশ পায়—উৎসবের এটাই হ'ল প্রকৃত অর্থ। আমাদের এ উৎসবে ভোজনজনিত রসাস্বাদনের তৃপ্তি আছে, উদরের পূর্ত্তি আছে, অন্য প্রকার আনন্দের হয়ত

অপ্রতুল নাই—কিন্তু প্রাণ এতে পরিতৃপ্ত হয় না, উদর পরিপূর্ণ হলেও হৃদয় শূন্য থেকে যায়।

আমরা কী সারা জীবন এমনি ভাবে কপটতার অভিনয় করব? আমাদের মধ্যে যাঁরা একটু গোঁড়া বা রক্ষণশীল, তাঁরা হয়ত বলবেন—ঠাকুরের কাছে যে পাঠ গ্রহণ করেছি তারই আমরা আবৃত্তি করে চলেছি, এতে কপটতা অকপটতার কোন প্রশ্নই উঠে না। এরূপ আপত্তি যদি কেউ উত্থাপন করেন তাঁর প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই যে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আশ্রয় গ্রহণকালে তিনি আমাদি'কে ক, খ, অথবা প্রথম ভাগ শিক্ষা দিয়াছিলেন বলে, সেই ক, খ অথবা প্রথম ভাগ আবৃত্তি করেই আমাদিগকে জীবনপাত করতে হবে, আমরা অন্য শিক্ষা গ্রহণ করব না—এ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। আমাদি'কে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁহার দেহাশ্রিত অবস্থাতেই তিনি আমাদিগকে নূতন পাঠ দিয়ে গেছেন—তাঁর জীবনান্তেও আমাদি'কে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে দিগ্‌দিগন্ত হতে তাঁর বাণী প্রেরণ করছেন। আমাদি'কে অহরহ সজাগ থাকতে হ'বে—হৃদয় প্রসারিত করে সে শিক্ষা গ্রহণ করতে হ'বে।

ঠাকুরের সে বাণীর মর্ম্ম গীতার সেই মহামন্ত্রের মধ্যদিয়ে ঝঙ্কৃত হচ্ছে। "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব"—এই সংসারটা যেন গুরু বা ব্রহ্মসূত্রে গাঁথা এক মণির মালা। এক ব্রহ্মবস্তু বা গুরু-শক্তি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে নিহিত থেকে আমাদি'কে ধারণ করে না রাখলে আমরা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে কোন্ ঘন অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম, তার কোন সন্ধানই পাওয়া যেত না। অতএব আমাদের অস্তিত্ব যিনি সম্ভবপর করে তুলেছেন, আমাদি'কে যিনি ধারণ করে আছেন, সেই গুরুরূপী ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে—সেই পরম দেবতার চরণে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করে তাঁরই দিকে তাকিয়ে থাকতে হ'বে। আমাদের পূজার অর্ঘ্য, আমাদের সন্ধ্যার প্রদীপ, আমাদের

ক্ষুধার অন্ন, আমাদের পিপাসার জল তাঁকেই নিবেদন করতে হ'বে। আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম, আমাদের সুখদুঃখ, আমাদের মান অপমান, আমাদের জয় পরাজয় তাঁরই উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করতে হ'বে।

এই তাঁর পরম বাণী, এই তাঁর চরম শিক্ষা। এ শিক্ষাকে উপেক্ষা করে আমাদের শিক্ষা যেন উচ্ছিষ্ট-বিচার এবং বাহ্য-শুচিতা মাত্রে পর্য্যবসিত না হয়। নাম প্রাণায়ামে উপযুক্ত সময় নিয়োগ না করে কোন প্রকারে শ্রীচরণে দুটী তুলসী দিয়ে যেন কর্ত্তব্য শেষ না করি। আজিকার এই শুভলগ্নে মহাপ্রকৃতির সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ঠাকুর বাসুদেব যে বাণী প্রেরণ করছেন, তা আমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হোক। ওই হোমানলে, ঐ ব্রহ্মাগ্নির উজ্জ্বল আলোকে নিখিল বিশ্ব আমাদের নিকট সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠুক—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—উপনিষদের এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত সত্য আমাদের মধ্যে প্রতিফলিত হোক। মহাপ্রকৃতির সর্ব্বত্র ঠাকুরের প্রকাশ দর্শন করে আমরা তাঁর শ্রীচরণে শির লুণ্ঠিত করি এবং চণ্ডীর—"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ" মন্ত্রে মহাহোমে আহুতি প্রদান করি।

ওঁ তৎসৎ।

চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে সঙ্ঘ-জননীর তিরোভাব উৎসবে শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ

চন্দননগরের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ভাগীরথীতীরের মনোরম আশ্রম-পরিবেশে অনুষ্ঠিত পুণ্যময়ী শ্রীশ্রীসঙ্ঘজননীর সপ্তবিংশতিতম তিরোভাব-মহোৎসবের মহতী সভায় মাদৃশ অখ্যাত ব্যক্তিকে পৌরোহিত্য করার আহ্বান প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ কি বিবেচনায় দিয়েছেন, তা' আমি জানি না। আমি এজন্য অত্যন্ত লজ্জিত, সঙ্কুচিত। নিজেকে অযোগ্যও মনে করি। তথাপি এ প্রেমের ডাক অনস্বীকার্য্য ছিল। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ তথা সঙ্ঘগুরু ও সঙ্ঘমাতার প্রতি—কেন জানি না—একটা সহজ স্বাভাবিক আকর্ষণ আমি বরাবর অনুভব করি। সম্ভবতঃ আমার পরমগুরু যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের প্রতি সঙ্ঘগুরুর অকপট শ্রদ্ধাই এর হেতু। গোসাঁইজীর কৃপা, তাঁর অস্তিত্ব ও আবির্ভাব সঙ্ঘগুরুর অনুধ্যানে ও প্রত্যক্ষতায় প্রকাশ পেয়েছে, এ কথা তিনি লেখনীমুখে ও বাচনিক অকপট অভিব্যক্তি দিয়েছেন। জীবন, সাধনা ও নীতিগতভাবে কোন সভা-সমিতিতে সভাপতিত্ব করার আমি পক্ষপাতী নহি। তথাপি যে আমি এই আমন্ত্রণ শিরোধার্য্য করেছি, তার কারণ এ অনুষ্ঠানকে আমি ঠিক সাধারণ সভা মনে করিনি। শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবীর মর্ত্ত্য আধারের আশ্রয়ে যে ভাগবতী শক্তির বিশেষ প্রকাশ এবং যে প্রকাশ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সমষ্টিগত জীবনে স্বমহিমায় প্রকট হতে প্রত্যক্ষ করেছি, তারই পূজায় কৃতার্থতা-লাভের আশায় পূজারী হিসাবে শ্রদ্ধাশীল দশ জনের মতই আমিও এখানে সমিৎপাণি হয়ে উপস্থিত হয়েছি। ইহা বস্তুতঃ যজ্ঞোৎসব। এই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সঙ্ঘগুরুর সহধর্ম্মিণীর তিরোভাব-তিথি পালন ব্যক্তি তথা সঙ্ঘগত হলেও, সার্ব্বজনীন। এ আরাধনার অধিকার সকলেরই।

ভাগবতী শক্তির প্রকাশই এই বিশ্ব-চরাচর, কিন্তু তা প্রকট সর্ব্বত্র নহে। যেখানে প্রকট সেখানেই শক্তির প্রত্যক্ষ অনুভব। শ্রীশ্রীচণ্ডী বলেছেন, 'যা দেবী

সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।' সৃষ্টিতে শক্তিসংস্থানের যত রূপ আছে তন্মধ্যে মাতৃভাব ও রূপটাই সবচেয়ে মহামহিমময়ী, গরীয়সী। সর্ব্বভূতে মা বিরাজমানা। যেখানে যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেইখানেই মা। মা-ই সব, সবেতেই মা। আবার মা'তেই সব কিছু—স্থাবর জঙ্গম বিশ্বভুবন—'আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা।' মা—আত্মা। পরমাত্মস্বরূপেও মা। মায়েরই বিবিধ বিচিত্র প্রকাশ এই সৃষ্টি, আবার নিখিল সৃষ্টিকে অতিক্রম করেও অখণ্ড মাতৃত্ব বিদ্যমান। সৃষ্টির আদিতে মা, মধ্যে মা, অন্তে মা। মা আদ্যন্তহীনা, মা অখণ্ডস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি—'ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য।'

তন্ত্রে তাই শক্তিই শেষ তত্ত্ব। আমাদের আগম শাস্ত্রে বলা হয়েছে, এই সর্ব্বধারা সর্ব্বাশ্রয়িণী অখণ্ড শক্তিই চণ্ডী। নিগম শাস্ত্রে বেদের প্রতিপাদ্য শেষ তত্ত্ব পুরুষ। যখন সৃষ্টি ছিল না, কিছুই ছিল না, তখন কী ছিল? নিগম শাস্ত্র বেদ বলেন, পরম ব্রহ্মপুরুষ ছিলেন। এই পুরুষ থেকেই নিখিল সৃষ্টি; বিশ্বভুবন নির্গত হয়েছে। ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি। স্থিরত্বে ব্রহ্ম আর গতিতেও ব্রহ্ম। ব্রহ্মই শক্তি আবার শক্তিই ব্রহ্ম। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা, স্থির সাপটাও সাপ আর গতিমান সাপটাও সাপ। স্থিরত্বে যিনি, গতিতেও তিনি। সক্রিয় ব্রহ্মই শক্তি। বেদের ভাষায় 'পুরুষ এবেদং সর্ব্বং।' ব্রহ্ম ও জগৎ সম্পর্কে অন্তহীন জিজ্ঞাসার শেষ নেই। আদি বেদ ঋগ্বেদ প্রশ্ন করেছেন, "নাসদাসীন্নো সদাসীৎ—অর্থাৎ যখন পৃথিবী আকাশ জল সদসদ্ কিছু ছিল না, তখন কী ছিল? আবার বেদই উত্তর দিয়েছেন, যখন কিছু ছিল না তখনও 'পুরুষ' ছিলেন। কী ভাবে ছিলেন, না 'আসীদিদম্ তমোভূতম্'—তমোভূত ছিলেন সেই 'পুরুষ'। পুরুষের এই অবস্থাকে বলা হয়েছে 'অলক্ষণম্ অপ্রজ্ঞাতম্'। দেখা জানার বাহিরের এই অবস্থা একরকম থাকা-না-থাকারই সামিল। বৌদ্ধাদি শাস্ত্রের মতে ইহাই শূন্যাবস্থা। শক্তিশাস্ত্র তন্ত্রমতে 'জগত্যেকার্ণবী কৃতে' অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কারণার্ণবে লয় হয়েছে যখন, তখন

ব্রহ্মপুরুষ মহাবিষ্ণু অনন্ত শয়নে নিদ্রিত। তাই জগৎও লয়প্রাপ্ত নিদ্রিত। কিন্তু তখনও একজন জেগে আছেন, অন্যথায় সৃজন-কর্ম্মটি সুরু ও সংঘটিত হয় কী করে? পুরুষের সৃজন-কল্পনা আসে কোথা হতে? সৃজনেচ্ছাই বা কেন জাগে? কে জাগায়? ইচ্ছাই তো শক্তিরূপে সৃষ্টির পরতে পরতে অনুস্যূত। পুরুষের মধ্যে এই যে চৈতন্যরূপিণী ইচ্ছাশক্তি তিনিই চির-জাগ্রতা বিনিদ্রা আদ্যাশক্তি। পুরুষ যখন অনন্ত শয়নে মূর্চ্ছিত মোহঘোরাচ্ছন্ন তখন এই আদ্যাশক্তি জেগে থাকেন কী ভাবে না 'হরিনেত্রকৃতালয়াম্'—শ্রীহরি মহাবিষ্ণুর নেত্রকে আশ্রয় করে,' আলয় করে'। ইনিই যোগনিদ্রা। ইনিই মহানিদ্রা মোহনিদ্রা', মহারাত্রি-মোহরাত্রি। এই মহাতামসী দেবীই মহাকালিকা। তত্ত্বনিরূপণের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত এবং তান্ত্রিক ভাষা ও ভাষ্যের বুঝি তুলনা নাই।

এই মহাকালিকা মোহাবরণ সরিয়ে মহাবিষ্ণুকে জাগরণ করান। ইন্দ্রিয়ের আবরণ উন্মোচিত না হলে জাগরণ সম্ভব নয়। এই দেবীই চরাচর বিশ্ব-ভুবনের সব কিছুকে সম্মোহিত করে রেখেছেন—'সংমোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ'। কেন? তাঁর লীলাবৈচিত্র্যের জন্য। তিনি মায়া বিস্তার করে নিজেই মোহিত হয়ে আছেন। তিনিই হাসছেন, কাঁদছেন, সুখভোগ করছেন। ভ্রান্ত হয়ে দুর্ভোগ ভুগছেন, আবার তিনিই ভ্রান্তির অপসারণ করছেন। বস্তুতঃ ইচ্ছা-রূপিণী অঘটনপটিয়সী এই মূলা শক্তির ইচ্ছা না হলে জীবের চৈতন্য জাগে না 'ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ'—তাঁর প্রসন্নতাই জীবের মোহমুক্তির কারণ। সুতরাং জীবের সাধ্য-সাধনা সংক্ষেপে দাঁড়াচ্ছে শক্তির প্রসন্নতা সম্পাদন করা। এই হেতুই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, শক্তি দরজা খুলে না দিলে সত্যের দর্শন মিলে না। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের শ্রীমন্দিরের বেদীগাত্রে লিখিত আছে 'শক্ত্যাং ভগবতি চ শ্রদ্ধা।'

এই মহামাতৃশক্তিকে চিরজাগ্রত ও ক্রিয়াশীল রেখে বাংলা তথা ভারতের প্রকৃত কল্যাণকল্পে ভোলানন্দ গিরি, কাঠিয়াবাবা, গম্ভীরনাথজী প্রভৃতি

মহাপুরুষগণের ইঙ্গিতে বহুপূর্ব্বে ঠাকুর শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ এই চন্দননগর পুণ্যতীর্থে ফটকগোড়া ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে ১৩১৫ সালে মহাষ্টমী তিথিতে সপ্তশতী মহাহোমের প্রবর্ত্তন করেন। এই অনুষ্ঠান এই সুদীর্ঘকাল গভীর নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হচ্ছে এবং সূক্ষ্মভাবে পরবর্ত্তীকালে অনুষ্ঠিত বহু সঙ্ঘ, তথা জাতির প্রাণে শক্তি সঞ্চার করছে।

কেবলমাত্র ভাব্য ভাবনা আর তত্ত্ব বিচারে মন ভরে না। তত্ত্ব ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হলে সাধনযোগ্য হয় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে হলে, তত্ত্বের ঐন্দ্রিয়িক রূপ চাই। ভাবেরই রূপ। শক্তি সর্ব্বব্যাপী হলেও, আধার বিশেষে বিশিষ্ট স্বচ্ছ প্রকাশ দেখা যায়। সার্ব্বভৌম, সর্ব্বজনীন যা তা সার্ব্বভৌম রূপেই শূন্যে ফুটে ওঠে না। দেশ-কাল-পাত্রের আশ্রয়ে রূপ গ্রহণ না করলে তত্ত্ব-প্রকাশটি সম্ভব নয়। তত্ত্বে যা সার্ব্বভৌম, প্রকাশে তাই বিশেষ। সাধকের আরাধ্য বিশেষ হয়েই ব্যাপক হয়, অণু হয়েই মহৎ হয়। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীরাধা-রাণী দেবীও এই হিসাবে সঙ্ঘসন্তানদের কাছে পরমাশক্তিরই মূর্ত্ত প্রতীক। মাতৃ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত তাঁর মৃন্ময় বিগ্রহ নিত্য সেবা-পূজা, ধ্যান ধারণায় জাগ্রত জীবন্ত চিন্ময়ী। এই মাকে কেন্দ্র করেই সঙ্ঘসন্তানগণের আত্মোন্মেষ চলেছে।

মর্ত্ত্য জীবনেও একটা অখণ্ড ভাবেরই ক্রমপ্রকাশ ছিল তাঁর জীবন। বছর গণে' আয়ুর পরিমাপ করে এমন অসাধারণ জীবনকে সীমায়িত করা যায় না। পৃথিবীর হিসাবে মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে তাঁর ইহজীবনের অবসান ঘটে। তিরোভাবের মধ্যদিয়েই সঙ্ঘ-জননীর সত্যিকার পুনরাবির্ভাব ঘটে। এই তিরোভাব উৎসব সঙ্ঘ-সন্তানদের বস্তুতঃ বিজয়োৎসব। মাতৃ-দর্শনে আত্মদর্শনেরই বিজয়াভিযান।

সঙ্ঘজননীর লৌকিক জীবন তেমন তথ্যবহুল বা বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। তাঁর বহিরঙ্গ জীবন আর দশজন সমাজ সংসারের সতী-সাধ্বীরই মত। অন্তরঙ্গ জীবনে ফল্গুধারার মত আত্মনিবেদনের যে সাধনা ও সিদ্ধি ঘটেছিল তাই

তাঁকে দুর্লভ হিন্দু নারীর সতীত্বের মহিমায় স্মরণীয় ও বরণীয় করেছে। সঙ্ঘগুরু প্রণীত 'জীবন-সঙ্গিনী' গ্রন্থ রাধারাণী দেবীরই জীবনবেদ। এই গ্রন্থে তাঁর জীবন ও সাধন সম্বন্ধে অনুপম ভাষায় যে কাহিনী বিবৃত তা সকলেরই পড়া কর্ত্তব্য। পতির জীবনাদর্শ সিদ্ধ করতে পত্নীর আত্মবিসর্জ্জন ও পত্নীত্বের স্বেচ্ছামৃত্যুর যে অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রাধারাণী দেবী রেখে গেছেন, তা পড়তে পড়তে হৃদয় শ্রদ্ধা-বিস্ময়-ভক্তিতে আপ্লুত হয়। পত্নীর মধ্যে সহধর্ম্মিণীর নবজন্ম তথা দাম্পত্যজীবনের রূপান্তরের যে ইঙ্গিত এই গ্রন্থে পাওয়া যায়, তা সমাজ ও গার্হস্থ্য জীবনকে দিব্য সম্বন্ধের পর্য্যায়ে উন্নত করে ধরবার সহায়ক।

এই মহীয়সী নারীকে প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য আমার হয়নি যদিও অন্তরাল হতে তাঁর সেবাস্পর্শ পাবার সুযোগ একটিবার মাত্র আমার হয়েছিল। সঙ্ঘগুরু তথা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতি আমি চিরদিনই মুগ্ধ আর শ্রদ্ধাশীল। সঙ্ঘাদর্শে জীবনগঠনের জন্য আমার কনিষ্ঠ দু'টি ভাই ভুপেন ও উপেনকে আমি এই সঙ্ঘে পাঠাই। দীর্ঘদিন তারা (বিশেষভাবে ভুপেন) এই সঙ্ঘে ছিল। কিশোর ভুপেনের কথিত একটি কাহিনী এখনও আমার স্মরণে আছে। ঘটনাটি এই : 'সারাদিন খাটাখাটুনির পর বেলা গড়িয়ে গেলে সে খেতে বসেছে। ঠাণ্ডা ভাত তিন চারটি তরকারীসহ তাকে দেওয়া হয়েছে। সে শুনেছিল, মধ্যাহ্নে নাকি দশ-বারটা ব্যঞ্জন দিয়ে প্রচুর ভোজন ব্যাপার হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মাথা গরম আর ভাতশুদ্ধ থালা মায়ের প্রতি ছুঁড়ে মারা। রাগ করে ভুপেন গেল উঠে। সংবাদ পেয়ে ক্রোধান্বিত সঙ্ঘগুরু এসে পথ আগলালেন। আঙ্গিনায় ভুপেন তো ভয়ে জড়সড়। এমনি সময়ে সঙ্ঘজননী উভয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। সস্নেহে বললেন, 'ছেলে মায়ের উপর আবদার করবে না তো করবে কে?' তারপর সন্তানের পরিতোষের পুনর্ব্যবস্থা।' পরকে আপন করার এমন হৃদয়টি ছিল বলেই তিনি আজ সঙ্ঘজননী। সঙ্ঘগুরু আদর্শের আহ্বান দিয়ে দেশদেশান্তরের

নানা জাতি-বর্ণ-গোত্রের মানুষকে চন্দননগরের ভাগীরথী তীরে একত্রিত করেছেন, আর গৃহান্তরালে থেকে জননীর হৃদয়-মাধুর্য্যের রসায়ণ তাদের এক করেছে। নিত্যদিনের এমনি জানা-অজানা মায়ের কত যে স্নেহস্পর্শ সঙ্ঘকে সংহত করেছে তার কে ইয়ত্তা করবে? আজিকার প্রবর্ত্তক সঙ্ঘই তার সাক্ষ্য আর সঙ্ঘচিত্তের তলে তলে সেই মাতৃমহিমাই প্রবহমান। সঙ্ঘমায়ের এই কারুণ্যরস শুধু সঙ্ঘেরই আত্মতৃপ্তি নহে, ইহা সকলের জন্যই। দিব্য ভোগের লক্ষণই হচ্ছে 'ত্যক্তেন ভুঞ্জিথাঃ'—বহুকে আলিঙ্গন করেই রসের পূর্ণতা। বিশ্বাস, সাধনা ও সংযমে সঙ্ঘচিত্তে এই মাতৃরস যত উজ্জ্বল অনাবিল হয়ে উঠবে ততই এর অমৃতধারা জগদ্ধিতায় ব্যাপকতর হবে এবং বহুকে সঙ্ঘারাধ্য মায়ের প্রতি একাগ্র করে তুলবে। সবকে আর সর্ব্বোদয়কে কেন্দ্র করে আজকের এই মহোৎসব সঙ্ঘের আত্মিক অভ্যুদয়েরই এক মহনীয় দিগ্দর্শন। ইহা আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করি বলেই নিজের যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার না করে এই মহাযজ্ঞের অংশভাগী হয়েছি। সঙ্ঘত্ব আসলে একটা ভাব। এই ভাবেরই রূপ সঙ্ঘের বহির্বিকাশ। মাতৃঅভিমুখীন এই ভাব যত শুদ্ধ, গাঢ় ও দৃঢ় প্রত্যয়-প্রতিষ্ঠ হবে, ততই সঙ্ঘজননীর জাতিজননী ও বিশ্বজননীতে হবে প্রতিষ্ঠা। সঙ্ঘেরও আত্মিক বিকাশ পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। একথা স্মরণীয় যে কালের কষ্টিতে ঢাকঢোল পিটিয়ে শূন্যগর্ভ প্রচারে কিছুরই স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সন্তানত্বের অগ্নিপরীক্ষা এখানেই। সঙ্ঘ-সন্তানগণ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সামর্থ্য রাখে বলেই আমি প্রত্যাশা করি।

এই প্রসঙ্গে আমার পরম গুরু গোসাঁইজীর একটি সতর্ক বাণী মনে পড়ছে। তাঁর সহধর্ম্মিণী যোগমায়া দেবী দেহরক্ষা করলে ঢাকা-গেণ্ডারিয়া আশ্রমে তাঁর সমাধি-মন্দির ও পটবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। মদীয় গুরুদেব শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী শাস্ত্রমতে পূজা-হোম ইত্যাদি নিখুঁত আহ্নিক

অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এই প্রতিষ্ঠা কার্য্য করেন। প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাপনান্তে গোসাঁইজী ভাবাবেশে সমাধি-মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। জিজ্ঞাসিত হয়ে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় যা বলেন তার মর্ম্মার্থ এই যে, শক্তিকে বাদ দিয়ে সদ্‌গুরু মিলে না। যোগমায়া দেবী ও গোসাঁইজী অভিন্ন। যোগমায়া দেবীকে পেলেই তাঁকেও পাওয়া হবে।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে অনুরূপ দৃষ্টান্তই লক্ষ্যে পড়ে। সাধনার পথ বুঝিবা সর্ব্বত্রই এক। এই সঙ্ঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবী। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখছি, এই অশরীরিণী মাতৃশক্তিই সঙ্ঘের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন। পরিপূর্ণ স্বরূপে মা সচ্চিদানন্দময়ী। একাধারে মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী। সৃষ্টিকর্ম্মে মায়ের এই ত্রিচরিত্রবৈশিষ্ট্যই যুগপৎ লীলায়িত। মাতৃকেন্দ্রিক সাধনা ও সৃষ্টিতে ভয় ও অভয় দুইই বিদ্যমান। পরব্রহ্মস্বরূপের সাধনায় নির্ব্বিকারত্বই মুখ্য। রুদ্রত্ব অর্থাৎ 'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্' গৌণ। মাতৃস্বরূপে আনন্দই সবখানি নয়। তিনি অবিশ্বাসী অন্যায়কারীর কাছে ভ্রূকুটি 'কুটিলাননা।' আবার উৎসর্গীকৃত ভক্তাত্মার নিকট 'স্মেরাননা।' তিনি 'সৌম্যাঽসৌম্যতরা'—ভক্তের নিকট সৌম্যা। আর দুষ্কৃতকারীর কাছে ভীষণতরা রুদ্রা। সাধক তথা প্রতিষ্ঠানকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার জন্যই মায়ের এই কঠোরতা। আমি বিশ্বাস করি, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ নিত্যদিনের সাধনা ও জীবনচর্য্যায় ইহা লক্ষ্য করে' আত্মশোধনের পথেই চলেছে। মায়ের অসীম করুণায় সঙ্ঘের সাধনা জয়যুক্ত হয়ে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বাঙালীর আত্মগঠনের কেন্দ্র হোক, এই শুভেচ্ছা ও প্রার্থনাই আজকের এই বিশেষ মাতৃ স্মরণ-তিথিতে করি। ঐ মায়ের সমাসীনা মাতৃপ্রতিমাকে আমার ভক্তিনম্র ভূ-নত প্রণাম জানিয়ে সমবেত সবাইকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করি। মায়ের আশীর্ব্বাদে সবারই জয় হোক। ওঁ শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

ভূমিকা

'আমি' শরীর প্রাণ মন নহি, আমি অবিনাশী 'জনম-মরণ-ভীতি-ভ্রংশী সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। গীতাতেও পড়ি—'জীর্ণানি বস্ত্রানি বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরানি' প্রভৃতি। কিন্তু তবুও যখন এ-দেহ ছাড়িয়া আত্মার নির্গমনকাল আইসে তখন খুঁজিতে হয় এমন কিছু সম্বল যাহা আশ্রয় করিয়া এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সে দিন মানুষমাত্রেরই আইসে। এমন কেহ নাই যে সহজে ভবনদী পার হইয়া মুক্তিলাভ করে। সকল মানুষই যখন এইরূপ সমস্যার সম্মুখীন তখন ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী তাঁহার অনুরাগী ভক্তবৃন্দকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন সেগুলি নিশ্চয় পারের কড়ি বলিয়া যদি কেহ সঞ্চয় করিয়া রাখে সে অতি সহজে ভবসমুদ্র পার হইতে পারিবে, এই কথা জোর করিয়া বলা যায়।

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ মহারাজ তাঁহার শিষ্য ও ভক্তবৃন্দদের যে কড়ি জোগাইয়াছেন তাহা পারের কড়ি বলিয়া অভিহিত হওয়ারই যোগ্য। তাঁহার প্রণীত এই গ্রন্থে ভক্তির উৎসমূল আবিষ্কৃত হয়। 'পারের কড়ি' গ্রন্থে তাঁহার গুরু শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর কথাই শুধু ব্যক্ত হয় নাই, শ্রীগৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ঋষি-বচনের মত তাঁহার উক্তিগুলি হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারিলে কাণ্ডারীকে 'পারের কড়ি' অবলীলাক্রমে দিয়া আমরা জীবন-সংগ্রাম শেষে ভগবানের অনিন্দ্যিত চরণে আশ্রয় লাভ করিব। তিনি স্বীয় ভক্তবৃন্দকে পত্রযোগে যাহা জানাইয়াছেন, সেইগুলি একত্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়া অনুসন্ধিৎসুর মহদুপকারই সাধিত হইয়াছে।

"শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সাধন সঙ্ঘ" ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দের পত্রাবলী সংগ্রহ করিয়া শুধুই তাঁহার শিষ্যবৃন্দের উপকার সাধিত করেন নাই, পরন্তু যাঁহারা সদ্‌গুরু

সংসর্গের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রতিনিয়ত জীবন-সংগ্রামে সন্ত্রস্ত হইয়া দুর্ভাবনাগ্রস্ত তাঁহাদের হাতে "পারের কড়ি" গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই উপাদেয় অমৃতরূপে গৃহীত হইবে। নানা অবস্থায় নানা ভাবে এই পত্রাবলী লিখিত হইয়াছে। সকল অবস্থার দায় যখন বড় হইয়া ঘাড়ে চাপে তখন যে কোন অবস্থার মানুষই হোক্ না কেন সে যে ইহা হইতে পরম সান্ত্বনা লাভ করিবে ইহা আমি প্রত্যয় করি। সাধকগণই এই পত্রাবলীর সাহায্যে উপকৃত হইবে না, পরন্তু সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর মানুষই এই গ্রন্থের সহায়তা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

ছাত্রগণও এই পুস্তকখানি পাঠে নিজ নিজ নৈতিক চরিত্র গঠনে সমর্থ হইবেন, কেন না ছাত্রজীবনে যে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত রক্ষায় জীবনের উন্নতি নির্ভর করে, সেই অমৃতময় কথাগুলি এই গ্রন্থে অতি সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। "পারের কড়ি" সত্যই ভবপারের কাণ্ডারীর মত জীবন-যুদ্ধের অতি সুস্পষ্ট সহায়রূপেই আমাদের মনকে অতিশয় আনন্দ দিয়াছে। অনেক দুরূহ তত্ত্বের সমাধান-মন্ত্র এই গ্রন্থখানিতে সহজবোধ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরোপকারবৃত্তিপরায়ণ মানুষ যখন উদ্বুদ্ধচিত্তে পরের উপকারে যত্নবান হন তখন "পারের কড়ি" যে অমোঘ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছে তাহা যদি আমরা প্রণিধান করিতে পারি তবে অনেকক্ষেত্রে আমরা পরম সান্ত্বনায় হৃদয়পূর্ণ করিয়া জীবনের জয়যাত্রায় সিদ্ধকাম হইব। তিনি বজ্র কঠোর কণ্ঠে একস্থানে বলিয়াছেন, "এখানে উপকারীকে তার কৃত উপকারের প্রতিদানের কোন প্রশ্ন নাই। কৃতজ্ঞতার কোন বালাই এখানে নাই। ববং তৎপরিবর্ত্তে আছে একটা হৃদয়হীন কৃতঘ্নতা। যাকে আশ্রয় করে কেউ উঠেছে সেই আশ্রয় বৃক্ষের মূলোচ্ছেদই তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।" পরোপকারপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি কি চমৎকার সতর্কতা! নিরহঙ্কার নিরাসক্ত চিত্ত হইয়া পরের উপকার সাধন করা ব্যতীত অন্য

উদ্দেশ্য লইয়া পরোপকার করার প্রবৃত্তি মূলে কি নিষ্ঠুর কুঠারাঘাত রচয়িতা করিয়াছেন তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিবেন। তাঁহার গ্রন্থখানি পাঠ করিলে গুরুর প্রতি অসাধারণ বিশ্বাসের আগুনই জ্বলিয়া উঠে। যেখানে বিশ্বাস মূর্ত্ত সেইখানেই নিষ্ঠার সন্ধান মিলে। তখনই ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয়ে হৃদয় উপচিয়া উঠে। "সদ্‌গুরু সাধন সঙ্ঘের" এই পুস্তকখানি প্রকাশ তাই সার্থক হইয়াছে।

নব্য বাংলার অভ্যুত্থান যুগের অন্যতম যুগস্রষ্টা যুগাচার্য্য গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ মানস-সরোবর-নিবাসী ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর দীক্ষাবীর্য্য বহন করিয়া যে সনাতন ভারতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিলেন তাহাই অভিনব আকৃতি ধরিয়া ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তদীয় শিষ্য ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী তাঁহার অনুরাগী বন্ধুদের যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা সম্বিকৃত করিয়া এই যে প্রকাশের লীলা অবতরিত তাহাতেই বুঝা যায় বাংলার সাধনা অমোঘ ও অব্যর্থ। চণ্ডীদাসের গান নান্নুরে উঠিয়াছিল, তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিয়া প্রেম ও ভক্তির আনন্দে শ্রীগৌরাঙ্গ নব বৃন্দাবন রচনা করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বর শক্তি ও জ্ঞানের তীর্থভূমি এই জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের গঙ্গোত্রীধারায় অবগাহিত হইয়া শান্তিপুরের সিদ্ধ গোঁসাই বংশে সদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাব। শ্রীঅরবিন্দ এই জন্যই বলিয়াছিলেন, "যে বাণী বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে সংগোপিত তাহা এখনও প্রকাশের পথ পায় নাই।"

'সদ্‌গুরু সাধন সঙ্ঘ' এই তত্ত্ব প্রকাশের ভার লওয়ায় আমাদের মনে আশার উদ্রেক হয় বুঝিবা সে দিন আসন্ন হইবে। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে যে তত্ত্ব নিহিত সেই তত্ত্বের পুনরাবিষ্কারে যখন সঙ্ঘ প্রবৃত্ত হইয়াছে তখন এই গভীর তত্ত্ব আর বোধ হয় গোপন থাকিবে না।

উপসংহারে এই কথাই বলিতে চাহি, যদি জাতিকে অধ্যাত্ম জন্ম লইয়া দাঁড়াইতে হয়, ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী যেমন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর সদ্‌গাথা পর পর উপস্থিত করিয়া জাতির জীবনে সদ্‌গুরু সংসর্গের বাণী মন্ত্র দিয়াছেন, তেমনি ভগবৎ প্রসঙ্গ বহুল প্রচারের প্রয়োজন আছে। ইহারই প্রভাবে এই বাঙ্গালী জাতি অবধারিত ধনী হইবে। সে নিজে কীর্ত্তি সম্পন্ন না হইয়া, ভারতের সত্যকেই জয়শ্রীমণ্ডিত করিবে। 'পারের-কড়ি' গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া এই ভাবনাই জাগিয়া উঠে, বুঝি জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনার মুলমন্ত্রই উঠিয়াছে। এই ভিত্তির উপর ভারত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আবার ভারত সংস্কৃতির জয় গান তুলুক, এই প্রার্থনা করি।

শ্রীমতিলাল রায়

মুখবন্ধ

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সাধন সঙ্ঘের বহু মহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে কিছুদিন যাবৎ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারিজীর গভীর জ্ঞানগর্ভ পত্রাবলী সাধারণের কল্যাণকল্পে প্রকাশ ও প্রচার করাও একটী অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে ব্রহ্মচারিজীর বহু সুহৃদ্‌, ভক্ত ও শিষ্যের ঐকান্তিক উৎসাহ থাকিলেও এতাবৎ যে এই মহামূল্য পত্রাবলী প্রকাশিত হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ পত্র-রচয়িতারই ঔদাসীন্য। বড় আনন্দের কথা যে, সকলের আন্তরিক আগ্রহাতিশয্যে ব্রহ্মচারিজী অবশেষে তাঁহার এই পত্রাবলী প্রকাশে সম্মতি দেন। ফলে, অসংখ্য ভক্ত ও শিষ্যকে তিনি সময়ে সময়ে যে সকল পত্র দিয়াছিলেন, তাহা বহু প্রচেষ্টায় সংগৃহীত হইতে থাকে। "পারের কড়ি" ব্রহ্মচারিজী-লিখিত সেই অসংখ্য পত্রের আংশিক সংগ্রহ মাত্র।

এই অমৃতময় পত্রগুলি উত্তর স্বরূপ লিখিত হইলেও, নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে যে-সকল প্রশ্নের উত্তরে এইগুলি রচিত, তাহা আর অবিদিত থাকে না। প্রশ্নগুলি যেন একটীর পর একটি পাঠকের নিকট অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে এবং উত্তরস্বরূপ নামিয়া আসে এই রচনামৃতের স্নিগ্ধশীতল ধারা, যাহার অমিয় মধুর শান্ত স্পর্শে প্রশ্নকর্ত্তারই নয়, পাঠকের অন্তরেও সমূহ তাপ ও জ্বালা নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

এই পৃথিবীর মানুষের অন্তর্দাহেরও যেরূপ শেষ নাই, তাহার মর্মান্তিক প্রশ্নেরও সেইরূপ বিরাম নাই। সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে আজ পর্যন্ত প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসিয়া মানুষের মনকে বিভ্রান্ত, তাহার চিত্তকে মথিত ও বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। মানুষ কোথাও তাহার উত্তর পাইয়াছে, কোথাও

পায় নাই। যেখানে পাইয়াছে, সেখানে সেই উত্তরই প্রশ্ন হইয়া আবার বহু জটীল উত্তরের জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে বহু জটীলতার প্রশ্ন সৃষ্টি করিবার জন্য। তাই মনে হয়, স্বয়ং ধরিত্রী যেন আজ একটী মূর্ত্তিময়ী অনন্ত জিজ্ঞাসা, আর তাহার ক্রোড়ের এই মানব যেন তাহারই দিকে চাহিয়া আছে অপলক নেত্রে একটীমাত্র সমাধান, একটীমাত্র চরম উত্তরের আশায় সৃষ্টির প্রথম প্রত্যুষ হইতে। তাহার সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, তাহাকে আজও দিতে পারে নাই সে সমাধান; তাহার বিজ্ঞান তাহাকে আজও দিতে পারে নাই সে চরম উত্তর, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিয়াই চলিয়াছে তাহার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তি, জ্বালাময়ী সমস্যা ও উদ্বেগ।

কিরূপে পারিবে? মানুষ চিরদিনই চাহিয়া আসিতেছে সুখ, কিন্তু তাহার এই রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, তাহার এই বিজ্ঞান, চিরদিনই তাহাকে চালিত করিতেছে শান্তিলাভের বিপরীত পথে। অশান্তস্য কুতঃ সুখম্? শান্তিহীনের সুখ কোথায়? ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, চিরদিনের এই সুখান্বেষী মানুষ ছুটিয়া চলিয়াছে কিন্তু সেই পথেই, যে পথে তাহার পদে পদে বিদ্ধ হইতেছে দুঃখের কণ্টক, যে পথের পরিসমাপ্তি অশান্তির আলোকবিহীন সূচীভেদ্য অমানিশায়! প্রশ্ন উঠে, এই অসম্ভব সম্ভব হইল কিরূপে? মানব চরিত্রের এই অস্বাভাবিকতা স্বভাবে রূপান্তরিত হইল কোন্ যাদুমন্ত্রে! ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, পথ চলিতে আরম্ভ করিয়া মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে তাহার লক্ষ্য, তাহার গন্তব্যস্থল। মানুষকে আজ পাইয়া বসিয়াছে তাহার চলার নেশা, আর এই নেশাই করিয়াছে তাহাকে লক্ষ্যহারা।

কেন এমন হইল, তাহার বিচার করিতে বসিলে দেখা যায়, মানুষ আজ জড়াইয়া পড়িয়াছে নিজেরই জালে। তাহার অহঙ্কারের পটভূমিকায় যে জ্ঞানান্বেষণ আরম্ভ হইয়াছে সাড়ম্বর দর্পে সেই জ্ঞানের বিষয়ই যে মিথ্যা, তাহা

সে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিল না কোনও দিনও। করিলে সে দেখিতে পাইত যে, যাহা নাই অথচ নিয়তই আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাই তাহার জ্ঞানের বিষয় বলিয়া গণ্য হইতেছে। যেমন রজ্জুতে সর্প নাই, তথাপি কখনও কখনও ইহা দেখা যায়। এই রজ্জুসর্পই মিথ্যাপদবাচ্য। আজ পাশ্চাত্য পণ্ডিত কর্ত্তৃক বহু ঘোষিত 'গতিবাদ' (Doctrine of Speed) ও সম্বন্ধবাদ (Doctrine of Relativity) পাশ্চাত্য জগতকে বিস্ময়ে অভিভূত এবং আমাদিগকেও চমৎকৃত করিয়াছে সত্য। কিন্তু একবারও কি আমরা আমাদিগেরই ভাষায় আমাদিগেরই তত্ত্বদর্শী ঋষিরচিত ক্ষুদ্র 'জগৎ' শব্দটির ধাতুগত ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছি। করিলে দেখিতাম, ঐ সকল আধুনিক পাশ্চাত্যবাদের মূলতত্ত্বটি বহুপূর্ব্বেই আমাদের এই ক্ষুদ্র 'জগৎ' শব্দেই বলা হইয়া গিয়াছে। যাহা জ্ঞানের বিষয় বা দৃশ্য হয়, তাহাই 'জগৎ'। 'জগৎ' শব্দের অর্থ গমনশীল অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল। এই পরিবর্ত্তনশীলতাই তো আমাদিগের জ্ঞানের বিষয়। যাহা অপরিবর্ত্তনশীল, তাহা নিত্য সদ্‌বস্তু; কেবল তাহাই কখনও জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ দৃশ্য হয় না। তদ্রূপ যাহা অসৎ, যেমন বন্ধ্যার পুত্র, তাহাও কখনও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। এইজন্য সৎ ও অসৎ ভিন্ন যাহা তাহাই বুঝায় এই 'জগৎ' শব্দে। অসৎ বস্তু নাই বলিয়া জ্ঞানের বিষয় হয় না; আর সদ্‌বস্তু নিত্য, একরূপ ও অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া জ্ঞানের বিষয় হয় না। অতএব যাহা এই দুই ভিন্ন, তাহাই জ্ঞানের বিষয়, আর তাহাই মিথ্যা বা অনিত্য এবং তাহাই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগৎ। সুতরাং এই পঞ্চভূত এই পাঞ্চভৌতিক পদার্থ এই দেহ, মন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, অজ্ঞান বা প্রকৃতি যত কিছু, সকলই জগৎ পদবাচ্য, অর্থাৎ মিথ্যা।

যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ এই মিথ্যা আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া আসিতেছে, আর তাহারই ফলে উদ্ভূত হইতেছে তাহার বহু নীতি, বহু

বাদ ও বহু 'ইজ্‌ম্'। 'বিম্বাৎ বিম্বমেব' এই সকল নীতি, বাদ ও ইজ্‌ম্, আজ মানুষকে তাহার নিজের জালেই জড়াইয়া ফেলিয়াছে। শান্তি সে আর কিরূপে লাভ করিবে?

এই জগৎ ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞানই মিথ্যাপদবাচ্য। যাবৎ দৃশ্যপ্রপঞ্চ সৎও নহে, অসৎও নহে। ইহা সদসৎভিন্ন। অর্থাৎ দেখা যায় বটে, কিন্তু নাই। সুতরাং এই জগৎ আছে বলিয়া যে দেখা যায় তাহা নহে, বরং দেখা যায় বলিয়াই 'আছে' বলা হয় মাত্র। যেমন রজ্জুসর্পকে দেখা যায় বলিয়াই 'আছে' বলা হয়, কিন্তু রজ্জুসর্প থাকায় 'আছে' বলিয়া জ্ঞান হয় না। এইজন্য সেই সত্তাকে বৈদান্তিক মতে প্রাতিভাসিক সত্তা বলা হয়। এই 'বিশেষ' অর্থ এই যে, রজ্জুসর্পের অধিষ্ঠান জ্ঞান সহজেই হইয়া থাকে। কিন্তু আলোক আনয়ন করিলেই রজ্জু দর্শন হয়। ফলে সর্প, সর্পজ্ঞান এবং তজ্জন্য ব্যবহারও বিনষ্ট হয়। কিন্তু জগতের অধিষ্ঠান যে ব্রহ্ম তাহার জ্ঞান সহজে হয় না। অতএব রজ্জুদর্শনে যেরূপ সদ্যঃ সদ্যঃই সর্প, সর্পজ্ঞান ও সর্প-ব্যবহার অন্তর্হিত হয়, জগৎ দর্শনাদি সেরূপ সহজে অন্তর্হিত হয় না। শাস্ত্র সাহায্যে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিলেও সহজে জগদ্-দর্শন রহিত হয় না। ফলে, জগদ্-ব্যবহারও নিবৃত্ত হয় না। তবে শুদ্ধচিত্তে নিরন্তর নিদিধ্যাসনের ফলে অধিষ্ঠান ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে তাহা হইয়া থাকে। এই প্রভেদের জন্যই জগতের সত্তাকে ব্যবহারিক সত্তা এবং রজ্জুসর্পের সত্তাকে প্রাতিভাসিক সত্তা বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই উভয়ই মিথ্যা, অর্থাৎ অধিষ্ঠানজ্ঞান নাশ্য। প্রত্যক্ষভ্রমে অধিষ্ঠান-প্রত্যক্ষই ভ্রমনাশক, পরোক্ষভ্রমে অধিষ্ঠান-পরোক্ষই ভ্রমনাশক। কিন্তু প্রত্যক্ষভ্রমে অধিষ্ঠান-পরোক্ষ ভ্রমনাশক হইতে পারে না। বাধক সমবল বা অধিকবল হওয়া আবশ্যক।

সত্যোপলব্ধির পথে প্রাতিভাসিক সত্তা রহিত হইয়া ব্যবহারিক সত্তায় উপনীত হওয়া যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ মুণ্ডকোপনিষৎ বলিতেছেন—

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।।

সেই নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত নিরবদ্য নিরঞ্জনে উপনীত হইতে হইলে এই ব্যবহারিক সত্তাও রহিত হওয়া আবশ্যক। ব্যবহারিক সত্তা অন্তর্হিত হইলে যে সত্তার প্রকাশ ঘটে, শাস্ত্রে তাহা পারমার্থিক সত্তা নামে অভিহিত। ইহাই ব্রহ্মের সত্তা বা ব্রহ্ম স্বয়ম্—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিসন্তি—যাহা হইতে এই ভূত সকলের জন্ম, স্থিতি ও লয় হয়। এই পারমার্থিক সত্তাকেই বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যমনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং, নিচায্য তৎ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।

ইহাই তৈত্তিরীয়োপনিষৎ কথিত সেই—সত্যং জ্ঞানমনন্তম্, যাঁহাকে জানিলে সব কিছুই জানা হইয়া যায়, যাঁহাকে লাভ করিলে সব কিছুই লাভ হইয়া যায়—সর্ব্বদুঃখ, সর্ব্বঅশান্তি, সর্ব্বতাপ বিদূরিত হইয়া যায়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, সেই পারমার্থিক সত্তায় উপনীত হইবার উপায় কি? সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ লাভের পথ কোথায়? উত্তরে বলিতে হইবে, যে আলোকের সাহায্যে অজ্ঞান-তিমির নাশ হইয়া রজ্জুসর্পভ্রম তিরোহিত হয়, যে আলোক-সম্পাতে প্রাতিভাসিক সত্তা রহিত হইয়া ব্যবহারিক সত্তা আত্মপ্রকাশ করে এবং যে আলোক-রশ্মিপাতে ব্যবহারিক সত্তাও বিনষ্ট হইয়া পারমার্থিক সত্তা প্রকট হয়, সচ্চিদানন্দময়কে লাভ করিতে হইলে প্রয়োজন সেই আলোক।

পুণ্যতীর্থ ভারতভূমের ত্রিকালদর্শী সর্ব্বজ্ঞ ঋষি ও মহর্ষিগণ মানবের আত্যন্তিক কল্যাণ কামনায় বার বার আমাদিগকে সেই আলোকেরই সন্ধান

দিয়া গিয়াছেন, বার বার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিয়াছেন সেই প্রণম্য পুরুষকে, যাঁহার হস্তে রহিয়াছে সেই আলোক-বর্ত্তিকা, যাঁহার উদ্দেশ্যে যুগ যুগান্ত ধ্বনিত হইতেছে—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

ব্রহ্মচারিজীর পত্রগুলির প্রতিটী শব্দ ও বাক্যের মধ্য দিয়া সুস্পষ্টভাবে এই আলোক-রশ্মির নিঃসংশয় প্রকাশ লক্ষিত হয়। নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতে বসিলে এই আলোকধর্ম্মী পত্রাবলীর অন্তরালে রচয়িতার জ্ঞানের গভীরতা, দৃষ্টির প্রসারতা, ধীশক্তির প্রখরতা, অকপট সত্যবাদিতা, পরদুঃখকাতরতা, সর্ব্বজীবের কল্যাণাকাঙ্ক্ষার তীব্রতা এবং সর্ব্বপ্রসঙ্গে তাঁহার সত্যাশ্রয়ী চিত্তের অনলস ভগবন্মুখিতা আমাদের যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। ভক্ত ও শিষ্যের বহির্মুখী চিত্তকে অন্তর্মুখী করিয়া কখনও বা তটস্থ লক্ষণ দ্বারা, কখনও বা স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা তাহাকে সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সন্ধান ও পরিচয় দিতে তাঁহার কতই না আগ্রহ ও প্রয়াস এই পত্রসমূহের প্রতিটী ছত্রে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও এই দীপালোক সন্দেহ-তিমির ভেদ করিয়া সুনিশ্চিত পদনির্দ্দেশ করিতেছে, কোথাও এই আলোক মিথ্যাকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করিতেছে, কোথাও বা ইহার বিচ্ছুরিত রশ্মিতাপ মানব মনের সর্ব্ব হীনতা, সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, স্বার্থপরতা ও পরশ্রীকাতরতাকে ভস্মীভূত করিয়া পরিশেষে নির্ম্মল চিত্তক্ষেত্রে ধর্ম্মাঙ্কুর সৃষ্টি করিতেছে। তাই এই সকল পত্রের মধ্যদিয়া কোথাও প্রকাশ হইয়া পড়ে সকরুণ সহৃদয়তা, কোথাও ধ্বনিত হইয়া উঠে বজ্রগম্ভীর সদর্প আদেশ, কোথাও বাজিয়া উঠে নিরহঙ্কার অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ সপ্তঝঙ্কারে, কোথাও ক্ষরিত হইতে থাকে পরমহিতকর জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলী সমবেদনার মধুময়ী ধারায়, কোথাও বা মুখর হইয়া উঠে শত্রুর প্রতিও অপার সহানুভূতি ও গভীর কৃতজ্ঞতা।

ব্যষ্টি বা ব্যক্তি স্বাধীনতার এই আলাময় যুগে উপদেশ বা আদেশ গ্রহণ করিবার ধৈর্য্য ক্রমেই লোপ পাইতে বসিয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের অমোঘ নির্দ্দেশ—

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।'

এই ভগবদ্ বাক্যের গভীর তাৎপর্য্য ও অকাট্যযুক্তিই বা আধুনিক যুগে কয়জন প্রণিধান করে? তাই ব্রহ্মচারিজীর পত্রে মধ্যে মধ্যে যে নির্দ্দেশ বা আদেশ রহিয়াছে, তাহা কাহারও কাহারও আত্মাভিমানে হয়ত বা আঘাত করিতে পারে সত্য। কিন্তু পত্রগুলি পাঠকালে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে অনুসন্ধিৎসু ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ভক্ত ও শিষ্যের উদ্দেশ্যেই এই পত্রাবলী রচিত। সাধারণের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্যে নয়। একথা স্মরণ রাখিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, সত্যনিষ্ঠ ব্রহ্মচারিজী পত্রোত্তর দিবার কালে কোন স্থলে অপ্রিয় সত্যকে আপাতমধুর করিবার প্রয়োজনমাত্রও বোধ করেন নাই। প্রকৃত তত্ত্বান্বেষী পাঠক এরূপ ক্ষেত্রে তিক্ততা বোধ করা দূরে থাকুক, সত্যের আলোকস্পর্শে বরং পুলকিত অন্তরে ব্রহ্মচারিজীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইয়াই থাকিবেন। শুধু তাহাই নহে, প্রতিটী পত্রের মধ্যে ব্রহ্মচারিজীর যে অপূর্ব্ব বিশ্বাস ভক্তি ও প্রেমের অমিয়মধুর ত্রিধারা প্রবাহিতা, তাহা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী পাঠকের অন্তরকে যে নিরন্তর অভিসিঞ্চিত ও কৃতকৃতার্থ করিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

১৩ই ফাল্গুন, ১৩৫৬

১২৪।১, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

১৩৫৯ সালের মাঘ মাসে "পারের কড়ি" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ কালে নিবেদন করা হয়: "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির ইতিহাস তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের জাতির অস্থিমজ্জায় রহিয়াছে আধ্যাত্মিক অনুভূতির পুণ্যময় প্রবাহ। যে জাতির ক্রোড়ে আবির্ভূত হইয়াছেন বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক—যে জাতিকে ধন্য করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ভগবান বিজয়কৃষ্ণ, পরমহংস রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ প্রভৃতি অবতার ও মহাত্মাবৃন্দ—সে জাতির নৈতিক অধঃপতন যতই শোচনীয় হউক না কেন, তাহা নিতান্তই সাময়িক ভিন্ন কখনও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। একদিন না একদিন সে জাতির মোহনিদ্রা অবসান অবশ্যম্ভাবী। 'পারের কড়ি'র মত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের আবশ্যকতা এই সত্যই প্রমাণ করে, একথা অস্বীকার করিবার নহে।"……

অস্বীকার করা দূরে থাক, যুগাধিক কাল পরেও সেই কথা আজ অভ্রান্ত সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। দেশের নৈতিক অধঃপতন যেমন ত্বরান্বিত তেমনি আরো বেশী শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ঘোরতর যুগান্ধকারে অধিকতর দুর্যোগে জাতির ভাগ্যাকাশে দেখা যায় ঘন বিদ্যুতের ভয়াল ভ্রূকুটি, কালো জমাট মেঘের গুরুগর্জনে শোনা যায় প্রলয়ের ক্রূর অট্টহাসি। কিন্তু অন্ধকার যতই নিবিড়তর হয়, সত্যের বিমল দ্যুতির আত্মপ্রকাশ ততই হইয়া ওঠে দীপ্যমান। তাই সারা দেশে ব্যাপক অন্যায় ও অধর্মের বিরুদ্ধে জাতির অন্তরাত্মায় পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে তীব্রতর অসন্তোষ—মর্মান্তিক নাগপাশ হইতে পরিত্রাণলাভের আকূতিতে 'ত্রাহি ত্রাহি' রব ছাড়িয়াছে নিপীড়িত অথচ নবজাগ্রত মানবাত্মা।…তাদের আজ কে দেবে আশা-

ভরসা—ঘনঘোর আঁধারে প্রদীপ্ত আলো জ্বালাইয়া কে দেখাইবে অগ্রগতির উদার সত্যপথ? প্রলয়-পয়োধি জলে জীবন-তরী যখন টলমল, নিমজ্জমান—তখন কে আছেন দীনবন্ধু, যিনি চরম বিপদে উদ্ধারের জন্য কৃপাহস্ত প্রসারিত করিবেন পরম প্রেমে?...কে আছেন পারের কাণ্ডারী। যিনি ডুবন্ত জীর্ণ তরীকে পরপারে পৌঁছাইয়া দিবেন নিশ্চিন্তে, একান্ত নিরাপদে?...

তিনি আর কেউ নন—আমাদেরই প্রাণের ঠাকুর,...প্রিয়তম প্রেমের দেবতা! বস্তুত, সেই মর্মকথাটী বুঝাইবার জন্য তাঁরই ইচ্ছায় ও ইঙ্গিতে চারিদিকে বুঝি এই সর্বনাশের আয়োজন, সমূহ বিপর্যয়ের সুনিশ্চিত পূর্বাভাষ।...নিকষ-কালো কষ্টিপাথরে যাচাই হইবে নিখাদ সোণা, সীতার আজ অগ্নিপরীক্ষা। সারা দেশ তথা নিখিল বিশ্বের সমস্ত দুঃখজ্বালা, অধঃপতন ও মহাপ্রলয়ের মূলে আছে হিংস্র-কুটীল স্বার্থবোধ, জঘন্য ভোগ সুখের অপ্রমেয় লালসা। সেই ক্লিন্ন, পঙ্কিল আবর্ত ছাড়িয়া অমৃতের পুত্রেরা যে সত্যই অমৃত-প্রবাহে ভাসিয়া চলিতে চায়, তাহাদের অন্তরে যে জাগিয়াছে পরানন্দ লাভের পরম আকুতি—আত্মদর্শনের মানদণ্ডে চলিবে সেই আত্মবিচার। জীবনের সেই মূল্যায়নে, সেই ঋদ্ধি ও সিদ্ধি লাভের পথে শ্রীশ্রীঠাকুরের 'পারের কড়ি' অপরিহার্য পাথেয়, অমূল্য ও অক্ষয় আশীর্বাদ।... দুর্যোগ যতই ঘোরতর হইতেছে, এই সত্যই প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে—অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া প্রেমের ঠাকুরের কৃপামৃত লাভের পরম আর্তি ব্যাকুলতর সংবেদনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে ভক্ত, মুমুক্ষু নরনারীর হৃদয়-কন্দরে। সেই আবেদনে সাড়া দিবার মহত্তর তাগিদেই 'পারের কড়ি' মহাগ্রন্থের পুনরায় এই আত্মপ্রকাশ।

পূর্ব সংস্করণের ন্যায় এবারেও 'পারের কড়ি'র দুইটী খণ্ডই একত্রে প্রকাশ করা হইল। ইহাতে প্রথম সংস্করণ হইতে এযাবৎ প্রকাশিত সমস্ত পত্রগুলি ছাড়াও 'বিবর্তন' পত্রিকায় প্রকাশিত আরো কতকগুলি মূল্যবান পত্ররাজি

সংযোজিত হইল এবং শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ পঞ্চকম্, শ্রীশ্রীকুলদানন্দ বন্দনম্, শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, সাহিত্যবিনোদ লিখিত 'মুখবন্ধ', প্রবর্তক সঙ্ঘগুরু স্বর্গত পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমতিলাল রায় লিখিত সারগর্ভ 'ভূমিকা', শ্রীযুক্তা বিভাবতী আচার্য চৌধুরী লিখিত প্রশস্তি, বন্দনা প্রভৃতি রচনাগুলিও পূর্ববৎ গ্রন্থের সৌষ্ঠব রক্ষার জন্য মুদ্রিত হইল। অধিকন্তু, চন্দননগরে প্রদত্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিভাষণটীর সহিত নাগপুরে প্রদত্ত তাঁহার উল্লেখযোগ্য ভাষণটীও সন্নিবিষ্ট হইল। এ ছাড়া, শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত শ্রীগুরু প্রশস্তিদ্বয়ও যুক্ত হইল। বলা বাহুল্য, ইহাতে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইলেও এবং গ্রন্থ-প্রকাশনার ব্যয়ভার সর্বদিক দিয়া অগ্নিমূল্য হওয়া সত্বেও এই সংস্করণের মূল্যমান নামমাত্র বর্ধিত করা হইল পাঠকবর্গের সুবিধার্থে, বিশেষত এই অমূল্য, সর্বজন-সমাদৃত গ্রন্থরাজের বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যেই। আশাকরি, ইহাকে সাদর ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইবেন সুধী, ভক্ত ও বিদগ্ধ পাঠক সমাজ।

॥ জয়গুরু ॥

বিনীত সম্পাদক :
শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সাধন সংঘ।

সূচীপত্র

পত্র সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা

পত্র সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা

পারের কড়ি

[সাহিত্যিক, দার্শনিক ও আইনজীবী
জনৈক শিষ্যকে লিখিত]

সদ্‌গুরু নিবাস
ভুবনেশ্বর
১৭.৮.৫৫

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্‌

বান্ধবেষু—

আমাকে কেন্দ্র করে আপনি এবং আপনার গুরুভাইভগ্নীরা একটি ধর্মপরিবার বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছেন এবং এই সম্প্রদায়ের কল্যাণ-কামনাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য—এই যে ধারণা আপনারা অনেকেই মনের মধ্যে পোষণ করে আসছেন, যত শীঘ্র এই ভ্রান্তধারণার নিরসন হয় ততই আমাদের পক্ষে তা কল্যাণজনক হবে বলে আমি মনে করি।

আপনাদের কল্যাণ আমার কাম্য হলেও আমার জীবনের mission শুধু এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ এ কথা বললে শুধু আমাকে ছোট করা

হবে না—আমার গুরু এবং পরম গুরুর প্রতিও অবিচার করা হবে। কারণ তাঁরা যে পতাকা উত্তোলন করে গেছেন, অন্যান্যের মত আমিও তারই ধারক এবং বাহকরূপে তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি। কিন্তু তাঁদের জীবনের ব্রত কি ছিল—যা উদ্‌যাপনের ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে, এ বিষয়ে আপনাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

প্রথমে ভগবান গোসাঁইজীর কথাই ধরা যাক্। তাঁর জীবনের প্রথম অঙ্কে তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া হিন্দু। গতানুগতিকভাবে হিন্দুধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলোর আচরণ করেই তিনি চলেছিলেন; কিন্তু এতে তৃপ্তি না পেয়ে যখন তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে গেলেন, তখন তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অঙ্ক সুরু হ'ল। ধর্ম্মের যে সব আচার অনুষ্ঠান মেনে চলে তিনি আনন্দ পেতেন ব্রাহ্ম-সমাজে এসে সেগুলো অমান্য করাই তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে উঠল, ধর্ম্মাঙ্গগুলোর ধ্বস সাধন করে ধর্ম্মের প্রাণবস্তুর সন্ধানই তাঁর জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো। এইভাবে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই ব্যয়িত হয়ে গেল। তথাপি তিনি শান্তি পেলেন না। একটা কিসের অভাববুদ্ধি তাঁর মধ্যে জেগে উঠে তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। প্রাণ আছে অথচ দেহ বা কোন অবলম্বন নাই—এতে অভাব নিবৃত্তির ও নিরাপদ-ভূমি লাভের সম্ভাবনা নাই। গোসাঁইজীর মধ্যে যখন এই প্রকার একটা সন্দেহ ধূমায়িত হচ্ছিল, তখন তিনি একদিন ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরের সম্মুখে একজন সন্ন্যাসীর দর্শন পেলেন। সন্ন্যাসী ব্রহ্ম-মন্দিরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্‌লেন, 'এটা তৈরী হয়েছে খুব ভাল, কিন্তু অবলম্বন নাই, দাঁড়াবে কেমন করে?' গোসাঁইজী প্রাণের মধ্যে অনুভব করলেন, এ ইঙ্গিত তাঁকেই পথ প্রদর্শনের জন্য।

তারপর গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে আকস্মিকভাবে তাঁর গুরুলাভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের তৃতীয় এবং শেষ অঙ্কের সূচনা হ'ল।

এখানে তিনি যে আলোকের সন্ধান পেলেন, তার সাহায্যে তাঁর অতীত জীবনের দিকে পশ্চাৎ ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, সনাতন হিন্দু এবং ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে তাঁর জীবন-প্রবাহ মোটেই ব্যর্থ হয় নাই। দুইই ছিল পরম সার্থক। আচাররূপ ধর্ম্ম-দেহ এবং বিচাররূপ প্রাণবস্তু অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান, এই উভয়ের সংযোগেই ধর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়; সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি যেমন পরস্পরকে অবলম্বন করে সার্থক হয়ে উঠে। কিন্তু এ ছাড়াও আর একটা জিনিস চাই। সেটা হচ্ছে গুরুশক্তি। Hydrogen এবং Oxygen মিলে জল তৈয়ারী হয় বটে, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে Electric current প্রবাহিত না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন জলের সৃষ্টি হতে পারে না, তেমনি হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানরূপ কর্ম্ম এবং ব্রাহ্মের বিচাররূপ জ্ঞান, এই উভয়ের সংযোগ স্থাপিত হ'লেও, এদের মধ্য দিয়ে ভক্তিধারা (যা গুরুশক্তিরই বহিঃপ্রকাশ) প্রবাহিত না হ'লে ব্রহ্মলাভ অসম্ভব হয়ে ওঠে। সাংখ্যদর্শন পুরুষ প্রকৃতির সংযোগস্থলে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন অনুভব করে নাই বলে সে যেমন নিরীশ্বর সাংখ্যরূপে অবজ্ঞাত হয়ে আছে, তেমনি ভগবদ্ভক্তির স্নিগ্ধধারা যদি কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন না করে, তবে নাস্তিক্য ধর্ম্মই প্রশ্রয় পায় এবং দুইই ব্যর্থ হয়ে যায়। এই কারণে যে গুরুশক্তি গোসাঁইজীর হিন্দুসমাজ-জীবন এবং ব্রাহ্ম-সমাজ-জীবন, এই দুইয়ের মধ্যে অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটিয়েছিল, সেইটাই তিনি কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের ফলে তিনি যেমন অধিকাংশ হিন্দুর বিরাগভাজন হয়েছিলেন, পরমহংসজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি যে অভিনব ধর্ম্ম প্রচারের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তার জন্তে ব্রাহ্মসমাজও তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর প্রচারিত উদারনৈতিক ধর্ম্মমত বহু নরনারীকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেছিল; কিন্তু

এদের সাহায্যে তিনি কোনও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন নাই বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ ছিল না। ব্রাহ্ম এবং হিন্দু, ক্রীশ্চান্ ও মুসলমান, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকেই তিনি তাঁর প্রচারিত সনাতন ধর্মের ছায়াতলে বিশ্রাম লাভ করার সুযোগ দিয়েছিলেন।

গোসাঁইজী সত্যধর্মের যে প্রবাহ আনয়ন করেছিলেন, ঠাকুর শ্রীশ্রীকুলদানন্দ স্বীয় সাধন প্রভাবে সেইটাকেই আরও বেগশালী করে তুলেছিলেন। গোসাঁইজীর আদর্শ অনুসরণ করে তিনিও কোনদিন কোন বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেন নাই—যদিও গোসাঁইজীর ক্ষেত্রেও যেমন, আমাদের ঠাকুরের ক্ষেত্রেও তেমনি, তাঁর অনেক শিষ্য ওঁদের উদার আদর্শ উপলব্ধি করতে না পেরে অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্কীর্ণ মতবাদ প্রচার করেছেন এবং এখনও করছেন। এই সঙ্কীর্ণতা আপনাদের অনেকের মধ্যেও সংক্রামিত হতে চলেছে দেখে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি এবং এটা যাতে প্রশ্রয় না পায়, সেইজন্য সকলকে সাবধান করে দিচ্ছি।

বিশ্বের কল্যাণই আমার গুরু ও পরমগুরুর উদ্দেশ্য ছিল এবং এই উদ্দেশ্য তাঁরা সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের সংস্পর্শে আগত কতকগুলি নরনারীর মধ্যে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে। পূজা, পাঠ, হোম, ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি কতকগুলি কর্মই ধর্ম নয়—সাংসারিক সকল কর্মই ধর্মপর্য্যায়ভুক্ত হয়, যদি তাদের সঙ্গে ভক্তির যোগ থাকে বা সেগুলি ভগবৎ-মুখী হয়। তেমনি সাংসারিক জ্ঞান বা বিষয়বুদ্ধি প্রভৃতিও যদি ভক্তির সহিত অন্বিত হয়, তবে সেগুলিও ধর্মরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এই ভক্তি বা ভগবানে পরানুরক্তি, গুরুশক্তি বা গুরুকৃপা ছাড়া লাভ করা যায় না। গয়ায় ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা লওয়ার পর থেকে শেষের দিন পর্য্যন্ত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চোখের জল আর শুকায় নাই। এই ভক্তি তিনি গুরুশক্তির দ্বারা লাভ করেছিলেন। ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর নিকট দীক্ষা প্রাপ্তির পর

গোসাঁইজীর চোখের জলও শেষের দিন পর্য্যন্ত তাঁর জীবনের সম্বল হয়েছিল। এইরূপ সকল ক্ষেত্রেই গুরুকৃপাবারি সিঞ্চনেই ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হয়। ভগবানের জন্ম যে অভাববুদ্ধি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বা সুপ্ত আছে, গুরুশক্তি সেটাকে জাগিয়ে তোলে এবং সেইটাই ভক্তি নামে অভিহিত হয়। কবীরজী বলতেন—'পিয়াস মহদ্‌কা সাথ হাম লায়া রামানন্দ চেতারে' —অনন্তের পিপাসা তিনি সঙ্গে করেই এনেছিলেন, তাঁর গুরু রামানন্দ সেটাকে জাগিয়ে দিয়েছেন।

গোসাঁইজী এবং আমাদের ঠাকুর কতকগুলি নরনারীকে নিয়ে যে আদর্শ ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করে গেছেন, তা পরিধি বিস্তার করে একদিন সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হবে, এই আশা আকাঙ্ক্ষাই আমি পোষণ করি। ভবিষ্য সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মর্ম্মকথা শুনিয়েছেন—"The Truth of the future which Goswami Vijoykrishna hid within himself has not yet been revealed utterly to his disciples." লক্ষ্যপথে বহুদূর অগ্রসর হলেও গোসাঁইজীর আরব্ধ কাজ শেষ হতে এখনও অনেক দেরী এবং আরও উপযুক্ত ও সামর্থী অনেককে তাঁদের ব্রত উদ্‌যাপনের ভার গ্রহণ করতে হবে।

ক্ষুদ্র হলেও কাঠবেড়ালীর সমুদ্র-বন্ধনের মত আমিও যতটুকু সাধ্য তাঁদের কাজ করে চলেছি। এতে আমি আপনাদের সহায়তা পাব, এইটাই আশা করি; কিন্তু আপনারা আমার উদ্দেশ্যের অপব্যাখ্যা করে আমার কাজে যদি বাধা সৃষ্টি করেন, তবে তা অত্যন্ত ক্ষোভের কারণ হয়ে উঠবে। আজ এই পর্য্যন্ত। শুভমস্তু।

(ঢাকার জনৈক অনুতপ্ত শিষ্যকে লিখিত)

সিউড়ী

৩১.৪.৫৫

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

আত্মদেবেষু—

রাজধানীর বুকের উপর একখানি ক্ষুদ্র বিপণি। ঘরখানি দৈন্যদশাগ্রস্ত। অতি প্রত্যূষে নামমাত্র দোকান খুলে একজন তরুণ যুবক নিকটস্থ দীঘির পাড়ের রাজপথের দিকে উদাস দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসেছিলেন। বাইরে কোন চঞ্চলতা লক্ষিত না হলেও নানাপ্রকার চিন্তাতরঙ্গ তাঁর অন্তরে উত্থিত হয়ে তাঁকে অপ্রকৃতিস্থ করে তুলেছিল।

যুবক ভাবছিলেন, দোকান চালাবার উপযুক্ত এমন কোন মালমসলা তাঁর নাই, যার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে ক্রেতা এসে তাঁর দোকানে ভিড় জমাবে, আর দোকানখানি হয়ে উঠবে সমৃদ্ধ। যে জীবন তিনি পশ্চাতে ফেলে এসেছিলেন, সেই জীবনটাকে পর্য্যালোচনা করে বেদনাতুর হৃদয়ে তিনি ভাবছিলেন, ভবের হাটে দোকান সাজাবার মত কোন পণ্যই তিনি সঙ্গে করে আনেন নি; বিদ্যা, নৈতিক চরিত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্যক মসলার কোনটাই তাঁর দোকানের জন্য সংগ্রহ করা হয় নাই। দোকানখানা নূতন করে গড়ে তুলে সাজিয়ে ফেলার মত কোন পুঁজি তাঁর ছিল না, উপরন্তু তিনি ছিলেন ঋণজালে জড়িত। তাঁকে সংসার-গহনে একলা ফেলে দিয়ে তাঁর পিতা চিরকালের মত তাঁকে ত্যাগ করে গিয়েছিলেন।

যুবকের অতীত জীবন উদ্দেশ্যহীন আমোদ প্রমোদে ব্যয়িত হয়ে গেছে. তাঁর বর্তমান একটা সীমাহীন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতে চলেছে, আর তাঁর

ভবিষ্যৎ ডুবে আছে অন্ধকারের গর্ভে ; আশার ক্ষীণ দীপশিখা সেখানে জলে না, শান্তির মলয়ানিল সেখানে প্রবাহিত হয় না। গভীর বিষাদে দীঘির পার্শ্ববর্ত্তী রাজপথের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বারংবার তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে আলোকের সন্ধান করছিলেন ; কিন্তু দীঘির পাড়ের গাছপালা, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী প্রভৃতির অস্তিত্ব মুছে ফেলে তাঁর চোখের সামনে ভাসছিল শুধু একটা বিরাট অন্ধকার। আতঙ্কে তিনি শিউরে উঠলেন।

অকস্মাৎ অন্ধকার ভেদ করে প্রকাশিত হলেন এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে যুবক সেই নররূপী দেবতার রূপসুধা পান করতে লাগলেন।

মরি মরি কি অপরূপ রূপ! শিরে তাঁর জটিল জটা, ললাটে তাঁর বিচিত্র তিলকরেখা। সুঠাম নয়নযুগলে অপার করুণা। কণ্ঠদেশ হ'তে বিলম্বিত বিবিধ মাল্য তাঁর বক্ষোদেশের কমনীয় শোভা সম্পাদন করেছে, নয়নাভিরাম পীত বহির্ব্বাস তাঁর সোণার অঙ্গকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে, রাতুল চরণ দুখানি ত্রিতাপতপ্ত নরনারীকে ছায়া দান করবার জন্য যেন তাদিকে ডাক দিয়ে মন্থর গতিতে অভীষ্ট পথে যাত্রা সুরু করেছে।

এ আহ্বান ত তাচ্ছিল্য করা চলে না! নিরাশার অন্ধকার ভেদ করে অপ্রত্যাশিতভাবে যুককের সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছে আশার যে সুবর্ণ আলোক, তাকে প্রত্যাখ্যান করা ত সম্ভবপর নয়। সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে যুবক যখন দুর্ব্বারবেগে আবর্ত্তিত হচ্ছিলেন, তখন সেই মহাসঙ্কট মুহূর্ত্তে তাঁর জীবন নদীর মোহনায় ভেলা বেয়ে উদিত হয়েছিলেন ভবপারের যে কাণ্ডারী তাঁর আশ্রয় ত উপেক্ষার বস্তু নয়! দেবতাকে লক্ষ্য করে যুবক রুদ্ধশ্বাসে ছুটে গেলেন।

মুহূর্ত্তের মধ্যে নরদেবতার সম্মুখে গিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন। কোন প্রকার ভূমিকার অবতারণা না করে তিনি বললেন—আমায় ভাল করতে পারেন দেবতা? আমি মদ খাই, বেশ্যাবাড়ী যাই, কোন অনাচারই আমার বাকি নাই। আমাকে আপনি ভাল করতে পারেন?

যুবকের দিকে সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মহাপুরুষ থমকে দাঁড়ালেন। সে দৃষ্টি যেন যুবকের বাহিরের কাঠামোখানাকে ভেদ করে তাঁর মনের মানুষটার কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। অনুকম্পার সুরে তিনি উত্তর দিলেন—তুমি ত ভালই আছ, তোমাকে আবার ভাল করতে হবে কেন?

সহস্র বীণা যেন একসঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, আর সে ঝঙ্কার যেন যুবক-হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনিত হয়ে গুরুগম্ভীর সুরে বেজে উঠল। এত মমতা তিনি জীবনে কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই; মৌলিক সম্বন্ধ হেতু যাঁদের নিকট তিনি আত্মীয়তার দাবী করতেন, তাঁরা তাঁর কদর্য্য জীবনের সংস্রব এড়িয়ে আপনাদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে চলতে চায়; পুত্র বাৎসল্য যাঁর নয়ন অন্ধকার করে রাখে, সেই স্নেহময়ী জননীও তাঁর দুর্গতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে প্রতিনিয়ত অশ্রু বিসর্জ্জন করেন; অথচ একটা ছন্নছাড়া জীবনের যথার্থ স্বরূপের পরিচয় পেয়েও তার দোষ দর্শন না করে নিষ্কলঙ্ক বলে তাকে মেনে নিতে পারেন, এমন পরমাত্মীয়ের সান্নিধ্য লাভ যুবকের অদৃষ্টে কখনও ঘটে নাই। যুবকের নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

অবশ হৃদয়ে তিনি সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পদপ্রান্তে বসে পড়লেন। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন—না, ভুলিয়ে গেলে চলবে না, আমাকে ভাল করবার ব্যবস্থা করে যেতে হবে।

ধন্বন্তরী ব্যবস্থা দিলেন—যে ভাবে আছ সেই ভাবেই চলবে, শুধু প্রত্যূষে নিয়মিতভাবে গঙ্গাস্নান করবে, তুলসী গাছে জল দান ও প্রণাম করবে, আর প্রত্যহ মায়ের পদধূলি মস্তকে নেবে।

কি দুরারোগ্য ব্যাধির কত সহজ মুষ্টিযোগ! কিন্তু এটুকুরও কোন প্রয়োজন ছিল না। রোগ প্রতিকারের জন্য এ ধন্বন্তরীর কাছে মুষ্টিযোগ চাইতে হয় না। শুধু তাঁর কৃপা-কটাক্ষ জীবের ভবব্যাধি আরোগ্যের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু জীব তা বোঝে না—নিজের সংস্কার মত ঔষধ গ্রহণের জন্য লালায়িত হয়।

মহাপুরুষের পদধূলি গ্রহণ করে যুবক উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে স্বস্থানে যেতে আদেশ করে মহাপুরুষ তাঁর গন্তব্য পথে যাত্রা করলেন। একটা মাদকতা যুবককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। মহাপুরুষ তাঁর দৃষ্টির বাহিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত বিহ্বল নেত্রে তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে উন্মত্তের মত তাঁর দোকানের দিকে অগ্রসর হলেন।

স্তব্ধ বাতাস তরঙ্গ তুলে নেচে উঠল, তরুণ অরুণ কিরণ-জাল বিস্তার করে হেসে উঠল, শাখায় শাখায় পাখীদের আনন্দকাকলী ধ্বনিত হয়ে উঠল। সর্ব্বত্র একটা জাগরণের সাড়া পড়ে গেল—অচেতন পুরী অপূর্ব্ব পুলকে সজীব হয়ে উঠল, সমগ্র বিশ্ব যেন মধু বর্ষণ করতে লাগল।

এই যে নররূপী দেবতা ইনিই আমাদের ঠাকুর ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীকুলদানন্দ। আর এই যে যুবক, ঠাকুরের সোনার কাঠির স্পর্শে যাঁর জীবনধারা গতি ফিরিয়ে উজান বয়েছিল এবং কিছুকাল আগে যিনি দেহত্যাগ করে গেছেন, ইনি আমাদের একজন বিশিষ্ট গুরুভ্রাতা, ঠাকুরের লীলা-সহচর।

আমার শরীর অনেকটা ভালর দিকে।- কুশল কামনা করি।

(বাঁকুড়ার জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

গলিগ্রাম

(বর্দ্ধমান)

২২।১।৫১

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্‌

কল্যাণবরেষু—

বামুনের গরু মারার সেই গল্পটা শুনেছ ত? এক ব্রাহ্মণ খুব পরিশ্রম করে একটা সুন্দর বাগান তৈরী করেছিল। নানাপ্রকার ফুল ফল ও সব্‌জী গাছে শোভিত হয়ে বাগানটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একদিন সকালে ব্রাহ্মণ বাগানে গিয়ে দেখলে, একটা গরু বেড়া ভেঙ্গে বাগানের এক কোণে ঢুকে দিব্যি গাছ খাচ্ছে। দেখেই ব্রাহ্মণের মাথা গরম হয়ে উঠল। সে গরুটাকে এমন গুরুতরভাবে প্রহার করল যে সেইখানেই তার গো-লীলার অবসান হয়ে গেল। এতটা যে গড়াবে ব্রাহ্মণ বুঝতে পারেনি। সে এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে গরুটাকে বাইরে ফেলে দিল। কিন্তু এত বড় একটা পাপকর্ম্ম তারই দ্বারা সংঘটিত হ'ল বলে সে প্রথমটা খুব একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ব্রাহ্মণের এক আধটুকু শাস্ত্রজ্ঞান ছিল। শাস্ত্রে আছে, আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। আমাদের দ্বারা যে সকল ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, সে সব বাস্তবিক আমরা করি না—ঐ দেবতারা করেন। আমাদের চোখ দেখে না—দর্শনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সূর্য্যদেব দেখেন, কাণ শোনে না—শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা পবনদেব শোনেন, হাত কাজ করে না—হস্তেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্রদেব করেন, ইত্যাদি। মনে মনে এই সব আলোচনা করে ব্রাহ্মণ স্থির করলে, আপাতদৃষ্টিতে যদিও গরুটি তার হাতেই মারা গেছে, তথাপি এতে তার কোন অপরাধ নাই।

প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রই এজন্য দায়ী। এ বিষয়ে সে এমন স্থিরনিশ্চয় হ'ল যে গো-বধের লেশমাত্র সংস্কার তার মনের মধ্যে রইল না। নিশ্চিন্ত মনে সে বাগানের কাজ করতে লাগল। এদিকে পাপ ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রবেশ করতে এল। ব্রাহ্মণের মন বল্‌লে, "খবরদার, এগিয়েছ কি মরেছো। গরু ইন্দ্র মেরেছে, যেতে হয় তার কাছে যাও।" সবিস্ময়ে পাপ দেখলে যে, ব্রাহ্মণের মনে কোন অপরাধ বুদ্ধি নাই, কাজেই তাকে ত আশ্রয় করা চলে না। সে ইন্দ্রের কাছে গেল। ইন্দ্র সভয়ে তাঁর আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সমস্ত শুনে ইন্দ্র ত অবাক্। পাপকে বললেন, "আচ্ছা তুমি কিছুক্ষণ সবুর কর, পরে যা হয় করা যাবে।" এই বলে তিনি একজন সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এবং পাপকেও অলক্ষিতে তাঁকে অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করলেন।

একটু পরে ইন্দ্র পাপকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মণের কাছে এলেন। বাগানের ব্রাহ্মণ তখনও বাগানের কাজ করছিল। ইন্দ্র ব্রাহ্মণকে শুনিয়ে বল্‌তে লাগলেন, "বাঃ! কি চমৎকার বাগান! এমনটী সাধারণতঃ দেখা যায় না। যে এই বাগানটি গড়েছে তার যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে।" কথাগুলি শোনামাত্র ব্রাহ্মণ আনন্দের আবেগে বলে ফেল্লে, "আরে মশায় বলেন কেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজের হাতে এই বাগান তৈরী করেছি।" ইন্দ্র তখন বললেন, "তবে রে বেটা, বাগান তৈরী করার বেলায় তুই নিজের হাতে করবি—আর গরু মারবার বেলায় ইন্দ্র মারবে?" পাপকে বললেন, "ব্যাপার বুঝলে, এখন এর শরীরে প্রবেশ কর।"

তোমাদের দোষ, অপরাধ, ত্রুটী বিচ্যুতির জন্য আমাকে দায়ী করবার অদ্ভুত মনোবৃত্তি তোমাকে এবং তোমারই মত আরও কয়েকজনকে আশ্রয় করেছে দেখে উপরোক্ত গল্পের অবতারণা করতে হ'ল। তোমাদের এই অশোভন প্রবৃত্তির অর্থ কি এবং লাভই বা কি, তা আমি ভেবে পাই না।

অন্যায় ও বে-আইনি ভাবে অপরের জমি দখল করেছিলে, সেটা যেন আমারই অপরাধ এবং এই অপরাধের জন্য যেন আমারই শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল। আদালতের ব্যাপারে তোমাকে যে অপদস্থ হতে হয়েছে, সেটা যেন খুব গর্হিত কাজ হয়েছে। তোমাদের মধ্যে কারও কারও ধারণা যে, সাধন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা যথেচ্ছভাবে অন্যায় অপরাধ করবার licence বা অবাধ অধিকার পেয়েছো—অর্থাৎ তোমাদের ধর্মলাভের সহায়তা করার পরিবর্ত্তে তোমাদের অধর্মের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য যেন আমার গুরুগিরি। আমার প্রতি এত বড় অবিচার যে তোমরা করতে পার, এই কথা ভেবে আমি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করছি।

তোমাদের সকলেরই এটা বিশেষভাবে জেনে রাখা দরকার যে, সাধনের বাইরের লোকের পক্ষে কোন প্রকার অপরাধ করে হজম করা বরং সম্ভবপর হতে পারে, কিন্তু তোমাদের খুব সামান্য অপরাধের জন্যও রীতিমত শাস্তি ভোগ করতে হবে। ধর্মকেই যারা প্রধান অবলম্বন করেছে, তাদের অনুষ্ঠিত অতি সামান্য পাপের প্রতিক্রিয়া খুব ভীষণ আকার ধারণ করবে, এটা খুব জোরের সঙ্গে বলে রাখছি।

"সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ"—গুরু সকল দেবতার সমষ্টিস্বরূপ। ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা যেমন মানুষকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে সমস্ত কাজ করেন, তেমনি সদ্‌গুরু তাঁর আশ্রিত শিষ্যগণের চালকরূপে তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম নিষ্পন্ন করেন। এতে শিষ্যের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, একথা খুবই সত্য। কাজেই সদ্‌গুরুর কাছে সাধন নিয়ে শিষ্য অনায়াসে বলতে পারে যে, বাহ্যদৃষ্টিতে সে যা করে প্রকৃতপক্ষে তার গুরুই সে সব করেন। কিন্তু এটা শুধু বিশ্বাসী শিষ্যের পক্ষে। এই সত্যে যারা অচল-প্রতিষ্ঠ, শুধু তারাই তাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করতে পারে। উপরোক্ত গল্পে দেবতারাই সব কাজ করেন—মানুষ কিছু করে না, এই শাস্ত্রবাক্যে ব্রাহ্মণের

যে বিশ্বাস, এটা অবিশ্বাসেরই নামান্তর। কারণ, গরু মারার পর এই বিশ্বাস ঐ সুবিধাবাদী ব্রাহ্মণের মনে প্রকট হয়ে উঠেছিল, অথচ একটু পরেই দেবতাকে সিংহাসনচ্যুত করে বাগান তৈরীর সমস্ত কর্তৃত্ব সে নিজেই আত্মসাৎ করেছিল। এটা বিশ্বাস মোটেই নয়। তুমিও তেমনি ফ্যাসাদে পড়ে গুরুর উপর সমস্ত কর্তৃত্ব অর্পণ করতে চাও, কিন্তু সুখের দিনে আত্মকর্তৃত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করার কল্পনাও কোনদিন কর নাই। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে চিঠিখানাকে ভারাক্রান্ত করে লাভ নাই। একটু চিন্তা করলেই আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে। পুরস্কারের বেলায় আমি কেউ নই, অথচ তিরস্কারের বেলায় আমাকে পাকড়াও করবে, এটা খুব সাধু পন্থা নয়।

ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করো না, ফাঁকি দিয়ে আর যাই হোক্ ধর্মলাভ করা যায় না। ধর্মজীবন লাভ করতে হ'লে কোন প্রকার মিথ্যা বা কপটতার আশ্রয় করা বা প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

ঠাকুর তোমাকে সুমতি দিন। আমি ভাল আছি। তোমাদের সকলের কুশল কামনা করি।

(খুলনার জনৈক শিষ্যকে লিখিত) অগ্রদীপ

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ ১২।২।৫০

বাসুদেবেষু—

মায়া জিনিসটা কি, জানতে চেয়েছ। একটা আখ্যায়িকার সাহায্যে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

একবার দেবর্ষি নারদ ভগবান বিষ্ণুর নিকট মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন। ভগবান বললেন, "সে পরে হবে-এখন, চল একটু

ঘুরে আসি।” এই বলে এখানে সেখানে কিছুক্ষণ পদব্রজে ভ্রমণ করার পর ভগবান বললেন, “নারদ, পিপাসায় আমার জীবনান্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আর মোটেই হাঁটবার শক্তি নাই। যেখান থেকে যেমন করে পার একটু জল এনে আমার প্রাণ বাঁচাও।” এই বলে তিনি একটা গাছের তলায় শুয়ে পড়লেন। নারদ বিব্রত হয়ে উঠলেন। নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। সম্মুখে একটা গভীর অরণ্য দেখতে পেয়ে নিরুপায় হয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। বনপথে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে নারদ একটা ছোট কুটীর দেখতে পেলেন এবং ব্যস্ত হয়ে চীৎকার করে বললেন, “ওগো, কে আছ, শিগ্‌গীর একটুখানি জল দাও।” কুটীর হতে একটি অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী জল নিয়ে বেরিয়ে এসে নারদকে জল দিতে গেলেন। নারদ বিহ্বলনেত্রে যুবতীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। জলের জন্য তাঁর আর কোন আগ্রহই দেখা গেল না। কিছুক্ষণ অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে নারদ বললেন, “না, না, জল তো আমি চাই না, আমি তোমাকে চাই।” তারপর সেই বনেই দু'জনের বিয়ে হয়ে গেল। বিষ্ণুর কথা আর নারদের মনেই রইল না।

নারদ তাঁর নববিবাহিতা পত্নীর সঙ্গে বনেই বাস করতে লাগলেন। কালক্রমে রমণীর গর্ভে নারদের অনেক পুত্রকন্যা হ'ল এবং এই সব পুত্র-কন্যার বংশবৃদ্ধি হওয়ায় সেই বনের একাংশে একটা পল্লী গড়ে উঠলো। বহুপরিবার পরিবৃত হয়ে নারদ তাঁর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বিস্মৃত হলেন এবং পুত্রকন্যা, পৌত্র-পৌত্রী প্রভৃতিকে নিয়ে নিরুদ্বেগে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতে লাগলেন।

এইরূপে বহুকাল অতীত হয়ে গেল। বনের পাশেই একটা নদী ছিল। একবার নদীতে হঠাৎ খুব বান এল। জল ক্রমশঃ ভয়াবহভাবে বাড়তে লাগল এবং নারদের ঘরবাড়ী সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। নারদ ও

তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর সকলেই স্রোতে ভেসে গেল। এ যেন একটা খণ্ড প্রলয়। প্রবল বন্যায় নারদের স্ত্রীরও ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা দেখে নারদ তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে নিরাপদ ভূমির অন্বেষণ করতে লাগলেন। কিন্তু একটা প্রবল স্রোত নারদকে উল্টে ফেলে দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। নারদ তাঁর কোন সন্ধানই পেলেন না। তিনি নিজে কোনরূপে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন। তাঁর স্বজনগণের বিরহ, বিশেষতঃ তাঁর পত্নীবিয়োগ তাঁকে সমধিক কাতর করে তুলল। কাঁদতে কাঁদতে নারদ সবিস্ময়ে দেখলেন, যেন কোন যাদুমন্ত্রের প্রভাবে বান ও বন অন্তর্হিত হয়ে গেল এবং এক জ্যোতির্ময় পুরুষ আবির্ভূত হ'লেন। নারদকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, "নারদ কি হ'ল তোমার? তুমি এমন আকুলভাবে রোদন করছ কেন?" কান্নার সুরে নারদ বললেন, "কে আপনি? আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না!" তৎক্ষণাৎ প্রতিপ্রশ্ন হ'ল, "বল কি নারদ, আমাকে চিনতে পারছ না? এখনও একদণ্ড অতীত হয় নাই; দারুণ পিপাসার্ত্ত হয়ে আমি তোমাকে জল আনতে বললাম, এরই মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটল যাতে তুমি এমন অভিভূত হয়ে পড়েছ যে, আমাকেও বিস্মৃত হয়ে গেলে?"

নারদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যেন কি স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন এবং বললেন, "ওঃ ভগবান বিষ্ণু! আপনি!" তারপর জল আনতে যাওয়ার পর যে সকল ঘটনা ঘটেছিল আনুপূর্ব্বিক সে সকল তিনি বর্ণনা করলেন। বর্ণনা সমাপ্ত করে শেষে বললেন, "কিন্তু আমি জল আনতে যাওয়ার পর কত কাল অতীত হয়ে গেছে তার হিসাব নাই, অথচ আপনি বলছেন মাত্র একদণ্ড আগে আমি জল আনতে গিয়েছিলাম, এর অর্থ কি?" ভগবান তখন বললেন, "মনে করে দেখ, তুমি আমাকে মায়ার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করেছিলে। তোমাকে বোঝাবার জন্যেই আমি এই মায়ার সৃষ্টি করেছিলাম। কোন বন বা নদী

এখানে কখনও ছিল না, কোন রমণী তোমাকে মোহিত করেনি, তোমার বিবাহ বা পুত্রকন্যা কিছুই হয়নি, বন্যায় তোমার ঘরবাড়ী ও পরিবারবর্গ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারও সর্ব্বৈব মিথ্যা। একদণ্ড সময়কে যে একযুগ বলে মনে হয়েছে, তাও সত্য নয়। অথচ এ সব ঘটনা সত্য বলেই তুমি উপলব্ধি করেছ। এই যে ভ্রান্তি, এরই নাম মায়া।"

নারদের মায়া এতক্ষণে সম্পূর্ণ অপসারিত হ'ল। পূর্ব্ব ঘটনা সমস্ত মনে পড়ল। মনে হ'ল, যেন একদণ্ড যাবৎ তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলেন।

মা+যা=মায়া। যা নাই, অথচ আছে, তাই মায়া। এই যে মায়া, যার প্রভাবে এরূপ অঘটন ঘটে, এর স্বরূপ নির্ণয় করা বড় দুরূহ ব্যাপার, বুঝিবা একেবারেই অসম্ভব। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, তেমনি ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রম হয়, অর্থাৎ একগাছা দড়ি পড়ে আছে দেখে সেটাকে যেমন হঠাৎ সাপ বলে ভুল হয় এবং এই ভ্রম দূর হ'লে যেমন সেটাকে দড়ি বলেই বুঝতে পারা যায়, তেমনি ভগবানকে জগৎ বলে মনে হচ্ছে। এই জগৎ-ভ্রম তিরোহিত হ'লে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। উক্ত গল্পে নারদের মায়া অর্থাৎ নদী, খাল, বন প্রভৃতির ভ্রান্তি তিরোহিত হওয়ামাত্র তাই তিনি ভগবান বিষ্ণুকে দেখেছিলেন।

ঐন্দ্রজালিক বা মায়াবী যেমন দর্শকদের কাছে নানারূপ ভেল্কি দেখায়, তার মায়া-শক্তি প্রভাবে যেমন দর্শক কত কিছু দেখে, কত কিছু শোনে, অথচ সেখানে দেখার বা শোনার কিছু থাকে না—তেমনি ঐন্দ্রজালিক-চূড়ামণি ভগবান, তাঁর মায়া-শক্তির দ্বারা জীবের জগৎ-ভ্রম সাধিত করেন।

পড়ে বা শুনে মায়ার স্বরূপ বোঝা দুঃসাধ্য। তবে সাধন ভজনের দ্বারা কতকটা উপলব্ধি করা যায়; তখন বোঝা যায়, কিছুই কিছু নয়, শুধু ভগবানই সার। বেশী জেনে শুনে লাভ কি? নিজের কাজ করে যাও, তাহ'লেই যা প্রয়োজন সবই বুঝতে পারবে। গীতায় আছে "বুদ্ধিযোগং দদাম্যহম্।"

আমার শরীর মোটের উপর ভাল মধ্যে মধ্যে তোমাদের কুশল সংবাদ পেলে সুখী হব।

(বর্দ্ধমানের জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্‌ মজঃফরপুর

(প্রথম) ১৫।৮।৫০

বাসুদেবেষু—

অনেকদিন তোমার পত্র না পেয়ে খুব উদ্বেগ ভোগ করছিলাম। আজ তোমার চিঠিখানা পড়ে বড় আনন্দ পেলাম। তোমার মত শিষ্য পেয়ে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য এমন আকুল আগ্রহ এমন সাধন প্রচেষ্টা ও গুরুনিষ্ঠা, ভগবানের প্রতি এমন ঐকান্তিক ভক্তি, এমন অকপটভাবে অপরাধ স্বীকার করার মত সৎসাহস, খুব কমই দেখতে পাই। ঠাকুর তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

মাঝে মাঝে তোমার দ্বারা যে সব অন্যায় বা অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়ে পড়ে লিখেছ, তার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নাই। দেবতাদের দ্বারা ভগবানের ইচ্ছায় এ সব সম্পন্ন হয়। এ সবের জন্য অনর্থক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে শরীর মনকে অবসন্ন করো না। ভগবান বা দেবতারা তাঁদের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীব সকলকে নিয়ে এই সব খেলা খেলেন। জীব নিরুপায় হয়ে, তাঁরা ভালমন্দ যা করান, তাই করে যা'য়। আশ্চর্য্য এই যে সাধু-চরিত্র ব্যক্তিগণকে নিয়ে তাঁরা এই খেলা খেলেন, তাঁদের দিয়েও তাঁরা অনেক সময় অন্যায় বা গর্হিত কাজ করান। সব চেষ্টা সত্ত্বেও তুমি যে সাময়িক অপরাধের হাত থেকে পরিত্রাণ পাও না—এ ছাড়া তার অপর কোন কারণ নাই।

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে দ্রোণ সেনাপতি হয়ে এমন ভীষণ যুদ্ধ সুরু করে দিলেন যে, পাণ্ডব-সৈন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়তে লাগল। তাঁর অপূর্ব্ব রণকৌশল দেখে পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ প্রমাদ গণলেন। বুঝিবা পাণ্ডবগণ জগতের বক্ষ থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাঁর ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা সমূহ বিনষ্ট হয়! এ যুদ্ধ ত বেশীদূর অগ্রসর হতে দেওয়া চলে না। অনেক চিন্তার পর তিনি যুধিষ্ঠিরকে ডেকে এই দুর্দ্দিনে দ্রোণকে যুদ্ধ হতে বিরত করবার জন্য তাঁকে তাঁর প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ জ্ঞাপন করতে বললেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁদের ধ্বংস অনিবার্য্য জেনেও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন আর এক চক্রান্ত করলেন। পাণ্ডবদের অশ্বত্থামা নামে একটি হাতি ছিল। সেটাকে তাঁর নির্দ্দেশ মত মেরে ফেলা হ'ল। তারপর শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আবার বললেন, "অশ্বত্থামা হস্তী নিহত হয়েছে। তুমি দ্রোণের কাছে গিয়ে বল, 'অশ্বত্থামা হত ইতি কুঞ্জর'—এতে তোমার মিথ্যাকথা বলা হবে না।" যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের চাতুরী না বুঝলেন এমন নয়। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা ত পূর্ণ হবেই। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি রাজী হ'লেন। তারপর দ্রোণের রথের সম্মুখে গিয়ে এই কথাই বললেন—"অশ্বত্থামা হত ইতি কুঞ্জর।" কিন্তু 'হত' এই পর্য্যন্ত বলামাত্র শ্রীকৃষ্ণের ব্যবস্থা মত ঢাকঢোল বেজে উঠল এবং এই গোলমালের মধ্যে "ইতি কুঞ্জর" এই দুটি কথা কোথায় ডুবে গেল। দ্রোণ শুধু শুনলেন "অশ্বত্থামা হত"। অশ্বত্থামার মৃত্যু, এটা বিশ্বাসযোগ্য না হ'লেও সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠিরের কথা অবিশ্বাস করা চলে না। গভীর দুঃখে পুত্র-শোকাতুর দ্রোণ ধনুঃশর পরিত্যাগ করলেন। তারপর যা ঘটেছিল, সে সব কথা অবতারণা করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব। যুধিষ্ঠির স্বর্গে চলেছেন, সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ। পথিমধ্যে একটা সুড়ঙ্গ পথে ধূম নির্গত হচ্ছিল এবং সেখান থেকে এমন একটা পচা

দুর্গন্ধ উঠছিল যে শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সেই সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করে ভিতরের সব দেখে শুনে আসতে বললেন। আশ্চর্য্য হয়ে যুধিষ্ঠিরও বললেন, "তাও কি সম্ভব? যে স্থানের দুর্গন্ধে এখান পর্য্যন্ত আমাদিগকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, সেখানে কেমন করে যাব?" তারপর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ঐ স্থানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। প্রশান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করলেন, "এটা নরক। একবার দর্শন করে এসো।" নরক দর্শন! যুধিষ্ঠির শিউরে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু কোন্ পাপে আমাকে এ শাস্তি গ্রহণ করতে হবে? আমি ত জীবনে কখনও ধর্ম্মভ্রষ্ট হই নাই!" গম্ভীরভাবে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "কুরুক্ষেত্রে দ্রোণের নিকট 'অশ্বত্থামা হত' এই মিথ্যা সংবাদ বহন করার জন্য তোমাকে সামান্য ক্ষণের জন্য নরক দর্শন করতে হ'বে।" সবিস্ময়ে যুধিষ্ঠির বললেন, "কিন্তু এই অপবাদের বোঝা তুমিই যে স্বহস্তে আমার মাথায় তুলে দিয়েছিলে ঠাকুর! আমি ত তোমার কথামতই কাজ করেছিলাম।" শ্রীকৃষ্ণ তখন হেসে বললেন, "তখন যেমন আমার কথা শুনেছ যুধিষ্ঠির, এখনও তেমনি আমার উপদেশ গ্রহণ কর। একবার ঐ নরক দর্শন করে এস।"

বাঁকা ঠাকুরটির খেলা দেখলে ত? বিশ্বজুড়ে এই খেলাই চলেছে। আমাদের স্কন্ধে চেপে তিনি আমাদের কখনও সৎ প্রবৃত্তি দিচ্ছেন, আবার কখনও অসৎ প্রবৃত্তি দিয়ে আমাদের দ্বারা কত অন্যায় কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। এতে যে তাঁর কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে, ক্ষুদ্র আমরা তার কি বুঝি! আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন তোয়াক্কাই তিনি রাখেন না। তাঁরই মঙ্গল ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করেন, আমাদের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে। এ সব সম্বন্ধে ভূরি ভূরি উপদেশ আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের মধ্যে রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আরও একটা ঘটনার উল্লেখ করার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময়ের স্বল্পতা ও পত্রের দীর্ঘতার কারণে আমাকে সে প্রলোভন দমন করতে হ'ল। যদি শুনতে

চাও ও স্মরণ করিয়ে দাও, তবে আর একটা আখ্যায়িকার কথা পরের পত্রে উল্লেখ করব।

কিছু ভেবোনা। তুমি আমার সুবোধ ছেলে, ভগবানের চিহ্নিত সন্তান। তোমার আবার ভয় কি? নিজের কর্ত্তব্য সাধন করে সংসারের পিচ্ছিল পথে চলতে চেষ্টা কর। যদি কখনও কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হও, সেটা দেবতাদের উপদ্রব বা ঠাকুরের খেলা মনে করে অবিচলিত থাকবে।

আমি সম্প্রতি ভালই আছি। আশা করি কুশলে আছ।

ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ বাঁকিপুর

(দ্বিতীয়) ১৬-১১-৫০

বাসুদেবেষু—

অনেকদিন পরে তোমার পত্র পেলাম। মানুষের ঘাড়ে চড়ে ভগবান ও দেবতারা কেমন করে তাঁদের মঙ্গল ইচ্ছা সাধন করেন, সে সম্বন্ধে আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়ার কথা তুমি যে স্মরণ করিয়ে দিয়েছ, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁদের পবিত্র লীলা-কাহিনী কেই বা আগ্রহ করে শুনতে চায়, আর কেই বা আত্মার কল্যাণকর এ সব কথা বলার সুযোগ দেয়? সেদিন মহাভারতের একটা উপাখ্যান বলেছি। আজ অনুরূপ একটা কাহিনী রামায়ণ থেকে বলব।

একটা দিন পরেই শ্রীরামচন্দ্র রাজা হবেন। অযোধ্যা নগরী সাজসজ্জায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে। সর্ব্বত্র প্রজাবৃন্দ মহোল্লাসে উৎসবের আয়োজন করছে। নবভাবে উদ্বুদ্ধ আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে যেন একটা জাগরণের

সাড়া পড়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কৈকেয়ী রামের রাজ্যাভিষেকের কথা ঘুণাক্ষরেও জানেন না। অযোধ্যার আনন্দ-কোলাহল তখনও তাঁর শ্রবণ পথে প্রবেশ করে নাই। মন্থরা নাম্নী তাঁর একজন দাসী সর্ব্বপ্রথম তাঁর কাছে এই সংবাদ বহন করে নিয়ে এল।

কৈকেয়ী ছিলেন একজন আদর্শ মহিলা। তাঁর অক্লান্ত পতিসেবা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। রামচন্দ্রকে তিনি স্বীয় পুত্র ভরতের অপেক্ষা বেশী ভালবাসতেন। এই ধর্ম্মপ্রাণা কৈকেয়ীর রন্ধ্রগত হয়ে দেবতারা তাঁদের নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন।

রামের রাজা হওয়ার কথা শুনে কৈকেয়ী অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। স্বীয় রত্নহার স্বহস্তে মন্থরার গলায় পরিয়ে দিলেন। কৌশল্যার ছেলে রাম রাজা হবে, আর মন্থরা যাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে, তার অতি আদরের সেই ভরত রাজপদ থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে থাকবে, মন্থরার কাছে এটা একটা বিপৎপাত বলেই মনে হয়েছিল। ঘৃণাভরে সে কৈকেয়ীপ্রদত্ত রত্নহার ছুড়ে ফেলে দিল, আর সর্ব্বপ্রকার কুটকৌশলজাল বিস্তার করে এই সর্ব্বনাশকর ব্যবস্থা পর্য্যুদস্ত করার জন্য কৈকেয়ীকে প্ররোচিত করতে লাগল। কৈকেয়ী হাসতে লাগলেন। "মন্থরা, তুই কি পাগল হলি?" ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে মন্থরা সক্রোধে কক্ষ পরিত্যাগ করল।

মন্থরার পরাজয় আর কৈকেয়ীর চিত্তের দৃঢ়তা দেবতাদের চোখে অতি ভয়াবহ আকারে প্রতিফলিত হ'ল। রামের বিরুদ্ধে কৈকেয়ীর মনকে বিষাক্ত করে তুলতে না পারলে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যায়। সাতকাণ্ড রামায়ণ এক নিঃশ্বাসে শেষ হয়ে যায়—পবিত্র রামায়ণী কথার অমৃত-সিঞ্চন থেকে ভারত বঞ্চিত থেকে যায়। এরূপ অবস্থায় তো প্রশ্রয় দেওয়া চলে না! দেবতারা সচেতন হয়ে উঠলেন।

দুষ্টা সরস্বতীর আহ্বান হ'ল। কৈকেয়ীর স্কন্ধে আরোহণ করে তাঁর বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটাবার জন্য এই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী দেবতাটিকে পরামর্শ দেওয়া হ'ল। দেবতাদের চক্রান্তে আকস্মিকভাবে কৈকেয়ীর মন শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি গভীর বিদ্বেষে ভরে উঠল।

কৈকেয়ীর কক্ষে মন্থরার ডাক পড়ল। মন্থরার কুটিল নীতির সদ্ব্যবহার করে কৈকেয়ী রামের রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা পণ্ড করে দিলেন। রাজমুকুটের পরিবর্ত্তে বনবাসের দুঃখকষ্টের বোঝা রামের মাথায় তুলে দেওয়া হ'ল। তারপর যা ঘটেছিল, সে সব করুণ কাহিনীর অবতারণা আর নাই করলাম।

দেবতাদের ষড়যন্ত্রে একটা পবিত্র চরিত্রে কেমন করে কালিমা লেপন করা হ'ল, একটা প্রেমপূর্ণ বিশুদ্ধ হৃদয়কে কেমন করে বিদ্বেষের তিক্ততা ও ক্রূরতার বিষে কানায় কানায় পূর্ণ করে দেওয়া হ'ল দেখ্‌লে! দেবত্বের উচ্চ শিখর থেকে কেমন নিষ্ঠুরভাবে একজন অবলা নারীকে পশুত্বের গভীর গহ্বরে ঠেলে ফেলা হ'ল, নয়নাভিরাম বৃক্ষলতাদি পরিপূর্ণ একটা সরস উদ্যানকে কেমন করে উষর মরুভূমিতে পরিণত করা হ'ল দেখ্‌লে ত? তবু কৈকেয়ী ছিলেন রাজমহিষী, সূর্য্যবংশাবতংশ মহারাজ দশরথের আদরের পাত্রী!

এই ত মানুষ, দেবতাদের খেলার পুতুল। তবু তার কর্ত্তৃত্বাভিমান যায় না! সে পুণ্যের বড়াই করে, পাপের জন্য অনুশোচনা করে। পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জয়পরাজয়, লাভালাভ এ সব কিছুই তার নয়। তবু সব কিছুকে নিজের করতে গিয়ে সে গভীরভাবে সংসারজালে জড়িয়ে পড়ে, উদ্ধারের পথ খুঁজে পায় না। মানুষ এমনভাবে পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য ভোগ করতে চায় যেন দেবতারা মানুষের মাথায় রাজমুকুট তুলে দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন। তাই তার বিড়ম্বনার অন্ত নাই।

সে কথা যাক। রামের বনবাসের পালা শেষ হয়ে গেল। সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর পর অযোধ্যায় ফিরে এসে তিনি রাজা হ'লেন। কৈকেয়ী কাঁদতে

কাঁদতে তাকে বললেন, "তোমার ইচ্ছাই ত পূর্ণ হ'ল বাবা, তবে আমাকে এ কলঙ্কের ভাগী করলে কেন?" রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, "তুমি ছাড়া এ কলঙ্কের বোঝা আর কেউ বহন করতে পারত না মা!"

বলিহারী! কেমন সুন্দর সহজ সদুত্তর! এই ঘনশ্যামের ইচ্ছাতেই দেবতারা কৈকেয়ী-চরিত্রকে মসীলিপ্ত করেছিলেন। এই রঘুকুল-তিলকের পিতৃসত্য রক্ষার অজুহাতই দশরথের ত্বরিত মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, আর এই সীতাপতির প্রজারঞ্জনের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত বাল্মিকীর তপোবনে স্বীয় পত্নীর, জগজ্জননীর নির্ব্বাসন দণ্ডের হেতু হয়েছিল।

আর কত বলি! তাঁর কাজের রহস্য ভেদ করা বা তাঁর গুণাগুণের বিচার করার অপচেষ্টা হতে বিরত হয়ে তাঁর দ্বারা চালিত সংসার-নাগর-দোলায় ঘুরপাক খাওয়া ছাড়া আমাদের আর উপায় নাই। তাঁর উদ্দেশ্যের গভীরতা নির্ণয়ের প্রয়াস চিনির-পুতুলের সমুদ্র মাপতে যাওয়ার মতই হাস্যকর।

আর একটা প্রয়োজনীয় কথা এখানে বলে রাখা ভাল। মহর্ষি বাল্মীকি দেবতাদের গোপন ষড়যন্ত্রের কাহিনী তাঁর রচিত মহাকাব্যে প্রকাশ করে গেছেন বলে সুধী সমাজ কৈকেয়ীকে সহানুভূতির চোখেই দেখেন। তাঁর অপরাধটাকে লঘুভাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষের চরিত্র নিয়ে দেবতারা যে ছিনিমিনি খেলেন, তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা গণনার মধ্যে না এনে তাকে যে কত পাপের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যান, সে বিষয় লোকচক্ষুর অগোচর থেকে যায়; কাজেই মানুষকে পদস্খলিত হতে দেখলেই অবলীলাক্রমে আমরা তার ঘাড়ে কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিই, যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে এটা তার প্রাপ্য নয়। ভগবান তেত্রিশ কোটি দেবতাকে তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা পরিপূর্ণ করার জন্য নিয়োজিত করেছেন। তাঁরা মানুষকে নিয়ে কখনও গড়েন, কখনও ভাঙ্গেন। আমাদের

কর্ত্তৃত্ব কোন্‌খানে? যা দু'একটা অন্যায় করে ফেল, তার গোড়া কোথায় তা ত বুঝলে? এতে তোমার কোন দায়িত্ব নাই, এই বোধে যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পার, তবে এর ফল ভোগও তোমাকে করতে হবে না। তবে কি জান, একথা সত্য হ'লেও সকলের কাছে বলার উপায় নাই। এতে তাদের পাপে প্রশ্রয় দেওয়া হবে—এতে তাদের অনিষ্ট ছাড়া ইষ্ট হবে না। কিন্তু তুমি আমার সুসন্তান। তোমার কাছে এসব কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, আর এতে তোমার পাপপ্রবৃত্তি প্রশ্রয় পাবে না, বরং সর্ব্ববিষয়ে ঠাকুরের অদৃশ্য হস্ত ক্রিয়াশীল ভেবে "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" কথাটির অন্তর্নিহিত তত্ত্বটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারবে।

আর বেশী বলে কি হবে? যা জেনেছ, তার বেশী আর জানার কিছু নাই। এবার কাজ করে যাও। আমার শরীর কোন রকমে চলছে। আশা করি কুশলে আছ।

(ভুবনেশ্বর আশ্রমে জনৈক সাধন-রত শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ মোকামাঘাট

৫।৮।৫০

বাসুদেবেষু—

আগে তোমার যে সব দর্শনাদি হ'ত, সে সব প্রায় বিলুপ্ত হওয়ায় তুমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছ। হওয়ারই কথা। কিন্তু যে কারণে এটা ঘটেছে, তা জানতে পারলে অনেকটা আশ্বস্ত হ'তে পারতে।

কিছুদিনের মধ্যে তোমার জীবনে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এটা তুমি হয়ত বুঝতে পার নাই, কিন্তু তা আমার দৃষ্টি এড়ায় নাই।

আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম, অর্থাৎ ঠাকুরের সেবা পূজার প্রতি আগে তোমার যে আগ্রহ ছিল, সেটা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে, ভাবভক্তির পরিবর্ত্তে জ্ঞান তোমার অন্তরে ধীরে ধীরে শিকড় চালিয়েছে। এটা যে তোমার ধর্ম্মলাভের অন্তরায় বা ঠাকুরের কৃপালাভের পরিপন্থী, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। যা ঘটেছে, তাই আমি বলছি। তোমার এই মানসিক পরিবর্ত্তনই তোমার বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দায়ী।

এই যে জ্ঞানের কথা বললাম, এ জ্ঞানের অর্থ—ভগবান জগতের প্রত্যেক বিষয়বস্তুতে অবস্থিত, অর্থাৎ সকল বিষয়বস্তুই ভগবান, এই বোধ। এই জ্ঞান যে তোমার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে তা নয়। তবে এই জ্ঞান আস্তে আস্তে তোমার অন্তরে তার আসন প্রতিষ্ঠার আয়োজন করছে। এই জ্ঞান তোমার মধ্যে যতই প্রকাশিত হচ্ছে, ভগবান বা ঠাকুরকে শুধু একটা বিষয়ে বা একটা বস্তুতে আরোপ করার বুদ্ধি বা আগ্রহ ততই কমে যাচ্ছে। যে দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ ছিল, সেটা ক্রমশঃ ব্যাপক হয়ে পড়ছে। যে মন একটা স্থানে আবদ্ধ থেকে আনন্দ অনুভব করত, সেটা বিশ্বের চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। পাখী যেমন খাঁচা ছাড়া হয়ে, ইচ্ছামত অনন্ত আকাশে ঘুরে একটা আনন্দ উপভোগ করে, তোমার মন-বিহঙ্গম তেমনি অনন্তের আভাষ পেয়ে সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনকে একটা স্থানে নিবিষ্ট করে রাখার দরুণ তা'তে তন্ময় হয়ে যাওয়ায় তোমার যে সব দর্শন হত, এখন তাকে অশ্বমেধের ঘোড়ার মত সর্ব্বত্র বিচরণ করার সুযোগ দিয়েছ বলেই সে সব দর্শন তোমার মধ্যে প্রকাশিত হয় না। ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে একটা গল্প বলি শোন।

এক ব্রাহ্মণের একটি বিগ্রহ ছিল। নাম তার বালগোপাল। ব্রাহ্মণ খুব নিষ্ঠাভক্তি সহকারে গোপালের পূজা করতেন। এই গোপাল মূর্ত্তি ছাড়া তাঁর অন্য আকর্ষণ ছিল না। দিবারাত্রি গোপালই তাঁর ধ্যান জ্ঞান ছিল। শেষে

অবস্থা এমন দাঁড়াল যে ব্রাহ্মণের সেবাপূজা প্রভাবে বিগ্রহটি জীবন্ত হয়ে ব্রাহ্মণের নিকট প্রকাশিত হ'ল। গোপাল ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথা কয়, হাসে কাঁদে নাচে গায়। কত আব্দার করে, কত খেলনার জন্য বায়না করে, খাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণকে উৎপীড়ন করে। ব্রাহ্মণও দিবারাত্রি গোপালের সঙ্গ ক'রে আনন্দে থাকেন। গোপালকে খাওয়ান, ধোওয়ান, তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যেখান থেকে যেমন করে হোক সংগ্রহ করেন, তাকে আদর করেন, ভালবাসেন, শাসন করেন। ঠিক নিজের ছেলের মতই তাকে দেখেন। এইভাবে পরমানন্দে গোপাল সেবায় ব্রাহ্মণের দিন কেটে যায়।

অকস্মাৎ একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যে সমস্ত ওলোট পালোট হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ রাত্রে গোপালকে নিজের কাছে নিয়ে শুতেন, আর ঘুম না আসা পর্য্যন্ত তাকে কত গল্প ছড়া ইত্যাদি বলতেন। গোপাল স্তব্ধ হয়ে সে সব শুনত। একদিন রাত্রে ব্রাহ্মণ গোপালকে ঘুম পাড়াচ্ছেন, এমন সময় একটা বিড়াল ম্যাঁও করে কেঁদে উঠল। তাই শুনে গোপাল ভয়ে জড়সড় হয়ে ব্রাহ্মণের কোলের মধ্যে লুকাল। ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে তাকে শান্ত করলেন।

ব্রাহ্মণের মধ্যে একটা ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল। এই গোপালই কি ভগবান? যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা, অনন্ত শক্তিমান, তিনি একটা বিড়ালের ডাকে ভীত হয়ে পড়েন? তিনি যদি সত্য সত্যই ভগবান হন, তবে তাঁর এ দুর্ব্বলতা কেন? ব্রাহ্মণের মনে একটা গভীর সংশয় জেগে উঠল। তাঁর অন্তরে এমন একটা আন্দোলন উপস্থিত হ'ল যে সে রাত্রে মোটেই তাঁর ঘুম হ'ল না।

সকালে উঠেই সবিস্ময়ে ব্রাহ্মণ দেখলেন, গোপাল স্থাণুর মত নিশ্চল হয়ে আছে। সে কথা কয় না, হাসে না, কাঁদে না আব্দার করে না। তাঁর সেবা পূজায় যে গোপাল জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, বুঝি বা রাতারাতি তার

জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হ'য়ে গেল। ব্রাহ্মণ সমস্ত দিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে আছাড় খেয়ে কাঁদতে লাগলেন।

রাত্রে ব্রাহ্মণ একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। ভগবান তাঁকে বলছেন, "স্থূল শরীরে আমাকে তুমি আর সম্ভোগ করতে পারবে না। আমি যে অনন্ত, অকস্মাৎ এই জ্ঞান তোমার মধ্যে প্রকাশিত হওয়ায়, তুমি অনন্তরূপেই আমাকে উপভোগ করবে। সান্তরূপে আমি তোমার নিকট যে লীলা প্রকট করেছিলাম, এখন হ'তে তা'থেকে তুমি বঞ্চিত থাকবে।"

আপাততঃ মনে হয়, এ যেন জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার দরুণ Adam এবং Eve এর Paradise থেকে নির্ব্বাসন। কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে এটা যে উচ্চ অবস্থা থেকে পতন, এমন মনে করবার কোন হেতু নাই। ব্রাহ্মণ গোপালকে হারিয়েছিল সত্য, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে ভগবানকে পেয়েছিল বিশ্বের সবখানে, জাগতিক প্রত্যেক বিষয় এবং সকল বস্তুর মধ্যে।

গীতায় ভগবানের সেই মহতী বাণী স্মরণ কর—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"। যারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে, তাদিকে সেইভাবেই আমি অনুগৃহীত করি। তাঁকে সাকারভাবে ভজনা কর, তিনি সাকার মূর্ত্তিতেই তোমার কাছে আসবেন। আবার তাঁর নিরাকার ভাবের ধ্যান করলে নিরাকার হয়েই তিনি তোমার উপর কৃপা বর্ষণ করবেন। তিনি সাকার এবং নিরাকার দুইই। তাঁর সাকারভাব নিরাকারভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ মূঢ়ের উক্তি। "কাকো নিন্দো কাকো বন্দো, দুনো পাল্লা ভারী"—ভগবানের সাকার এবং নিরাকার, এই দুই বিভাব সম্বন্ধেই কবীরজী এই উক্তি করেছিলেন।

অতএব তোমার নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। বিনা প্রয়োজনে কিছু হয় না। তোমার এই যে অবস্থান্তর প্রাপ্তি, এরও প্রয়োজন আছে। যে ভক্তি ও ভাব তোমার মধ্যে নানাপ্রকার দর্শন জাগিয়ে তুলেছিল, সে

অনেকটা নিম্নস্তরের। এই ভাব ভক্তির গাঢ়তা বা পরিপুষ্টি, জ্ঞান ব্যতীত সম্ভবপর নয় বলেই জ্ঞান ধীরে ধীরে তোমাকে আশ্রয় করছে এবং তোমার দর্শনসমূহ জ্ঞানের পরিপন্থী বলে এ গুলোকে চেপে রাখার প্রয়োজন হয়েছে। এটা সর্ব্বদা মনে রাখা চাই, যে অবস্থাই আসুক না কেন সেটা তোমার উন্নতিরই সূচক। তুমি যেটাকে অধঃপতন বলে আশঙ্কা কর, সেটাও তোমার উন্নতির সোপান ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সাধন নেওয়ার পর যে যে-অবস্থাই প্রাপ্ত হোক না কেন, সেটা তার উন্নতি ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না। গোসাঁইজীর সেই অমূল্য উপদেশ মনে রাখবে—"আমাদের এই সাধন উঠতে পড়তে শাঁখারীর করাতের মত দুই দিকেই কাটবে।"

তোমার সাধন নিষ্ঠা যেন কমে না যায়, এটাই তোমার লক্ষ্য হওয়া উচিত। অন্য কোন দিকে মন দেওয়ার প্রয়োজন নাই। নানাবিধ দর্শন, অদ্ভুত শ্রবণ বা বিভূতিলাভ না হ'লেই কিছু হ'ল না, এরূপ ভেবে মনকে অবসন্ন করবে না।

আশা করি কুশলে আছ। আমি অনেকটা ভাল।

(রংপুরের জনৈকা শিষ্যাকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ মজঃফরপুর

১৫।৮।৫৫

চিরায়ুষ্মতীষু—

মা, তোমার পত্র পেয়েছি। আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হয়েছে। তোমাদের পরিবারের কেহই ধর্ম্মকর্ম্মের দিকে যেতে চান না। কাজেই তাঁরা যে তোমার সাধন-পথের অন্তরায় হয়েদাঁড়াবেন, এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

শুধু যে ধর্ম্মকর্ম্মেই তাঁদের আস্থা নাই, তা নয়। তোমাদের বাড়ীর কি ছেলেবুড়ো, কি স্ত্রীপুরুষ, কারও মধ্যে কোন প্রকার কর্ম্মপ্রচেষ্টাই আমি দেখি নাই। শুধু খাওয়ার সময় হ'লেই জীবনের একটু স্পন্দন দেখতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া তাদিকে মড়া ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এমন সংসার আর কখনও আমার চোখে ঠেকে নাই। এ যেন একটা মহা-শ্মশান।

কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, সমস্ত বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে, এই শ্মশানেই তোমাকে সাধন করতে হবে। শব-সাধনা কা'কে বলে জান? অমানিশার গভীর অন্ধকারে নির্জ্জন শ্মশানে শবের উপর আসন করে সাধক সাধন করতে বসেন। সাধনে তার চিত্ত নিবিষ্ট হয়ে আসামাত্র আসনের মড়াটা নড়ে উঠে তাকে আসনচ্যুত করতে চায়, নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখায়। গুরুর আদেশমত সাধক তজ্জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকেন। দু'এক বোতল মদ এবং চাটের উপযুক্ত বিবিধ উপকরণ হাতের কাছেই রেখে দেন। মড়াটা ঘেউ ঘেউ করে উঠে সাধনায় বিঘ্ন ঘটাবার চেষ্টা করামাত্র সাধক একটুখানি মদ ও চাট তার মুখে দিয়ে দেন। কিছুক্ষণ শান্তভাবে থেকে মড়াটা আবার উৎপাত সুরু করে এবং সাধক আবার ঐভাবে তাকে শান্ত করেন। নেহাৎ বেগতিক দেখলে কখনও বা দু'একটা চড় কশে দিয়ে তাকে সায়েস্তা করেন। এইভাবে তাঁর সাধন চলতে থাকে। কখনও কখনও এমন হয় যে মড়াটার উপদ্রব থামান কঠিন হয় এবং কিছুতেই তাকে বাগে আনতে না পেরে সাধক ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েন। এই সঙ্গীন্ অবস্থার জন্যও ব্যবস্থা করা হয়। শ্মশানের অদূরে গুরু সজাগ থেকে মধ্যে মধ্যে মাভৈ বাণী উচ্চারণ করেন এবং শিষ্যের কাতর চীৎকার শোনামাত্র তার রক্ষার্থে অগ্রসর হন। অবশ্য এমনও শোনা যায় যে, অযোগ্য গুরুর হাতে পড়ে এই প্রকার অবস্থায় অনেক সাধকের জীবনান্ত হয়েছে। এমন কি ভূতের উপদ্রব হেতু শিষ্যের চীৎকারে গুরুর প্রাণে

অতিমাত্রায় ভীতির সঞ্চার হওয়ায় গুরু স্বস্থানেই মরে পড়ে আছেন, এমন দু'একটা ঘটনার কথাও শোনা যায়।

সংসার শ্মশানে তুমিও এইভাবে সাধন করতে বসেছ। তোমার পরিবারবর্গের (যাদিকে মড়া বলে অভিহিত করলেও অতিশয়োক্তি হয় না) বুকে বসে তুমি যে সাধন সুরু করেছ, তার প্রভাবে তাদের মধ্যে জীবনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তোমাকে সাধন-ভ্রষ্ট করার জন্য তারা ভীতি প্রদর্শন করছে। এ ক্ষেত্রে তোমার কি করতে হবে জানো? ঐ তান্ত্রিক সাধকের মত কখনও বা সেবার দ্বারা তাদের সন্তুষ্ট করতে হবে, আবার কখনও বা শাসনের দ্বারা বশীভূত করতে হ'বে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি তারা তোমার বিঘ্ন সাধনে অগ্রসর হয়, তাদিকে দাবিয়ে রাখার সমস্ত চেষ্টা যদি তোমার ব্যর্থ হয়, তবে কাতর প্রাণে গুরুকে স্মরণ করবে। তা হ'লেই তোমার উদ্বেগের কারণ তিরোহিত হবে। একথাটা যেন কোন কারণেই ভুল না হয় যে, আমি সদাসর্ব্বদা তোমার কাছেই আছি। তোমার সকল অবস্থাই আমি পর্য্যবেক্ষণ করছি এবং সঙ্কট মুহূর্ত্ত উপস্থিত হ'লে আমার সাহায্য হতে তুমি বঞ্চিত হবে না। কোনও ভয় করো না। সাধনে যদি তোমার আন্তরিকতা থাকে, তবে তোমার প্রতিবন্ধকতা করে কেউ কিছু করতে পারবে না। যাঁকে লাভ করার জন্য তুমি এত কষ্ট স্বীকার করছ, তাঁর কৃপাতেই সমস্ত অন্তরায় দূর হয়ে যাবে। গীতায় আছে—"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি"—আমাতে চিত্ত সমর্পণ করলে আমার কৃপাতেই তুমি সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে পারবে।" কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, যেমন বলেছি সেইভাবেই চলবে। তোমার তরফ থেকে যেন কোন শৈথিল্য না হয়; তারপর আমার কাজ আমি করব।

সাধন ভজন যদি ঠিকমত চালিয়ে যেতে পার, তবে যে সব দর্শন হচ্ছে,

তা ছাড়া আরও অনেক কিছু দেখতে পাবে। এই ত সবে আরম্ভ এই সব দর্শনের কথা ঘুণাক্ষরেও আর কারও কাছে প্রকাশ করো না।

আমি ভাল আছি। আশা করি কুশলে আছ। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তমাল, সুখমণি প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থই এ অবস্থায় তোমার পাঠ্য হওয়া উচিত। উপনিষদ্ প্রভৃতি জ্ঞানগ্রন্থ এ সময়ে তোমার পাঠের উপযুক্ত নয়। সময়ে আমি তার ব্যবস্থা জানাব। ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন।

(কলিকাতা মেডিকেল কলেজের জনৈক ছাত্রকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ বাঁকিপুর

১৮।১১।৫০

বাসুদেবেষু—

গুরুকরণের আবশ্যকতা আছে কি না, দীক্ষা নেওয়ার পর হঠাৎ তোমার মনে এই প্রশ্ন জেগে উঠল, এর অর্থ কি—সাধন নেওয়ার আগেই এই প্রশ্নের সমাধান করে, তারপর কর্ত্তব্য স্থির করা উচিত ছিল। এখন দৈব-দুর্ব্বিপাকবশতঃ গুরু-করণের সার্থকতা যদি তোমার হৃদয়ে প্রতিফলিত না হয়, তবে আমাকে আবর্জনার মত দূরে ঠেলে রাখবে না কি? তোমার এই দুরবস্থার কথা ভাবতেও আমার হৃৎকম্প হয়।

অধ্যাত্মজ্ঞান-লাভই যদি আমাদের কাম্য হয়, তবে অপর কারও দ্বারস্থ হয়ে এই জ্ঞান লাভ করতে হবে, এই সোজা কথাটা বোধগম্য না হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নাই। লিখতে বা পড়তে শেখার জন্য যদি শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, গান বাজনা শিখতে যদি ওস্তাদের সাহায্য নিতে হয়, কুস্তি বা লড়াই শেখার জন্য যদি গুরু করতে হয়; ছবি আঁকতে শেখা, সেলাই শেখা, রান্নাবান্না শেখার জন্য যদি তৎ তৎ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের উপদেশ গ্রহণ করতে

হয়, তবে "বজ্‌জ্ঞানান্নয়োজ্ঞানো"—যে জ্ঞানের উপরে আর জ্ঞান নাই, সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার মত দুরূহ ব্যাপার যে গুরু ব্যতীত সিদ্ধ হ'তে পারে না, এই বিষয়টা এত দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে কেন, তা আমার মাথায় আসে না। ভগবানের অস্তিত্ব যদি স্বীকৃত হয় এবং তাকে লাভ করার প্রয়োজনীয়তা যদি অনুভব হয়, তবে গুরুকরণের আবশ্যকতা অস্বীকার করার উপায় নাই। এই ভগবানকে লাভ করার অর্থ কি? নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করা মাত্র। আমরা সকলেই 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', অমৃতই আমাদের স্বরূপ। কিন্তু আমরা আমাদের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে, শোকের মোহের অধীন হ'য়ে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করছি। আমাদিকে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই গুরুর প্রয়োজন। একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টা বোঝাবার চেষ্টা করছি:

একবার একটা সিংহী শাবক প্রসব করা মাত্র মারা যায়। দৈবক্রমে এই সিংহশিশু একটা মেষের দ্বারা লালিত পালিত হয়। মেষশাবকের মধ্যে বসবাস এবং খেলাধুলা করার জন্য সিংহশিশু নিজেকে মেষ বলেই ধারণা করত এবং অমিতবিক্রমশালী হ'লেও আপনাকে মেষশিশুর মতই দুর্বল ও অসহায় মনে করত। হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি পরাক্রমশালী ও হিংস্র জন্তুর সম্মুখ থেকে সে ভয়ে পলায়ন করত, এমন কি শেয়াল কুকুরের ভয়েও সে জড়সড় হয়ে যেত। একটা সিংহ কিছুদিন ধরে এই ব্যাপার লক্ষ্য করলো এবং ঐ মেষ-ধর্মাবলম্বী সিংহ-শিশুর ভ্রম অপনোদন করার জন্য জোর করে তাকে একটা জলাশয়ের কাছে ধরে নিয়ে গেল। জলে তার প্রতিবিম্ব দেখে সে বুঝতে পারলে যে, সে মেষ নয়, সিংহ। তখন সে নির্ভয়ে বনমধ্যে বিচরণ করতে লাগল। তার গর্জ্জনে আকাশ বাতাস মুখরিত হ'য়ে উঠল, সমস্ত বনভূমি বিকম্পিত হয়ে গেল।

গল্পের এই সিংহশিশুর মত আত্মস্বরূপ-বিস্মৃত আমাদেরও বিড়ম্বনার অন্ত নাই। আমরা প্রত্যেকেই ব্রহ্মের এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ; অথচ

দুঃখ দুর্দ্দশার দুঃস্বপ্ন প্রতিনিয়ত সজাগ থেকে আমাদিগকে আতঙ্কগ্রস্ত করে রেখেছে। এই যে ভ্রান্তি বা মায়া, এর অপনোদন মোটেই সহজসাধ্য নয়। এই ভুল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য এমন একজন শক্তিশালী মহাপুরুষের প্রয়োজন, যিনি জীবের ঘাড়ে ধরে তাকে চৈতন্য-সমুদ্রের নিকট নিয়ে যান এবং তার প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ করান। অনেক সময় জীব আপনা হ'তেই নিজের দুর্দ্দশা উপলব্ধি করে নিজের উদ্ধারের জন্য গুরুর শরণাপন্ন হয়। আবার অনেক সময় এমনও হয় যে জীব নিজের ক্ষুদ্রতা নিয়েই আনন্দে মত্ত থাকে, জাগতিক বন্ধনই তাকে মুক্তির আনন্দ প্রদান করে, গুরুর আশ্রয় নেওয়ার কোন আবশ্যকতা সে অনুভব করে না। সেক্ষেত্রে গুরুই কখনও কখনও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে এনে তার উদ্ধার সাধন করেন। সদ্‌গুরু শুধু শরণাগত জীবকেই সাধন দেন তা নয়, যারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির দিক দিয়েও যে:ত চান না, সময় ও সুযোগ বুঝে তাদিকেও কবলিত করতে ছাড়েন না।

সে কথা যাক। তোমার প্রশ্নের মধ্যে এই সত্যটাই প্রকট হ'য়ে উঠেছে যে, তুমি সাধন নিয়েই তোমার কর্ত্তব্য শেষ করেছ, সাধন পথে চলার কোন কষ্টই স্বীকার কর নাই। কারণ, মাত্র একমাস কালও এই সাধন নিয়মিত-ভাবে করেছে, অথচ দীক্ষা নেওয়ার সার্থকতা উপলব্ধি করে নাই, এমন হতভাগ্য কেউ থাকতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে সাধনকেই যদি আঁকড়ে ধরে থাকতে পারতে, তবে সাধন গ্রহণের সার্থকতার বিষয়ে সন্দিহান হ'তে হ'ত না।

গুরু-নির্দ্দিষ্ট পথে চলার সুবুদ্ধি যদি তোমার মধ্যে জাগ্রত হ'ত, তবে গুরু-করণের আবশ্যকতা আছে কিনা, এরূপ কোন প্রশ্নই তোমার মনে উদয় হ'ত না।

কোন প্রকার সন্দেহ করো না। আমাদের সাধন সনাতন বস্তু।

যে মন্ত্র বা নাম পেয়েছ, তাও খুব শক্তিশালী। এমন জিনিষের অমর্য্যাদা করে নিজের সর্ব্বনাশ টেনে এনো না। গুরু বা সাধনের উপকারিতা যে এখনও বুঝতে পারছ না, তার কারণ তোমার গুরুনিষ্ঠার অভাব এবং সাধনে শৈথিল্য। সাধনের সময় যে উপদেশ পেয়েছ, সেইমত অন্ততঃ কিছুদিন চললেই আপনা হ'তেই গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবে। পত্রের দ্বারা বা উপদেশের সাহায্যে তা তেমনভাবে বোঝান সম্ভব নয়।

আমার শরীর এখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ। তোমরা ঠিক পথে চললেই আমার সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য, সামর্থ্য কিছুরই অভাব থাকে না। তা না হ'লেই নানা-প্রকার উপদ্রব আমাকে ঘিরে ফেলে। ঠাকুর তোমার মধ্যে সুবুদ্ধি জাগ্রত করুন। কল্যাণমস্তু।

(জামসেদপুরের জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

সদ্‌গুরু নিবাস
ভুবনেশ্বর
২।৮।৪৮

বাসুদেবেষু—

কা'কে কী বলেছি, না বলেছি, তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি? তোমার জীবনের পক্ষে যা কল্যাণকর, তাই করবার জন্য তোমাকে উপদেশ দিয়েছি। পক্ষান্তরে আর একজনের জীবনের সঙ্গে অধিকাংশ বিষয়ে তোমার অমিল বলে তা'কে হয়ত বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ

করবার নির্দ্দেশ দিয়েছি। একে পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্য বলে না ; এইটাই নিয়ম, আর এর অন্যথা করাই অনিয়ম। মা কোন ছেলেকে মাছের ঝোল ভাত দেন, আবার কোন ছেলেকে জল বার্লি দেন। ডাক্তার কোন রুগীকে তিক্ত কুইনাইন খেতে বলেন, আবার কারও জন্য মিষ্টরসাস্বাদযুক্ত সিরাপের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষক কোন ছাত্রের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেন, আবার কাউকে বা শাস্তি দেন—এই প্রকার ব্যবস্থা-বৈষম্যের অনুসরণ দ্বারাই সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। মুড়ী মিছরীর এক দর করাকে সাম্য বলে না, বরং এইটাই বৈষম্য।

আমার কাছে যা'রা এসেছে, বা ভবিষ্যতে আসবে, তা'দিকে আমার উপদেশ নির্ব্বিচারে মেনে চলতে হ'বে। বিচার ধর্ম্মলাভের একটা শ্রেষ্ঠ পন্থা এবং সব বিষয় বিচার করেই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু গুরুর উপদেশ সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। গুরুর উপদেশ সম্বন্ধে কোন বিচারই চলে না। অধিকাংশ স্থলে বিচার দ্বারা গুরুর আদেশের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা যায় না ; সে ক্ষেত্রে বিচারকে দোষযুক্ত মনে ক'রে, গুরুর আদেশকেই অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে হয়। তোমরা সাধারণতঃ বাহ্য লক্ষণ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমূহকে অবলম্বন ক'রে, তোমাদের বিচারের সৌধ রচনা কর। গুরু কিন্তু তা করেন না। বাহ্য ব্যাপারগুলোকে ততটা গণনার মধ্যে না এনে, গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তিনি শিষ্যের মনের মানুষটাকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন এবং তাকে ঠিকভাবে গড়ে তোলবার জন্য যথোচিত উপদেশ প্রদান করেন। গুরু যে অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে শিষ্যকে শিক্ষা দেন শিষ্যের তা থাকা সম্ভব নয় বলেই অনেক সময়ে তারা গুরুর উপদেশের তাৎপর্য্য না বুঝে অযথা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে।

তোমরা সকলেই ঈশ্বর-বিমুখ, এই হিসাবে তোমাদের ব্যাধি অনেকটা এক পর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু ব্যাধি এক হ'লেও লক্ষণের তারতম্য আছে বলে

সবারই জন্য একই রকম পেটেণ্ট ঔষধের ব্যবস্থা করলে অনেক সময় কুফল দেখা দিতে পারে, তা'তে সন্দেহ নাই। যেমন, যে কোন জ্বররোগে (যথা Typhoid Fever এ) যদি Edwards Tonicএর ব্যবস্থা করা যায়, তবে কখনও কখনও রোগীর অবস্থা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। যাদের ডাক্তারকে call দেওয়ার মত অবস্থা নয়, তা'দিকে বাইরের লক্ষণ দেখেই, অসুখ হ'লে Patent ঔষধের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় বটে; কিন্তু যারা ডাক্তারের আশ্রয় নিয়েছে, তারা Patent ঔষধের উপর আস্থা স্থাপন না করে ডাক্তারের ব্যবস্থা মতই চলে এবং এইটাই অধিকতর নিরাপদ পন্থা। তোমরা যখন ডাক্তারের আশ্রয় নিয়েছ, আমাকে তোমাদের উপদেষ্টা বলে বরণ করেছ, তখন Patent ওষুধ ব্যবহার করার আবশ্যকতা কি? আমার কাছে যারা এসেছে, ব্যক্তিগতভাবে আমি তাদের সঙ্গে পরিচিত। তাদের নাড়ীনক্ষত্র আমার বিশেষভাবে জানা আছে বলে, যার পক্ষে যা দরকার তাকে তেমনি Prescription দিয়ে থাকি। একই রকমের Prescription যদি সকল রোগীর জন্য ব্যবস্থা হ'ত, তা হ'লে অলিতে গলিতে ডাক্তারের ছড়াছড়ি হ'ত, আর রোগীরও কর্ম্মভোগের অন্ত থাকত না।

গুরুর কাছে অন্ধ হ'তে হবে। বিশ্বাস আর আনুগত্যই গুরু-করণের প্রথম এবং শেষ কথা। কোন প্রকার সন্দেহ না করে আমার ব্যবস্থামত যদি চলতে পার, তবে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। নতুবা প্রতিপদে সন্দেহকে পাথেয় করে যদি ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়ার আশা কর, তবে অবশেষে ব্যর্থতাকেই বরণ করে নিতে হ'বে। নৌকা নিরাপদে পরপারে পৌঁছে দেবার সামর্থ্য না থাকলে মাঝি সচরাচর যাত্রীদিকে তার নৌকায় আরোহণ করতে উপদেশ দেয় না। কারণ, এতে যে শুধু যাত্রীদেরই বিপদের আশঙ্কা থাকে তা নয়, তার নিজের জীবনের আশঙ্কাও কম

থাকে না। আমিও তেমনি আমার সামর্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হ'লে আমার আশ্রয়প্রার্থীদের ভার নিয়ে তাদের সঙ্গে ভরাডুবি হওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করতাম। অবশ্য, শিষ্যদের ভার নিয়ে তাদের সঙ্গে নিজেও তলিয়ে যান, এমন অযোগ্য ও হঠকারী গুরুর সংখ্যাও যে নিতান্ত কম নয়, একথা গোপন করলেও সত্যের অপলাপ করা হবে। আশা করি, এদের সঙ্গে আমাকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করে তোমরা আমার প্রতি অবিচার করবে না।

আজ এই পর্য্যন্ত। আশা করি কুশলে আছ।

(শ্রীশ্রীসন্তোষনাথজীর জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ
ফুলতলা
৫।৭।৫৩

বাসুদেবেষু—

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার ঠাকুরের সম্বন্ধে আমি যা জানি আগে তার পরিচয় দিয়ে, পরে তোমার চিঠির বিষয়ে যা' বক্তব্য, তা' বলছি।

পূর্ব্বে কয়েকবার দিনকয়েকের জন্য বাবু-মহারাজের সঙ্গ ক'রবার সুযোগ হ'লেও আমি কর্ম্মত্যাগ করার পর পুরী-আশ্রমে বাসকালে বৎসরাধিক কাল নিবিড়ভাবে তাঁর সাহচর্য্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলাম। গুরুকৃপা ও স্বীয় সাধনবলে তিনি তৎকালে যে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ ক'রেছিলেন, তা' প্রত্যক্ষ করে আমি বিস্ময়ে ও পুলকে অভিভূত হয়ে যেতাম। তিনিও আমাকে বিশেষভাবে তাঁর গুণমুগ্ধ জেনে অকপটে আমার কাছে তাঁর হৃদয়-দুয়ার উন্মুক্ত ক'রে তাঁর আত্মানুভূতির এবং তাঁর মধ্যে যে শক্তির খেলা

তখন চলেছিল, তার পরিচয় দিতেন। তারপর কীভাবে তিনি সাধন দেওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন, কী ভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দীক্ষা দিতে বাধ্য হ'লেন, সে সব অলৌকিক কাহিনীও তিনি আমার কাছে অপ্রকাশ রাখেন নাই। আধ্যাত্মিকতার পথে তাঁর অগ্রগতি যাতে ব্যাহত না হয়, এ জন্য আমিও তাঁকে সাধ্যমত লোকদৃষ্টির অন্তরালে রেখে, তাঁর সাধনপুষ্টির যথোচিত সহায়তা করতাম; কারণ তৎকালে তাঁর কোন কোন অস্বাভাবিক আচরণে লোকে তাঁকে মস্তিষ্ক-বিকৃত বলে কটাক্ষ করতে ছাড়ত না। ঠাকুরের আশ্রয় লাভের পর থেকে তাঁর অন্তর্ধানের সময় পর্য্যন্ত তাঁর যে জীবন-কথা তাঁকে বহু চেষ্টায় লিপিবদ্ধ করাতে সক্ষম হয়েছিলাম, তা'তে তিনি অনেক কথাই গোপন করে গেছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর তিনি যে সুউচ্চ পরমহংস অবস্থা লাভ করেছিলেন, তার কোন পরিচয় এতে নাই; কাজেই তাঁর আসল স্বরূপ এতে মোটেই ধরা পড়ে নাই। আমাকে একাধিকবার তিনি বলেছিলেন যে আমাকে ছাড়া আর কাউকে তিনি তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা বলেন নাই। কাজেই তোমাদের ঠাকুরের আধ্যাত্মিকতার দিকটার পরিচয় যতটা আমি জানি, আর কা'রও পক্ষে তা' জানা সম্ভব নয় এবং সে পরিচয় সম্যক জানি বলেই দৃঢ়তার সঙ্গে আমি এই কথাই তোমাদিকে বলতে চাই যে গৃহী হ'লেও তাঁর মত আদর্শ-চরিত্র সন্ন্যাসী ক্বচিৎ দেখা যায়। তাঁর মত মহাপুরুষ আজ পর্য্যন্ত আমার চোখে খুব কমই পড়েছে।

আমাদের ঠাকুরের কোন ত্যাগী সাধু সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী শিষ্যকে গুরুরূপে বরণ করাই তোমার প্রাণের কামনা ছিল। আমার এবং আরও কয়েকজনের সম্বন্ধে বিকৃত অভিমত শুনে এবং উপযুক্ত কারও সন্ধান না পেয়ে, তুমি বাবু-মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলে। তার জন্য একটা ক্ষোভ এখনও তোমার মনের গোপন কোণে থেকে গেছে, তোমার পত্রখানা এই রকমেরই একটা ধারণা জন্মিয়ে দেয়। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, আমার সম্বন্ধে নানা

রকম প্রতিকূল সমালোচনা শুনেও তুমি তোমার সাধন-সঙ্কটের কথা আমাকে জানিয়ে শান্তিলাভের আশা করেছ ; তোমার এই মোহ উপস্থিত হওয়ার কারণ কী? শুধু বয়সে নয়, আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়েও তোমার ঠাকুরের কাছে আমি নিতান্ত শিশু ছিলাম, একথা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করতে আমার কোন সঙ্কোচ নাই। তুমি যে জ্বালার কথা আমাকে পরিচয় দিয়েছ, এর উৎপত্তি তোমার মনোমত গুরুলাভ না করার জন্য নয়। গুরু তোমাকে যে পথ ধরিয়ে দিয়েছেন—এই জ্বালা যে সেই পথের পাথেয়। গুরুনির্দিষ্ট পথে যতই তুমি অগ্রসর হ'বে ততই তোমার জ্বালা বাড়বে, কারণ যতই দিন যাবে তোমার অগ্নিপরীক্ষা ততই কঠোর হ'তে কঠোরতর হবে। যতই উপরের শ্রেণীতে উঠা যায়, পরীক্ষা যেমন ততই কঠিন হয়, তেমনি তুমিও যতই সাধনার উচ্চ স্তরে আরোহণ করছ, তোমার অগ্নিপরীক্ষাও ততই কঠোর হচ্ছে এবং জ্বালাও ততই বাড়ছে। আমি নিজেও যে এই জ্বালায় জ্বলছি। আধি, ব্যাধি, নিন্দা প্রভৃতিকে সম্বল করে রুদ্ধশ্বাসে আমার ঠাকুরের দিকে ছুটেছি তাদিকে সঙ্গে নিয়ে, যারা আমাকে একান্ত আপনার জন ভেবে আমাকে আঁকড়ে ধরে আছে। কাজেই আমার মত তাদেরও অনেককে জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'তে হচ্ছে এবং তুমি যে জ্বালার কারণ তোমার গুরুর প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন সন্দেহের ভাব পোষণ করছ, তারাও হয়ত ঠিক তেমনিভাবে আমার যোগ্যতায় সন্দিহান হয়ে আমার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে উঠছে। এ পথের যে এই পাথেয়, এ বিয়ের যে এই মন্ত্র! সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করলেই সব দিকে নিরাপদ হওয়া যায় এবং হেসে খেলে নিশ্চিন্ত মনে জীবনটাকে উপভোগ করা যায়, এরূপ একটা ধারণা অনেকেই পোষণ করে থাকে। এইজন্য সংসার গহনের মধ্য দিয়ে যাত্রাকালে যখনই তাদিকে হোঁচট খেতে হয় তখনই তাদের গুরুর উপর একটা অবিশ্বাস এসে পড়ে। এই কথাটা খুব দৃঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, সদ্‌গুরুর আশ্রয় নেওয়ামাত্র প্রারব্ধের ভোগগুলো খুব দ্রুত শেষ

হ'তে আরম্ভ হয় বলে, শিষ্যকে নানাপ্রকার দুর্বিপাকের মধ্যে পড়তে হয়। এটা গুরুর আশ্রয় নেওয়ার কুফল নয়, বরং গুরুর আশ্রয় নেওয়া যে সার্থক হয়েছে, এইটাই তার প্রমাণ এবং এজন্য মানসিক অশান্তি ভোগ না করে বরং কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ করাই উচিত। তুমিও আনন্দ কর। কারণ, যে জ্বালায় তুমি জ্বলছ, এতে তোমার ভিতরের গলদ্‌গুলো পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছে, আর তুমি ক্রমশঃ বিশুদ্ধ এবং নিষ্পাপ হয়ে উঠছ। খাঁটি না হ'তে পারলে তোমার সেই 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারবে কেন? তাই সোনাকে পুড়িয়ে তার খাদ বার করে যেমন তাকে বিশুদ্ধ করে নেওয়া হয়, তেমনি তিনিও তোমাকে পুড়িয়ে নির্দোষ করে নিচ্ছেন। তাই আবার বলি আনন্দ কর, নির্ভয় হও।

সেই পরমপুরুষকে কিনে নিতে হ'বে। যে মূলধন দিয়ে তাঁকে কেনা যায়, তা' তোমার ঠাকুর তোমাকে দিয়ে গেছেন। সেই মূলধনের সদ্ব্যবহার কর তবেই তিনি একান্তভাবে তোমার কেনা হয়ে থাকবেন। কিন্তু গুরুর উপর যদি অবিশ্বাস থেকে যায়, তবে তাঁর দেওয়া মূলধনের উপরেও আস্থা থাকা সম্ভব নয়। কাজেই অধিকাংশ সময়ে শিষ্য তার গুরুর দেওয়া অমূল্য নিধির অপচয় করে নিজের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে। অতএব খুব সাবধান।

তোমার অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর তোমার ঠাকুরেরই হাতের লেখা এই চিঠিতে পাবে।*

তুমি নিশ্চিন্ত হও। কল্যাণ হোক্।

[* এই পত্রখানির ব্লক মুদ্রিত অনুলিপি পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।]

(শ্রীমৎ দরবেশজীর জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

সদ্‌গুরু নিবাস
ভুবনেশ্বর
১৮।৪।৫৩

বাসুদেবেষু —

আপনার পত্র পেয়ে সুখী হ'লাম। গুরুগিরি অনেকেই করছে, কারণ এতে লৌকিক বাধা কিছু নাই। তা ছাড়া বাইরের থেকে মনে হয়, এমন আরামের আর লাভের ব্যবসাও খুব কমই আছে। কিন্তু গুরুর আদেশ বা উপদেশের অপেক্ষা না রেখে মনোমুখী হয়ে জটা রেখে, ভস্ম মেখে, তিলক চর্চ্চা করে, রংবেরংয়ের কাপড় পরে গুরু সাজাটাই বড় কথা নয়। গুরুগিরির যোগ্যতা অর্জ্জনই আসল কথা। এই যোগ্যতা কার আছে, কার নাই, কোন্ কষ্টিপাথরে ঘসে তা যাচাই করতে হ'বে, তা ঠিক করাও এক দুরূহ ব্যাপার। আমাদের ঠাকুরের প্রত্যক্ষ ও লিখিত আদেশ (বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম চিরকাল প্রতিপালন করা এবং ব্রাহ্মণ শিষ্য হতে প্রণালীমত দীক্ষালাভ যারা করবে মাত্র তাদেরই প্রশিষ্য বলে গণ্য করা) উপেক্ষা ক'রে কোন কোন অব্রাহ্মণ শিষ্য নিজেদের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী বলে পরিচয় দেন এবং দীক্ষাও দেন। কাজেই সাধারণ লোকে অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। নকলকে আসল মনে করে প্রতারিত হয়। অনেকে নানারকম তুক্‌তাক্ ওষুধপত্র, হাতদেখা, Thought reading, ভেল্কিবাজী প্রভৃতি দেখিয়ে সেইগুলোকে যোগসিদ্ধি বলে প্রচার

করে জনসাধারণকে মোহিত করে। এ সব সম্বলও যাদের নাই, তারা অনেক সময় স্বপ্নে কোন দেবতা বা পরলোকগত গুরুর কাছ থেকে গুরুগিরি করার প্রেরণা বা চাপরাস্ লাভ করেছে বলে প্রচার করে। এই প্রেরণা বা আদেশ লাভের কথাটা তারা হয়ত মিথ্যা বলে না। দেবতা বা গুরুমূর্ত্তি হয়ত অকস্মাৎ প্রকাশিত হয়ে তা'দিকে স্বপ্নে বা অন্য প্রকারে এইরূপ প্রত্যাদেশ প্রদান করেন। কিন্তু এমনও হ'তে পারে যে ঐ সব দেবতা বা গুরুমূর্তি যা' তাদের গোচর হয়, সেগুলো তাদের আসল স্বরূপ নয়। এ সব তাদেরই কল্পনা দিয়ে গড়া—মায়া বা মিথ্যা। কাজেই যেটা সে প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ বলে মনে করে, সেটাও মোটেই সত্য নয়। সিদ্ধির পরিপক্ক অবস্থা লাভ না করা পর্য্যন্ত এই রকম প্রত্যাদেশ পেয়েছে বলে অনেকে যে একটা সোরগোল তুলে বসে, তা'তে মোটেই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়। আমাদের ঠাকুর এই সব দর্শন বা তথাকথিত প্রত্যাদেশকে মোটেই আমল দিতেন না। দরবেশকাকাও এ সব বুজ্‌রুকীকে কেমন ঘৃণা করতেন দেখেছেন।

একদিন পুরীতে আমাদের ঠাকুরবাড়ীর ছাদে ঠাকুর, দরবেশজী ও অন্যান্য আমরা অনেকে বসেছিলাম। এমন সময় * * এসে বললেন, "জগন্নাথদেবের আদেশ হয়েছে, আমাকে অমুক কাজ করতে হবে।" ঠাকুর বললেন, "আদেশ, না আপনার মাথা খারাপ। আজ আপনি করবেন, কাল অন্যে এসে সব তুলে দেবে।" আমি ঠাকুরের কথা শুনে দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়লাম। একে গোসাঁইজীর অনুগৃহীত, এতদিন সাধন ভজন সেবা নিয়ে আছেন, তাঁর প্রতি জগন্নাথদেবের আদেশকে কিনা ঠাকুর মাথা খারাপ বললেন। সুযোগমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন "সাধনে প্রকৃত অবস্থা লাভ না করা পর্য্যন্ত নিজেকে বোঝা যায় না। বাসনা কামনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে নানাভাবে সাধককে প্রতারিত করে।

মাথার বিকার উপস্থিত হ'লে ত' অনেকে অনেক কিছু দেখে ও শোনে। এতে তারা নিজেরাও প্রতারিত হয় এবং অন্যকেও প্রতারিত করে। অনেকে এইভাবে গুরুগিরিও করছে। খুব সাবধান।" শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা পরে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হওয়ায় পূজ্যপাদ দরবেশজী আমাকে সেই কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়ে কয়েকখানি পত্র দেন।

আমার প্রস্তাবিত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম সম্বন্ধে আমার গুরুভাইদের মধ্যে কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, ঠাকুরের কাছ থেকে আমি এ বিষয়ে কোন আদেশ পেয়েছি কিনা। ব্রহ্মচর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়াতে আজকাল শিক্ষার উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে পণ্ড হয়ে যাচ্ছে। এই কথাটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করে বহুদিন থেকে আমি ছেলে ও মেয়েদের জন্য দু'টি পৃথক বিভাগ খুলে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার কল্পনা করে আসছি। যে সকল মহাপুরুষদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমার জীবনে ঘটেছে তাঁরা, বিশেষতঃ আপনার ঠাকুর শ্রীমৎ দরবেশজী মহারাজ ও শ্রদ্ধেয় শ্রীহেমেন্দ্র গুহ রায় মহাশয় আমার পরিকল্পনার কথা শুনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন এবং এই কার্য্যে তাঁদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা থাকবে বলে উৎসাহ দিয়েছিলেন। জনকল্যাণের মহান এবং উদার আদর্শই যেখানে প্রকট হ'য়ে দেখা দেয়, স্বার্থবুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা যেখানে তার ত্রিসীমানায় আসতে পারে না—অর্থ, সম্মান, আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কিছুই যেখানে গণনার মধ্যে আসে না, সেখানে আমাদের সঙ্কল্প বা আকাঙ্ক্ষার মূলে যে ঠাকুরের বিরাট ইচ্ছাই বর্ত্তমান থাকে, এ তত্ত্বটা অতি স্বচ্ছ ভাবে আমার নিকট প্রতিভাত হয়। পক্ষান্তরে স্বার্থবুদ্ধির লেশমাত্র যদি মনের ফাঁকে উঁকি মারে, তবে গুরু বা দেবতা সশরীরে আবির্ভূত হ'য়ে কোন মহৎ প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠানের স্বপক্ষে আদেশ দিলে তাকে মিথ্যা আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

আমার পরিকল্পনা (যার বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে করেছি) কোনদিন বাস্তবে পরিণত হবে কিনা তা ঠাকুরই জানেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় বসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা একদিন করেছিলেন, তা প্রায় ৪০ বৎসর পর বাস্তবে পরিণত হতে আমরা দেখেছি। আমি চিরকালই আশাবাদী। আমি যে রক্তবীজের ঝাড় রেখে যাব তারা একদিন না একদিন আমার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত অবশ্য করবে। পুরী-ঠাকুরবাড়ী আশ্রমের দুর্নীতি দূরীকরণের প্রতিও তারা উদাসীন থাকবে না।

আশ্রম গড়ে তুলতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। তাই চোরা কারবারের যুগে যে যেদিক থেকে যেমন করে পারে অর্থ উপার্জ্জন করাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে ঠিক করে নিয়েছে। কাজেই সৎ উদ্দেশ্যে বা ধর্ম্মার্থে কেউ মুক্তহস্তে ব্যয় করবে সে আশা কম। অনেকেই এ সব পরিকল্পনাকে পাগলামী বলে উড়িয়ে দেবে। মুষ্টিমেয় লোকেদের যদি এ সব বিষয়ে খরচ করার আগ্রহও থাকে, তবে যাদের কিছু না দেওয়ার মতলব তারা পিছু পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তা'দিকে এ সব কাজে অর্থ সাহায্য না করতেই প্ররোচিত করবে। আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, বিগত মহাযুদ্ধে শুধু মানুষই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই মনুষ্যত্বের উপরেও নিদারুণভাবে অস্ত্র প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং এইটাকেই এই যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা কুফল বলে আমি মনে করি। মানুষ নিহত হ'লে আবার মানুষ জন্মাবে। কিন্তু যে মানবতা এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে, তাকে বাঁচিয়ে তোলা এক রকম অসাধ্য সাধন। কিন্তু তা বলে নিরাশ হলেও ত' চলবে না।

অর্থের প্রশ্ন ছাড়াও আমার প্রস্তাবিত আশ্রমের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বা ছাত্রছাত্রী জুটবে কিনা সেটাও ভাববার কথা। সুশিক্ষিত এবং চরিত্রবান্ পুরুষ শিক্ষকের অভাব হ'বে বলে আমি মনে করি না। স্ত্রীশিক্ষার

প্রচলন তেমন নাই বলে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ করা এক দুরূহ ব্যাপার। আমার উচ্চশিক্ষিতা শিষ্যাগণের মধ্যে কয়েকজন ব্রহ্মচারিণী থেকে আমার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার সঙ্কল্প নিয়ে আদর্শ জীবন গঠনে ব্রতী আছে। অনুকূল অবস্থা হ'লে এরাই নারী-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গড়ে তুলবে। তা ছাড়া আমার শিষ্য-শিষ্যাগণের ভিতর থেকেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী নির্ব্বাচিত করতে হ'বে, এমন সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি আমার নাই। উপযুক্ত হ'লে বাইরের লোক নিতে কোন বাধা হ'বে না। শ্রীনামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনুকূল্যদাতা। তাই আমার তাঁরই উপর নির্ভরতা। শ্রীনাম জয়যুক্ত হোন্। প্রীতি ভালবাসা জানবেন।

(ফরিদপুরের জনৈক ভক্তকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্গুরু শরণম্ ডিপাড়া

২১।১০।৪৭

বাসুদেবেষু—

ঠাকুরের খেলা যদিও অনেক সময়েই আমাদের বোধগম্য হয় না, তথাপি ধীরভাবে চিন্তা করলে তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসতে না পারি এমনও নয়। তোমার দেহটাকে পঙ্গু করে তোমার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের সমস্ত পথ তিনি রুদ্ধ করে রেখেছেন, অথচ এতগুলি পোষ্য তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন কেন, এ কথা বোঝা কঠিন। তোমার যখন নিজের কোন ক্ষমতা নাই, তখন তোমার নিজের, তথা তোমার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য অপরের করুণার উপর নির্ভর করা ছাড়া তোমার উপায় নাই। অথচ কেউ দয়াপরবশ হ'য়ে এত বড় একটা পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার বহন করবে, তারও কোনও সম্ভাবনা নাই। সংসারে তেলা মাথাতেই লোকে তেল দেয়, ফিরে পাওয়ার আশাতেই লোকে দান করে।

এখানে আছে শুধু দোকানদারী। 'ফেল কড়ি, মাখ তেল', এই হচ্ছে সংসারের নীতি। তোমার দৈহিক অক্ষমতার জন্য তুমি কখনও কারও কোন উপকারে আসবে, তার কোন সম্ভাবনাই নাই; কাজেই অপর কেউ তোমার কোন উপকার করবে তারও কোন ভরসা নাই।

তবে উপায় কি? তোমার নিজেরও কোন ক্ষমতা নাই, অপরের উপর নির্ভর করেও কোন লাভ নাই। এ ক্ষেত্রে তোমার কর্ত্তব্য কি? এ অবস্থায় ভগবানের উপর নির্ভর করে পড়ে থাকা ছাড়া, তোমার আর কোন উপায় নাই। সমস্ত দুয়ার যখন রুদ্ধ, তখন ভগবানের দুয়ার ধরে পড়ে থাকাই তোমার পক্ষে একমাত্র পন্থা এবং ঠাকুরের ইঙ্গিতও তাই। তাঁর প্রতি তোমার মনকে আকৃষ্ট করবার জন্যই তিনি এত বড় একটা সংসারের ভার তোমার উপর অর্পণ করেও জীবিকা অর্জ্জনের কোন পথই উন্মুক্ত রাখেন নাই। তাঁর উদ্দেশ্য অনুধাবন করে অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে যদি একান্তভাবে তাঁরই শরণাপন্ন হতে পার, তবে তুমি তোমার পরিবারবর্গের সহিত অলৌকিকভাবে রক্ষা পাবে। আর তা যদি না পার, তবে অচিরে তোমাদের অস্তিত্ব জগৎ থেকে মুছে যাবে, ভব-জলধির কোন্ অতলতলে তোমরা তলিয়ে যাবে, তার কোন সন্ধানও পাওয়া যাবে না।

তুমি নিজেকে খুব অসহায় বলে মনে করছ এবং সংসারী লোকের পক্ষে তা করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আমি কিন্তু দেখছি তুমি খুব ভাগ্যবান। সমর্থ বা সম্পদ্‌শালী ব্যক্তিরা মনে করে যে, তাদের ক্ষমতা বা ঐশ্বর্য্য তাদের নিজস্ব বা স্বোপার্জ্জিত। এ সব যে ভগবানের দেওয়া, তারই ছিটেফোঁটা লাভ করে যে তারা জগতের বুকে সদর্পে চলাফেরা করে, এ সত্যটা অস্বীকার করে নিজেদের মাথায় রাজমুকুট চাপিয়ে দিয়ে তারা তাঁকে অবজ্ঞা করে। তিনি ছাড়া যে আমাদের অন্য পথ নাই, এই সহজ সত্যটা মানতে চাই না বলে, তিনি আমাদিগকে এমন অবস্থার মধ্যে টেনে এনে ফেলেন যে অন্য

সকল দুয়ার আমাদের রুদ্ধ হয়ে যায়। তাঁরই শরণাগত তাঁরই উপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া আমাদের কোন পথই খোলা থাকে না। অতএব এই দুর্দ্দিনে তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা আমার পক্ষে খুব সোজা। অনন্যচিত্ত হয়ে তোমাকে ভগবানের শরণাপন্ন হ'তে হ'বে।

তোমার এবং তোমার পরিবারবর্গের দেহ প্রাণ তো ভগবানের দেওয়া; আরও ঠিকভাবে বললে বলতে হয় যে, এ সব তাঁরই। তাঁর জিনিসের উপর যদি তাঁর দরদ না থাকে, তবে তোমারই বা এত মায়া কেন? তোমার কাছে যা তিনি গচ্ছিত রেখেছেন, তার রক্ষণাবেক্ষণ করা যদি তোমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠে, তবে তাঁর জিনিষ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত এবং নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাই ত সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা। তোমার কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করলেই তুমি দেখতে পাবে, তোমার এবং তোমার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ ইত্যাদির যাবতীয় ভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন। অতএব সংসারের প্রতি লক্ষ্য না করে তুমি তাঁরই উপর লক্ষ্য স্থির রাখ, সংসার চিন্তা না করে তাঁরই চিন্তা কর এবং এ সুযোগ অযাচিতভাবে তোমার নিকট সমুপস্থিত ভেবে আনন্দ কর।

মানুষের দিকে তাকিয়ে কোন লাভ নাই, তাতে অভাবের নিবৃত্তি হয় না, তৃষ্ণা দূর হয় না। চাতকের মত একনিষ্ঠ হ'তে হ'বে। চাতক যেমন তৃষ্ণায় প্রাণ গেলেও তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য কোন জলের প্রত্যাশা করে না (সে জল যতই বিশুদ্ধ বা পবিত্র হোক্ না কেন) তেমনি তুমিও অভাব নিবৃত্তির জন্য ভগবানের দিকে তাকিয়ে থাক, আর কারও মুখাপেক্ষী হয়ো না। যদি সপরিবারে তোমার ধ্বংস অনিবার্য্য হয়েও ওঠে, তবু তোমার নিষ্ঠা যেন চাতকের মত অচল থাকে। একটা সামান্য পাখী যা পারে, ভগবানের সৃষ্ট জীবসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েও তুমি তা না পারবে কেন?

আমার শারীরিক ভোগ সমানভাবেই চলেছে। কিন্তু এজন্য আমার কোন উদ্বেগ নাই। তাঁরই দেহ, তিনি যেমন ইচ্ছা রাখুন, এতে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন প্রশ্ন নাই, থাকা উচিতও নয়। আশা করি কুশলে আছ। মধ্যে মধ্যে পত্র দিয়ে বা সাক্ষাৎ করে একটা যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে; তা'তে অনেক উপকার পাবে।

(পাটনার জনৈক যুবক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ টাটানগর

৫।১০।৪০

বাসুদেবেষু—

কুমড়ার ফুল ও ফলের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধির কেমন একটা সামঞ্জস্য আছে লক্ষ্য করেছো? ফল যত বড় হয়, ফুল তত ছোট হয়। এমনি ভাবে ফুল ছোট হ'তে হ'তে ক্রমশঃ শুকিয়ে ঝরে পড়ে। তখন শুধু ফলই থাকে, ফুলের অস্তিত্বও আর থাকে না, চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকে। কুমড়ার ফল আর ফুলের মধ্যে যেমন, জ্ঞান আর কর্ম্মের মধ্যেও তেমনি বাড়া কমার একটা নিয়ম আছে। জ্ঞান যতই বাড়ে, কর্ম্ম ততই কমে যায়। শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম একেবারে থাকে না বললেই হয়। গীতাতেও আছে—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

জ্ঞানযোগে আরূঢ় ব্যক্তিরই জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থায় কর্ম্ম বিলয় প্রাপ্ত হয়, তার পূর্ব্বে নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞানের এক আধটুকু ছিটেফোঁটা লাভ করামাত্রই সাধক কর্ম্মত্যাগের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে এবং অকালে কর্ম্মের দিকটা চেপে রাখতে গিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে যে তার দুইদিকই মাটী হ'য়ে যায়। না হয় জ্ঞানের পূর্ণতা, না হয় কর্ম্মত্যাগ। অবৈধভাবে কর্ম্মত্যাগের শাস্তিস্বরূপ এমন কতকগুলো কাজ ভগবান তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেন যে তার জীবনে নৈষ্কর্ম্ম অবস্থা লাভ করা তার পক্ষে সুদূর-পরাহত হয়ে পড়ে; আর যেটুকু জ্ঞান তার মধ্যে বিকশিত হয়েছিল এই সমস্ত কর্ম্মের চাপ তা'কেও চেপে রাখে।

সাধকের পক্ষে সাধন-পথকে ধরে রাখাই উচিত। অন্যদিকে মন দিতে গেলেই তাকে হোঁচট্ খেতে হবে। সাধন ছেড়ে সাধকের মন যদি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ায়, সেটা আমি অপরাধ বলেই মনে করি। গুরুবাক্য অবহেলা করে সাধন-পথ পরিত্যাগ করে সাধক নিজের মনোমুখী হ'য়ে চলার ফলে সংসারের গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে মরে, সরল বিষয়কে জটীল করে তোলে, কর্ম্মবন্ধ হ'তে মুক্তি পাওয়া দূরে থাকুক আরও নিবিড়ভাবে জগজ্জালে জড়িয়ে পড়ে। ঠিক ঠিক নিষ্ঠা যার থাকে, তাকে কর্ম্মত্যাগ করার জন্য ব্যস্ত হ'তে হয় না। কর্ম্মই তাকে ত্যাগ করার জন্য লালায়িত হয়। সাধকের জীবনে এমন অবস্থা আসে, যখন সে সবিস্ময়ে দেখে যে কোন কর্ত্তব্য তার নাই, জাগতিক সমস্ত কর্ম্ম তার খসে গেছে, সংসারে বিচরণ করেও সে একজন জীবন্মুক্ত পুরুষ। এইটাই হচ্ছে প্রকৃত ত্যাগ। জোর করে টেনে হিঁচড়ে কর্ম্মত্যাগ করাকে ত্যাগ বা সন্ন্যাস বলে না। ছেলেদের মানুষ করা হল না, মেয়ের বিয়ে দেওয়া হ'ল না, স্ত্রীর ভরণ পোষণের কোন ব্যবস্থা করা হ'ল না, আর কর্ম্মত্যাগ করে সন্ন্যাসী সেজে বসলাম, এ সব ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্মের ব্যভিচার। গুরুর উপদেশ অনুসারে চলে বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সংসারের গহন পথে অগ্রসর হতে

হবে। এইভাবে চললে কর্ম্ম শীঘ্র শেষ হয়ে যায় ; আর যতই জোর করে কর্ম্মত্যাগ করার চেষ্টা করবে, কর্ম্ম ততই স্থায়ীভাবে ঘাড়ে চেপে বসবে।

আজকাল তোমাদের কয়েকজনের মধ্যে সংসার বৈরাগ্যের একটা ভাব লক্ষ্য করছি বলেই এত কথার অবতারণা করতে হ'ল। চাকরী বাকরী ছেড়ে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে ভগবৎ চিন্তাতেই জীবন অতিবাহিত করবে এই তোমাদের অভিপ্রায়। কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ করা বা সংসারকে অবজ্ঞা করার অর্থই হচ্ছে ভগবানকে অবজ্ঞা করা। ভগবান নাই কোথায়? ধ্যান ধারণার মধ্যেও যেমন তিনি, তেমনি কর্ম্মের মধ্যে বা সংসারের মধ্যেও তিনি অবস্থিত। কাজেই কর্ম্মকে তুচ্ছ ভেবে বা ভগবৎ লাভের অন্তরায় ভেবে ত্যাগ করলে প্রত্যবায়ভাগী হ'তে হবে। তবে সাধকের জীবনে এমন দিন আসে যখন, তার কোন বন্ধন থাকে না। কাজেই সে নৈষ্কর্ম্ম লাভ করে। কিন্তু তোমাদের সেদিন এখনও বহুদূরে। আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ গীতা কর্ম্মত্যাগের প্রশ্রয় প্রদান করে নাই, বরং সাধককে কর্ম্মে প্ররোচিত করেছে। গীতার প্রতিধ্বনি করে আমিও তোমাদিকে উপদেশ প্রদান করি—'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি', কর্ম্মত্যাগে যেন তোমাদের আসক্তি না হয়।

আমার শরীর মোটেই ভাল নয়। কিন্তু সে কথা কে শোনে? প্রতিদিন ঝুড়ী ঝুড়ী চিঠি আসছে। প্রকৃত জিজ্ঞাসু যারা, তাদের পত্রের উত্তর দিয়ে এই অসুস্থ শরীরেও একটা আনন্দ পাই। কিন্তু এমন কতকগুলি পত্র আসে, যাদের মাথামুণ্ড নাই ; এই সব পত্র আমার শরীরকে অধিকতর কাতর করে তোলে। তা'দের পত্র কতই আর পড়ি, কিই বা জবাব দিই? ঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আশা করি কুশলে আছ।

———

(কলিকাতার জনৈক কলেজের ছাত্রশিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ বাঁকিপুর

১৬।১১।৫০

স্নেহাস্পদেষু—

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থে ল্যাঙ্গাবাবার গল্প নিশ্চয়ই পড়েছ। তাঁর কথা আর একবার শোন। ফয়জাবাদে সরযূ নদীর ধারে একটা সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের একপাশে মাটী স্তূপীকৃত হয়ে পাহাড়ের মত হয়েছিল। তারই উপর ল্যাঙ্গাবাবার আসন ছিল। তিনি এই অনাবৃত স্থানে শীত গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে অনুক্ষণ আসনে বসে থাকতেন। এই মাঠের একপাশে ফয়জাবাদ ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্। সেই মাঠে সৈন্যেরা গোলাগুলি নিক্ষেপ করবে বলে একবার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের লোকদের নোটিশ দেওয়া হ'ল। তারা সাময়িকভাবে অন্যত্র উঠে গেল। ল্যাঙ্গাবাবাকে আসন ত্যাগ করার জন্য বলা হ'ল। কিন্তু তিনি কিছুতেই আসন ত্যাগ করবেন না জানালেন। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তিনি বললেন, "বাচ্চা সব, খেলা কর্।" গোলাগুলি ছোড়া আরম্ভ হ'ল। বাবাজী তাঁর বাঁ হাতখানা ঢালের মত ধরে রইলেন। তাঁর দক্ষিণে, বামে, মাথার উপর দিয়ে অবিশ্রান্ত গুলি ছুটতে লাগল। কিন্তু কোনটাই তাঁকে স্পর্শ করল না। বাবাজী নিশ্চল নির্বিকারভাবে বসে রইলেন।

আমার বিরুদ্ধে যে রং বেরঙের নিন্দা এবং কুৎসা প্রচার হচ্ছে, তা আমার অজানা নাই। এ সবের তীব্র প্রতিবাদ করবার জন্য আমাকে অনুরোধ জানিয়েছ; কিন্তু তা'তে লাভ ত কিছুই হবে না, বরং উল্টে

জল ঘোলা করা, আর গায়ে কাদা মাখাই সার হ'বে। ল্যাঙ্গাবাবা তাঁর বাঁ হাতখানা সম্মুখে ঢালের মত ধরে রেখে সৈন্যদের গোলাগুলি ব্যর্থ করেছিলেন। এ সব তাঁকে স্পর্শও করে নাই। আমার বিরুদ্ধে নিন্দা কুৎসার যে সমস্ত শাণিত অস্ত্র এলোমেলোভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে, সে সব ঠেকিয়ে রাখার জন্য আমার ঢাল কি জানো? ঠাকুরের নাম। যে নাম তোমরা পেয়েছ। এই নামকে ঢালের মত ধরে রেখেছি বলে আমার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত বাক্যবাণ আমাকে স্পর্শও করে না। ল্যাঙ্গ্যাবাবার মত আমার কুৎসাকারীদিকে আমিও বলি, "বাচ্চা সব, খেলা কর্।"

এ খেলা যারা খেলছে তারা খেলায় একটা আমোদ নিশ্চয়ই পায়। আমার নিন্দা করে তারা যে আনন্দ উপভোগ করে, সেটা আমার সৌভাগ্য বলেই আমি মনে করি। কারণ, এক হিসাবে আমি তাদের সেবা করে ধন্য হচ্ছি। সেবা কথাটার অর্থ হচ্ছে সন্তুষ্টিবিধান। অন্য ভাবে সেবা করার সুযোগ বা সামর্থ্য কোনটাই যখন আমার নাই, তখন আমার নিন্দা প্রচারের অবাধ অধিকার তা'দিকে দিয়ে যদি তাদের সেবা করতে পারি, সেটা আমার কাছে কি লোভনীয় নয়? আমার নিন্দাকারীদের কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে, অনায়াস-লব্ধ এই সেবার সুযোগ আমি পায়ে ঠেলে দেব কেন?

"অধর্ম্মা ধর্ম্মং নিন্দন্তি, চৌরা নিন্দন্তি চন্দ্রমাম্
বেশ্যা যোগীনং নিন্দন্তি, মূর্খা নিন্দন্তি পণ্ডিতান্।"

এতো স্বাভাবিক। কবীরজী বলতেন, (দোঁহাটা মনে করতে পারছি না।) 'যে আমার নিন্দা করে, সে আমার ধোপার কাজ করে। ধোপা কাপড়ের ময়লা সাফ করে আর নিন্দাকারী আমার মনের ময়লা পরিষ্কার করে দেয়।' আমার যারা নিন্দা করে, তারা আমার কোন অনিষ্ট সাধন করতে সক্ষম হয় কিনা জানি না, কিন্তু উপকার যে যথেষ্ট করে, সে বিষয়ে

সন্দেহমাত্র নাই। তাদের অপপ্রচার আমাকে আত্মবিচারে প্রেরণা যোগায়, দেহ মনের বিশুদ্ধতা রক্ষায় আমাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। এটা আমার পক্ষে কম লাভ নয়।

তুমি ঠিকই বলেছ। আমার কুৎসাকারীগণ আমারই ধর্ম্ম পরিবারের অন্তর্গত, আমারই ভাই এবং তার মধ্যে অনেকে নাকি আমার দ্বারা বহুভাবে উপকৃত। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছো, এর অর্থ কি? যারা আপন জন, পরম আত্মীয়, তারা এমনভাবে শত্রুতা সাধনে বদ্ধপরিকর কেন? এর উত্তর আমার কাছে খুব সোজা। এমনিই তো হয়। একই মায়ের পেটে জন্মগ্রহণ করে ভাইয়ে ভাইয়ে কেমন লড়াই করে, তা'তো ঘরে ঘরে দেখতে পাও। আত্মীয়তা যেখানে যত বেশী, দ্বন্দ্বও সেখানে তত উগ্রমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের দেহ ইন্দ্রিয়াদি আবার সহোদর ভাই প্রভৃতির চেয়েও বেশী আপনার। কাজেই তারা শত্রুতা সাধন করে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অতএব আমার প্রতি যারা বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন, তারা যে আমারই পরম আত্মীয়, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই, বরং এটাই স্বাভাবিক।

সে কথা যাক। আমার সতীর্থগণের অপপ্রচার আমার গায়ে কোন আঁচড় বসাতে পারে না, বরং তাদিকে আমার পরম হিতৈষী বলেই মনে হয়। আশা করি, তুমি অতঃপর কতকটা আশ্বস্ত হ'বে। কিন্তু তুমি আর একটি যে প্রশ্ন তুলেছ, সেটা গুরুতর বলেই আমি মনে করি। আমার নিন্দাবাদ শুনে আমার আশ্রিতগণের আমার প্রতি বিশ্বাস ভক্তি ব্যাহত হ'তে পারে এবং তাদের পক্ষে এটা খুব হানিজনক হ'বে বলে যে আশঙ্কা করেছ, তা মোটেই অগ্রাহ্য করার মত নয়। ঠিক ঠিক গুরুনিষ্ঠা যাদের আছে, তাদের বিশ্বাস ভক্তি শত আঘাতেও চূর্ণ হবে না বটে, কিন্তু যাদের শ্রদ্ধা তরল, তাদের বিপদের আশঙ্কা যে খুব বেশী,

এ বিষয়ে আমিও নিঃসন্দেহ। ধর্মজীবনে এই প্রকার ভাঙ্গনেরও প্রয়োজন আছে। এই ভাঙ্গনের ফলে তাদের মধ্যে হয়ত সাময়িকভাবে নাস্তিক্যবুদ্ধি, এমন কি গুরুদ্রোহিতার প্রবৃত্তি জেগে উঠবে। কিন্তু এই সকলের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এবং নামের প্রভাবে আঘাতের পর আঘাত পেতে পেতে তাদের জীবনতরী এমনভাবে ভরাডুবি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে যে, সংসারসাগরে হাবুডুবু খেয়ে তারা আবার গুরুকেই তাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলে স্মরণ করবে এবং রক্ষা পাবে। বাইরের শক্তি বিশ্বাস-ভক্তিকে টলাতে পারে, কিন্তু যে মহাশক্তিশালী নাম তোমাদের অস্থিমজ্জায় গাঁথা আছে, তা তো যাওয়ার নয়। সে তার কাজ করবেই, তোমাদিকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে নিয়ে যাবে, কোন উপরি শক্তিই তার প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না।

কিছু ভেবো না। সময়ে সব ঠিক হয়ে আসবে। অন্য কোন দিকে মন না দিয়ে, সাময়িক উপদ্রবগুলোকে উপেক্ষা করে নিজের কাজ করে যাও। কোনও ভয় নাই। আমি এখন অনেকটা ভাল। আশা করি কুশলে আছ।

(দ্বারভাঙ্গা নিবাসী জনৈক প্রার্থীকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ মতিহারী

১৬।১২।৪৭

বাসুদেবেষু—

আপনার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। কিন্তু এতে মোটেই সুখী হতে পারিনি।

একজন লোকের জলের প্রয়োজন হওয়ায় একটা কূপ খনন করতে সুরু করল। তিন চার হাত খুঁড়ে সেখানে জল না পেয়ে অন্যত্র

কুয়ো কাটতে লেগে গেল। চার পাঁচ হাত খোঁড়ার পর সেখানেও জল নাই সিদ্ধান্ত করে আর একটা জায়গায় পরীক্ষা আরম্ভ করে দিলে। এখানেও দুই তিন হাত খুঁড়ে জল না পাওয়ায় আবার একস্থানে চেষ্টা করতে লাগল। একটা স্থানই গভীরভাবে খনন করলে সে জল নিশ্চয়ই পেত; কিন্তু নানাস্থানে অপর্য্যাপ্তভাবে চেষ্টা করে, সে শুধু হয়রাণই হ'ল, কোন ফল হ'ল না।

এই ধৈর্য্যহীন মানুষটীর মত আপনিও কুয়ো কেটে বেড়াবেন আর কতদিন? একে একে তিনজন গুরুর আপনি আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। প্রথম গুরুর নিকট সাধন নিয়ে কোন ফল না পেয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন এবং তাঁর নিকটও আশাপূর্ণ না হওয়ায় তৃতীয়জনের শরণাপন্ন হয়েছেন, এই আপনার অজুহাত। কিন্তু এখানেও আপনার গুরুকরণের যবনিকাপাত হয়নি। তৃতীয় গুরুর কাছেও আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়ার কোন ভরসা নাই বুঝে আপনি আমার আশ্রয়প্রার্থী হয়েছেন। শেষোক্ত গুরু দুইজনের সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু না জানলেও প্রথম গুরু * * * এর সহিত আমি সুপরিচিত। শুধু পরিচিত নয়, তাঁর প্রতি আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করি। তিনি আপনাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারেন নাই, এ কথাটা গলাধঃকরণ করা আমার পক্ষে খুব দুরূহ হয়ে উঠছে। সিদ্ধিলাভের জন্য যেটুকু সময় দেওয়া প্রয়োজন ছিল, তা' দিতে কার্পণ্য করার জন্য এবং উপরোক্ত ধৈর্য্যহীন কূপখনকের মত তাড়াতাড়ি বাঞ্ছিত ফললাভের অস্বাভাবিক আগ্রহের জন্যই, আপনার আশা অপূর্ণ থেকে গেছে; অথচ নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে আপনার ব্যর্থতার গ্লানি অবলীলাক্রমে তাঁর মত একজন কৃতী পুরুষের স্কন্ধে চাপিয়ে দিতে আপনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। "গুরোগুর্ব্বন্তরং গচ্ছেৎ"—এক গুরু পরিত্যাগ করে অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে বটে,

কিন্তু এ ব্যবস্থা আপনার মত পল্লবগ্রাহী ব্যক্তির জন্য নয়। যারা গুরুর নির্দ্দেশমত কঠোর পরিশ্রম করেও বাঞ্ছিত ফললাভে সমর্থ হয় নাই, তাদের জন্যই শাস্ত্র এই প্রকার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। প্রকৃত শিষ্য যারা, অর্থাৎ শিক্ষালাভই যাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, কোন গুরু যদি তা'দিকে শিক্ষাদানে অসমর্থ হন, তবে তারা অন্য গুরুর আশ্রয় নেবে বৈকি। কিন্তু শিক্ষালাভ যেখানে শিষ্যের উদ্দেশ্য নয়—গুরুকে পরীক্ষা করাই যেখানে মনোগত অভিপ্রায়, অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণের অজুহাতে যে সব শিষ্য গুরুর পরীক্ষক সেজে বসতে চায়, শাস্ত্রের উপরোক্ত বিধান তাদের জন্য নয়; গুরুকে পরীক্ষা করতে যাওয়ার মত ধৃষ্টতা বা অপকর্ম্ম আর কিছু হ'তে পারে না। এতে ইষ্ট ত কিছু হয়ই না; অনিষ্ট হয় ষোল আনা। শিষ্যের পক্ষে গুরুর বিদ্যাবুদ্ধি বা শক্তির পরিমাপ করতে যাওয়ার অপচেষ্টা, চিনির পুতুলের সমুদ্র মাপতে যাওয়ার মতই হাস্যকর।

আপনাকে আমি সাধন দিতে পারি না। তবে আপনার লক্ষ্যহীন জীবনের যা'তে প্রকৃত কল্যাণ হয়, তার উপায় বলে দিতে পারি। আপনার প্রথম গুরুর কাছে ফিরে গিয়ে, তাঁর কাছে অকপটে সমস্ত দোষ স্বীকার করে তাঁরই নির্দ্দেশমত চলতে আপনাকে অনুরোধ করি। এখনও যদি ঐ পথ ধরতে পারেন, তবে বেঁচে যাবেন। নতুবা চিরজীবনটা ঘুরপাক খেয়েই কেটে যাবে এবং নিজের অকল্যাণ ডেকে আনা হ'বে। অপর দুই গুরুর কাছেও আপনার কর্ত্তব্য রয়েছে। তাঁ'দিকেও পরিত্যাগ না করে, তাঁদের সঙ্গেও একটা যোগাযোগ রক্ষা করে তাঁ'দিকেও সুখী রাখতে হ'বে। গুরুর উপর জীবনের ভার অর্পণ করতে গিয়ে, অপরাধের গুরুভারে আপনার মেরুদণ্ড চূর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আপনার আত্মনাশা প্রচেষ্টা হ'তে এখনও যদি বিরত না হন, তবে বিষম দুর্ভোগ আপনাকে ভোগ করতে হ'বে। আপনার কল্যাণের জন্য আমি এই সাবধান বাণী শুনিয়ে রাখলাম।

কতকগুলি অপ্রিয় এবং রূঢ়কথা বলতে হ'ল ব'লে আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার এই খামখেয়ালী আপনার গুরুদের পক্ষেও অশেষ যন্ত্রণার কারণ হ'বে। আপনার পক্ষে যা খেলা, তাঁদের নিকট তা মৃত্যু-তুল্য হবে ভেবে এই বিগর্হিত পন্থা পরিত্যাগ করবেন, আশা করি।

আপ্‌কো সন্মতি দে ভগবান।

(মজঃফরপুরের জনৈক উপদেশ প্রার্থীকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ ভাগলপুর

২৯।১২।৪৯

বাসুদেবেষু—

আপনার পত্র পেয়ে সুখী হ'লাম। আমি আমার শিষ্যদের সহিত বিশেষভাবে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হ'লেও সাধারণভাবে আমি সকলেরই। সুতরাং আমার কাছে কোন কথা বলতে বা জিজ্ঞাসা করতে আপনার সঙ্কোচ বোধ করবার কোন কারণ ছিল না। আমি কোন গণ্ডী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ নই, যদিও কতকগুলি নরনারী তাদের শ্রদ্ধাভক্তি এবং সেবা যত্নের দ্বারা আমাকে একান্তভাবে তাদের আপনার করে নিয়েছে।

আপনার প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়ার আমার আপত্তি কিছু না থাকলেও আশঙ্কার কারণ আছে যথেষ্ট। প্রথমতঃ, আপনি একজন গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করেছেন। তিনিই আপনার শিক্ষাদীক্ষার ভার নিয়েছেন এবং আবশ্যকমত আপনাকে পরিচালিত করেছেন এবং করবেনও। কাজেই তাঁর

কাজে আমার নাসিকা প্রবেশের চেষ্টা করতে যাওয়া শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, এতে একটা বিপদও আছে এই যে, তিনি যেভাবে আপনাকে গড়ে তুলতে চান, আমার অনধিকার চর্চ্চার ফলে তা হয়ত বাধাপ্রাপ্ত হবে। তাতে আপনার অনিষ্ট ছাড়া ইষ্ট হ'বে না; আর আপনার গুরুর পক্ষেও এটা মনোবেদনার কারণ হ'বে। আমার উপদেশের সঙ্গে আপনার গুরুর উপদেশ যদি মিলে যায়, তবে আমার উপদেশের কোন প্রয়োজন নাই। আর আমার উপদেশের সঙ্গে যদি অমিল হয়, তবে আমার উপদেশকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করে আপনার গুরুর উপদেশকেই শিরোধার্য্য করতে হ'বে। অন্ততঃ তাই আপনার কর্ত্তব্য। কাজেই এই উভয় ক্ষেত্রেই আপনার কাছে আমার উপদেশের কোন সার্থকতা থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, আপনার গুরু আপনাকে যে পথ ধরিয়ে দিয়েছেন বা যে পথে আপনাকে নিয়ে চলেছেন, তিনি নিজে সেই পথে হেঁটে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছেছেন বলে, ঐ পথ তাঁর নিকট সুপরিচিত। কাজেই তিনি ঐ পথ সম্বন্ধে যতটা ওয়াকিবহাল, যে ঐ পথে হাঁটে নাই তা'র পক্ষে সেরূপ হওয়া সম্ভবপর নয়। অপরের কাছে শুনে তা'র ঐ পথের সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞান হ'য়ত থাকতে পারে; কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, আর পড়ে বা শুনে কোন কিছু জানা— এই দুয়ের তফাৎ অনেক। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথাই ত কত লোকের কাছে শুনতে পাওয়া যায় এবং অনেক ধর্ম্মগ্রন্থেও তা লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু ধর্ম্মার্থিগণ যে ধর্ম্মলাভের জন্য সাধারণ ব্যক্তি বা এই সব গ্রন্থের উপর নির্ভর করে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না—গুরুর দ্বারস্থ হওয়ার জন্য লালায়িত হয়, এইটাই তার কারণ। আবার যে সে গুরুর আশ্রয় নিলেও হয় না। এমন অনেক তথাকথিত গুরু আছেন, যাঁরা ধর্ম্মপথে মোটেই হাঁটলেন না, নিজেরাই পথ চিনলেন না, অথচ শিষ্যকে পথ দেখিয়ে দিলেন। এ সব শিষ্যের অবস্থা দাঁড়ায় "অন্ধেন নীয়মানো যথান্ধঃ।"

সাধারণভাবে বললে বলতে হয়, আপনাদের যোগপথ, আর আমাদের ভক্তিপথ। যোগপথ ধরে চলতে চলতে যোগী তাঁর অজ্ঞাতসারে ভক্তি লাভ করেন বটে, কিন্তু যোগই তাঁর প্রধান অবলম্বন। আবার ভক্তিপথে চলতে চলতে অনেক যৌগিক প্রক্রিয়া স্বতঃই ভক্ত-সাধকের আয়ত্ত হ'লেও ভক্তিই তার প্রধান উপজীব্য। যোগ বিষয়ে অনেক খবরই আমি জানি এবং সে সব অভিজ্ঞতা আমাদের সাধনের মধ্য দিয়েই লাভ করেছি। কিন্তু ভক্তিই আমাদের মূল অবলম্বনীয় বিষয় বলে ওদিকে ততটা মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি নাই। কাজেই, এই দিকেই লক্ষ্য স্থির রেখে যাঁরা সাধনপথে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁরা ঐ পথের খবর যতটা রাখেন, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। এই জন্য এবং প্রথমোক্ত কারণে আপনার প্রশ্ন সমূহের উত্তর দানে আমি বিরত হ'লাম।

আমাকে মহাত্মা, মহাপুরুষ প্রভৃতি শব্দে বিশেষিত করেছেন (যদিও এ সব বিশেষণের উপযুক্ত আমি আদৌ নই) এবং আমার প্রতি আপনার শ্রদ্ধাভক্তিও যথেষ্ট আছে। তথাপি আপনার গুরুই আপনার সর্ব্বস্ব। তাঁর তুলনায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার চোখে ছোট হয়ে যাওয়াই উচিত। শাস্ত্র যে গুরুকে ব্রহ্ম বলে নির্দ্দেশ করেছেন, তার অর্থই এই। এই গুরুকে ছেড়ে অপরের কাছে উপদেশপ্রার্থী হবেন কেন ? এতে সুফল প্রাপ্তির কোন আশা নাই। পরন্তু গুরুনিষ্ঠা খর্ব্ব হওয়ার আশঙ্কা আছে। চাতকের মত হ'তে হ'বে। পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হ'লেও চাতক যেমন বৃষ্টির জল ছাড়া অপর কোন জল, এমন কি গঙ্গাজলও স্পর্শ করে না, তেমনি আপনার গুরুনিষ্ঠা এমন হওয়া চাই যে, গুরুর উপদেশ ছাড়া আর কারও উপদেশের দ্বারা (তা তিনি যত বড়ই মহাত্মা মহাপুরুষ হোন না কেন) ধর্ম্মপিপাসা শান্ত করার প্রবৃত্তি যেন আপনার মধ্যে জাগরিত না হয়। যোগারূঢ় হ'লে তখন গুরু ছাড়া অপর সকলের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করতে

পারেন। তা'তে আপনার গুরুনিষ্ঠা ব্যাহত হ'বে না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় গুরুকেই আপনার একমাত্র অবলম্বন ভেবে তাঁরই দিকে তাকিয়ে থাকতে হ'বে।

আপনি দুঃখিত হবেন না আশা করি। আপনার প্রশ্নসমূহের উত্তর হয়ত সন্তোষজনক ভাবেই দিতে পারতাম এবং তাতে আপনার সাময়িক তৃপ্তি অবশ্য হ'ত। কিন্তু এর ফল আপনার পক্ষে হানিজনক হ'বে আশঙ্কায় আপনার আশা পূর্ণ করতে আমি অক্ষম। আমার এই অক্ষমতার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

আশা করি কুশলে আছেন; ধর্ম্মলাভের জন্য আপনার আগ্রহ লক্ষ্য করে আমি খুব সুখী হয়েছি। ভগবান আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

(জামসেদপুরের জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ দৌলতপুর

২০।১।৫০

বাসুদেবেষু—

পায়স খেয়ে যেমন ভাত ভাল লাগে না, তেমনি নামের আস্বাদন যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের কাছে প্রাণায়াম যোগ প্রভৃতি তুচ্ছ হয়ে যায়। যোগমার্গ ধরে যাঁরা চলেছেন, তাঁদের সাধনে একটা কঠোরতা আছে। কিন্তু নাম-সাধনে তা নাই। উপরন্তু নাম করতে করতে সাধকের হৃদয়ে এমন একটা আনন্দের অনুভূতি জেগে ওঠে যে, সে সর্ব্ব সময়ে নাম নিয়েই থাকতে চায়। অন্যান্য সাধনে সে বীতস্পৃহ হয়ে ওঠে, এমন কি

অনেক কাজেও তার একটা শিথিলতা এসে পড়ে। শুধু তাই নয়। অনেক সময় সন্ধ্যা গায়ত্রী প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মগুলিও তার কাছে বাহুল্য মনে হয়। গানে আছে—"ত্রিসন্ধ্যা যে জপে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়, সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায়।"

এই প্রকার নাম-সাধক যাঁরা "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শুধু নামই সার করে বসে আছেন, তাঁদের অনুসরণ করতে যাওয়া সাধারণ সাধকদের পক্ষে অনেক সময়েই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত নামের যে প্রবাহ তাঁদের মধ্যে অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হয়, সেটা সাধারণ লোকের কাছে ধরা পড়ে না। সাধনভজনে তাঁদের অনাস্থাটাই সাধারণের নিকট প্রকট হয়ে ওঠে। নাম-সাধকদের বাইরে ধর্ম্মের কোন অনুষ্ঠান না থাকা সত্ত্বেও সাধারণ লোকে কিন্তু তা'দিকে শ্রদ্ধার চোখে না দেখেও পারে না। তাঁদের প্রভাব ও চরিত্র-বল সকলকে মুগ্ধ করে তোলে। এঁরা কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের আচরণ করেন না বলে, সাধারণ লোকেও তাঁদের দেখাদেখি ধর্ম্মকর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে বসে। না থাকে তাদের অন্তরে নামের ধারা, না থাকে ধর্ম্মের কোন বাহ্য অনুষ্ঠান। কাজেই তারা দু'কূল হারিয়ে অবশভাবে কালের স্রোতে ভেসে চলে। এই সব লোকের যাতে বুদ্ধিভেদ না জন্মে, এইজন্য নিজেদের কোন প্রয়োজন না থাকলেও ধর্ম্মগুরুরা বাইরের আচার অনুষ্ঠানগুলো মেনে চলেন। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি একজন আদর্শ ধর্ম্মগুরু ছিলেন, তাঁর নিজের কোন প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ধর্ম্মকর্ম্মে উদাসীন ছিলেন না, এ কথা গীতায় আছে।

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। তুমি লিখেছ, স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তোমার অবিরাম নাম চলতে থাকে বলে, অন্যান্য ধর্ম্মাঙ্গগুলোর অনুষ্ঠানে স্বভাবতঃই তোমার একটা শিথিলতা এসে পড়ছে, চেষ্টা সত্ত্বেও এগুলোর প্রতি তুমি আর তেমন মনোযোগ দিতে পারছ না।

এই কারণে এই সব আপদ চুকিয়ে দেওয়ার জন্য তুমি আমার অনুমতি চেয়েছ। আমি বলি, এত ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই। বর্তমানে সব সময়ে তোমার মধ্যে নামের যে প্রবাহ চলছে, এটা হয়ত সাময়িক। এখন যে অবস্থা লাভ করেছ ভেবে তুমি একটা তৃপ্তি অনুভব করছ, আমার আশঙ্কা হয়, সে অবস্থা থেকে বঞ্চিত হ'তে তোমার খুব বেশী সময় লাগবে না। সাধন গ্রহণের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত গুরুশক্তি এমন প্রবলভাবে ক্রিয়া করতে থাকে যে, শিষ্য সাধনার এক উচ্চস্তরে আরোহণ করেছে মনে করে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করে; কিন্তু কিছুকাল পরে গুরুশক্তি নানা কারণে চাপা পড়ে যায় এবং পূর্ব্বাবস্থা হারিয়ে সাধক চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে। শুধু তাই নয়। অনেক সময় নানাপ্রকার পাশবিক আচরণ এমন বিশ্রীভাবে তার মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে যে, তা'কে অতি সাধারণ মানুষের চেয়েও হীন বলে মনে হয়।

এই প্রকার অবস্থার ক্রম অল্পাধিক পরিমাণে প্রত্যেকের মধ্যে দৃষ্ট হয় এবং এর একটা বিজ্ঞানসম্মত কারণও আছে। গুরুশক্তি বা একটা বিজাতীয় শক্তি যে দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে ক্রিয়াশীল রয়েছে, ভোগরত বা নিদ্রাগত ইন্দ্রিয়গণ প্রথমটা তা টের পায় না। কিছুকাল পরে তারা এ বিষয়ে সচেতন হয়। তারা বুঝতে পারে যে ফেরুপালের মধ্যে বাঘ ঢুকেছে। তখন তারা একজোট হয়ে ঐ গুরুশক্তিকে কাবু করে ফেলার জন্য সর্ব্ব প্রকার চেষ্টা করে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেয়। এরই নাম সাধন-সমর। মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি চায় জীবের উপর তা'দের ভোগদখল চিরস্থায়ী করতে। এই গুরুশক্তি তাদের কবলমুক্ত করে জীবকে আত্মস্থ করতে চায়। এই গুরুশক্তি আর আত্মশক্তি—এ দুটো জিনিষ একই, কেবল নামের প্রভেদ মাত্র। সাধারণ জীবের মধ্যে আত্মশক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তার প্রকাশ বা অস্তিত্ব উপলব্ধির মধ্যে আসে না।

গুরুশক্তি এই আত্মশক্তিকে (যোগীরা যাকে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি বলেন) প্রবুদ্ধ করে তোলেন বলে আত্মশক্তিটাই সাধারণের কাছে গুরুশক্তি বলে প্রতিভাত হয়। যে শক্তি আমাদের মধ্যে গভীর নিদ্রামগ্ন ছিল—যার প্রকাশ, এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জীবের অগোচর ছিল, গুরুশক্তি যখন হঠাৎ সে জিনিসটাকে জাগিয়ে তোলে, তখন জীব সেটাকে গুরুশক্তি বলে ধারণা করে এবং এই ভাবেই সে তার মর্য্যাদা দেয়।

পত্র দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। এ সব প্রসঙ্গ আর একদিন উত্থাপন করবার ইচ্ছা রইল। এই যে সাধন-সমরের কথা বলছিলাম এ সংগ্রাম তোমার জীবনে এখনও আরম্ভ হয় নাই। গুরুশক্তি যে তোমার মধ্যে ক্রিয়াশীল, তা এখনও তোমার ইন্দ্রিয়াদি টের পায়নি বলে নির্ব্বিঘ্নে নাম করা তোমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। এমন দিন খুব শীঘ্রই আসছে, যখন তোমার মধ্যে সাধন-সমর আরম্ভ হ'বে, যখন এক দিকে তোমার দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এবং অপর দিকে তোমার আত্মশক্তির টানা হেঁচড়ায় তুমি জর্জ্জরিত হয়ে পড়বে। এই দুর্দ্দিনে রক্ষা পাওয়ার জন্য গুরুশক্তিকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলবার জন্য, ভাল না লাগলেও আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মগুলি তোমাকে বিধিমত পালন করতে হ'বে ; সাধন-সময়ে এরা গুরুশক্তির সহায় হ'বে বলে এগুলির প্রয়োজনীয়তা তোমার পক্ষে খুব বেশী। অতএব মনোমুখী হয়ে না চলে গুরুর নির্দ্দেশমত চলাই তোমার পক্ষে নিরাপদ।

আমার শরীর তদবস্থভাবেই রয়েছে। তোমরা কুশলে আছ আশা করি।

(জামসেদপুরের জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

সদ্‌গুরু নিবাস
ভুবনেশ্বর
১৩।৩।৫০

বাসুদেবেষু—

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একবার ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছিলেন। এ দুর্ভোগ তিনি স্বেচ্ছায় অঙ্গীকার করেছিলেন, তা বলাই বাহুল্য ; তিনি যে অনন্তলীলা প্রকট করেছিলেন, তার মধ্যে এই লীলায় একটা অভিনবত্ব ছিল। বিকার ঘোরে তাঁর সংজ্ঞা লোপ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, আর নন্দ যশোদা তাঁর জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। জীবন-মরণের এই সন্ধিক্ষণে অকস্মাৎ একজন বৈদ্যের আবির্ভাব হ'ল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের রোগমুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে সকলকে আশ্বস্ত করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি যে ঔষধের ব্যবস্থা করলেন তা সংগ্রহ করা অসম্ভব ভেবে নন্দ যশোদা ভয়ে বিহ্বল হয়ে উঠলেন। কোন সাধ্বী সহস্র-ছিদ্র কলসের দ্বারা যমুনা হ'তে জল আনতে পারলে সেই জলের অভিষেকে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধিমুক্ত হবেন, ইহাই ছিল বৈদ্যরাজের সুচিন্তিত বিধান।

এই অসম্ভব বিধান যিনি দিয়েছিলেন, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি রোগ, তিনিই রোগী, আবার তিনিই বৈদ্য। বৈদ্যের বিধানের কথা শুনে সকলে ম্রিয়মান হয়ে গেল। কারণ, সহস্র-ছিদ্র কলসে জলও আসবে না, শ্রীকৃষ্ণও প্রাণ পাবেন না। কিন্তু বৈদ্যরাজ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় জীবন পাবেন এবং সহস্রছিদ্র কলসে

জলও অবশ্য আসবে। সতী রমণীর পক্ষে এ জল আনা সম্ভব হ'বে, আর সেই জলে শ্রীকৃষ্ণ বাঁচবেন।"

এক ঢিলে দুই পাখী মারার কি সুন্দর আয়োজন! শ্রীকৃষ্ণেরও জীবন রক্ষা হ'বে আর বাইরে যে সব রমণী সতীত্বের পশরা সাজিয়ে বসে আছেন, তাঁদের আজ নির্ম্মম পরীক্ষাও হ'বে। ভাববার সময় ছিল না, দ্বিরুক্তি করার অবসর ছিল না; রমণীগণ একে একে সহস্র-ছিদ্র কলস কক্ষে যমুনায় জল তুলতে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু জল থেকে কলসী না তুলতেই সহস্র ছিদ্র দিয়ে সহস্র ধারায় জল ঝরে পড়তে লাগল। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! শ্রীকৃষ্ণ বাঁচেন না, অথচ শত শত রমণীর শিরে কলঙ্কের ডালি তুলে দিয়ে যান এই কপট বৈদ্যরাজ! সকলে অধীর হয়ে উঠলেন।

তখনও বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বৈদ্যরাজ বললেন, "শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ পাবেন, কিন্তু বৃন্দাবনে সতী ত দেখি না!" তিনি জ্যোতিষ জানতেন। খড়ি পেতে গণনা করে বললেন, "একজন মাত্র সতী এখানে আছেন এবং তাঁর নাম শ্রীরাধা।

শ্রীরাধা! অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম-ধারা পান করে যিনি কলঙ্কিনী বলে উপেক্ষিতা—তিনিই সতী! কিন্তু বাদ প্রতিবাদের এ তো সময় নয়! শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ তখন কণ্ঠাগ্র থেকে বুঝি বা ওষ্ঠাগ্রে এসে পৌঁচেছিল। শ্রীরাধিকার কক্ষে সহস্র-ছিদ্র কুম্ভ তুলে দেওয়া হ'ল। কৃষ্ণসোহাগিনী কৃষ্ণময় জগৎ দেখছিলেন। শুধু বৈদ্য বা রোগ বা রোগী কৃষ্ণ নয়, বৃন্দাবনের শুকসারী, প্রত্যেক নরনারী, প্রতিটি পশুপাখী সব শ্রীকৃষ্ণ। তিনি দেখলেন পথঘাট, যমুনার তট, যমুনার জল, ময়ূর ময়ূরীর দল, সব কৃষ্ণময়। কুম্ভ জলপূর্ণ করতে উদ্যত হয়ে সাশ্চর্য্যে তিনি দেখলেন—সহস্র ছিদ্রের প্রত্যেকটি দ্বার আগলে বসে আছেন শ্রীকৃষ্ণ। কুম্ভ জলপূর্ণ

করে তিনি কক্ষে তুললেন। এক ফোঁটা জলও পড়ল না। জলের অভিষেকে শ্রীকৃষ্ণ রোগমুক্ত হ'লেন।

এই আখ্যায়িকাটীকে একটী রূপক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। পরমাত্মা লীলাচ্ছলে জীবভাব অঙ্গীকার করে ভবব্যাধিগ্রস্ত হয়েছেন। অবিকারী বিকারগ্রস্ত হয়েছেন। তারপর নিজেই গুরুরূপী বৈদ্য সেজে নিজেকে ব্যাধিমুক্ত করবার জন্য আবির্ভূত হন। ভগবানই পুরুষ, আর যা কিছু সবই প্রকৃতি। যদি কোন সতী-প্রকৃতি তাঁর ইন্দ্রিয়াদি সহস্র-ছিদ্র দেহ-কুম্ভ শ্রীরাধিকার মত ভগবদ্ভাবে পূর্ণ করতে পারেন এবং তা যদি বহির্গমনের পথ না পায়, তবেই এই ভাবধারায় অভিষিক্ত হ'য়ে জীবাত্মা ব্যাধি বা মায়ামুক্ত হ'তে পারেন। এর নির্গলিত অর্থ এই যে, বদ্ধ জীব মুক্তির আস্বাদন তখনই পাবে, যখন তার অন্তরে বাহিরে ভগবান ছাড়া আর কিছু থাকবে না, যখন তার ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়ে ভগবান ছাড়া কিছু প্রবেশ করবে না, যখন তার ইন্দ্রিয়গুলিও ভগবদ্ভাবাপন্ন হয়ে যাবে, তার হৃদয় মধ্যে সঞ্চিত ভগবদ্ভাব ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়ে বহির্গমনের পথ খুঁজে পাবে না। মনে কর, তোমার অন্তর ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ, বাইরেও তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানের প্রকাশ অনুভব কর। কিন্তু তোমার চোখকে তখনও তুমি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনতে পার নাই। কোন অশুভ মুহূর্তে সে একটি সুন্দরী যুবতীকে নিরীক্ষণ করলে; তাকে দেখে তার ভগবদ্ভাব বা মাতৃভাব ফুটে উঠল না। কামক্রীড়ার যন্ত্রস্বরূপ সে তোমার চোখে প্রতিভাত হ'ল—আর অমনি ঐ ছিদ্রপথে তোমার অন্তরের ভগবদ্ভাব উজাড় হয়ে গেল।

ভাবের আতিশয্যকে একটা চরম অবস্থা বলে ভুল করা মোটেই সমীচীন নয়। অনেক সময় দেখা যায় ভক্ত-সাধক ভাবধারাকে সঞ্জীবিত এবং পুষ্ট করবার জন্য সকল প্রকার অনুকূল পন্থা অবলম্বন করে; কিন্তু ইন্দ্রিয় নিরোধ

করার জন্য তেমন কোন প্রচেষ্টা তার মধ্যে দৃষ্ট হয় না। কোন ভক্ত হয়ত ভগবদ্ভাবে ডগমগ হয়ে আছেন; পরক্ষণেই কোন একটা প্রলোভনের বস্তু তার কোন একটা ইন্দ্রিয়ের গোচর হ'ল, আর সেই উন্মুক্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়ে তার ভাবধারা ছুটে বেরিয়ে এল, আর ভাববিহীন হওয়ার একটা বিরাট শূন্যতা বা শুষ্কতা তার হৃদয়কে অধিকার করে বসল।

ভাব একটা লাভের বস্তু শুধু সেই সব সাধকের পক্ষে যারা তাঁদের ইন্দ্রিয়-দ্বারে ভগবানকে পাহারা রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এ যারা না পারে তাদের ভাব জলের তিলকের মত ক্ষণস্থায়ী হয়। প্রকৃত ভগবৎ-প্রেম এই ভাবের মধ্যে পাওয়া যায় না যদিও সাধারণকে মোহিত বা প্রভাবিত করার পক্ষে এর কার্য্যকারিতা মোটেই অপ্রচুর নয়।

ভাবের দিকে তোমার যতটা ঝোঁক আছে, ইন্দ্রিয় সংযমের দিকে ততটা মনোযোগ নাই। কাজেই ভাবকে পরিপুষ্ট করে তুলতে তোমার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। পত্র দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। আশা করি যা বলেছি, তা'তেই তুমি আমার বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করে এখন হ'তে এ বিষয়ে সাবধান হবে। নচেৎ প্রতারিত হ'তে হবে।

আমার শারীরিক ভোগ একটানাভাবেই চলেছে। কখনও কিছু কম, কখনও বা বেশী। ঠাকুর আমার দেহটাকে এমনভাবে পেষাই করছেন কেন, এর কোন হেতু নির্ণয় করতে পার কি?

আশা করি কুশলে আছ। আমি শীঘ্রই এ স্থান ত্যাগ করব ভাবছি। কোথায় যাব এখনও ঠিক নাই।

(খড়্গপুরের জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্‌

সদ্‌গুরু নিবাস
ভুবনেশ্বর
১৫।৫।৫০

বাসুদেবেষু —

একজন লোক একটা ভূতকে দাসরূপে নিযুক্ত করেছিল। তার সঙ্গে সর্ত্ত এই ছিল যে, তা'কে দিবারাত্র কাজে ব্যাপৃত রাখতে হ'বে। যখনই তা'র করবার মত কিছু থাকবে না, তখনই সে তা'র প্রভুর সর্ব্বনাশ সাধন, এমন কি প্রাণ সংহার করে তা'কে ত্যাগ করবে। মনিব যখনই তার ভূতকে কাজ দেয়, সেই মুহূর্ত্তেই সে তা সম্পন্ন করে ফেলে। একটা কাজ শেষ না হ'তেই আবার তা'কে কাজ দিতে হয়। প্রয়োজনে না হোক, প্রাণের দায়ে। খুব কম সময়েই ভূত তা'র জন্য বাড়ী, ঘর, পুকুর, বাগান প্রভৃতি তৈরী করে দিল। পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য এনে তা'র চরণে উপঢৌকন প্রদান করল। ভূত যেমন সূক্ষ্মশরীরী, তার দেওয়া বা গড়া জিনিষগুলোও যে তেমনি মায়িক বস্তু, লোকটি তা ভাববার বা দেখবার সময়ই পায় না। কারণ ভূতের জন্য নিত্য নূতন কাজের ফরমাস জোগাতেই তার সমস্ত সময় ব্যয়িত হয়। যাক। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য এমন হয়ে দাঁড়াল যে, প্রভু তার ভৃত্যকে দেওয়ার মত আর কাজ খুঁজে পেলে না। ভূত তখন সর্ত্তমত তার ঘাড় মটকাবার জন্য তা'কে আক্রমণ করল। প্রভু প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে দৈবক্রমে একজন সন্ন্যাসীর সম্মুখে গিয়ে পড়ল এবং তার বিপদের কথা নিবেদন

করে তা'কে রক্ষা করবার অনুরোধ জানাল। কাছেই একটা খুঁটী পোতা ছিল। সন্ন্যাসী বললেন, "তোমার ভূতকে চিরদিন এই খুঁটী ধরে ওঠা নামা করতে বল।" নির্দ্দেশমত ভূত এই কাজে লেগে গেল। তা'র নিঃশ্বাস ফেলার সময়ও রইল না, লোকটীও বেঁচে গেল।

এই লোকটীর মত আমরাও এক একটী ভূত পুষছি। আমাদের মনই এই ভূত। আমাদের এই মন-ভূত কোন অবস্থায় কোন কারণেই অলস থাকতে পারে না। সব সময়ে কর্ম্মব্যস্ত বা চিন্তারত থাকাই এর স্বভাব। মনকে কাজ দিলে বা চিন্তার খোরাক জোগালেই মন আমাদের হুকুম মুহূর্ত্তের মধ্যে তামিল করে, মুহূর্ত্তের মধ্যে সে আমাদিগকে পৃথিবীর সুদূর প্রান্তে পৌঁছে দেয়, পলকের মধ্যে সে আমাদিগকে রাজা বানিয়ে দেয়। কিন্তু মনের সাহায্যে কল্পলোকে বিহার করে বা কল্পনার রাজা সেজেও আমরা তৃপ্তি বা শান্তি লাভ করতে পারি না। কিছুদিন পর আমরা উপলব্ধি করি যে, মন আমাদের দাসত্ব করে না, বরং আমরাই তার ক্রীতদাস। মন আমাদিকে যা দেয় তা নশ্বর, তা'তে আমাদের অভাব মেটে না। অপরপক্ষে, আমরা অবিরামভাবে মনকে কাজ দিতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠি। অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায় যে, মনকে কাজ দেওয়া আমাদের পক্ষে দুরূহ হয়; আমাদের চিন্তাশক্তি ক্ষয় হ'তে হ'তে লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়। মন তখন আমাদের ত্যাগ করতে উদ্যত হয় এবং সেই সঙ্গে আমাদের প্রাণ-পাখীও খাঁচা ছাড়া হওয়ার মত হয়। ভূত যেমন ছাড়বার সময় একটা অনর্থ ঘটিয়ে যায়, তেমনি আমাদের মনও আমাদের ত্যাগ করবার সময় আমাদের জীবনান্ত ঘটাতে প্রয়াস পায়। এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হ'তে পারলে অপূর্ব্ব কৌশলে তিনি আমাদের উদ্ধার সাধন করেন। শ্বাস প্রশ্বাসের খুঁটি ধরে অবিরামভাবে তিনি মনকে ওঠানামা করবার জন্য হুকুম দিতে বলেন। মনেরও কাজ শেষ হয় না, আমাদেরও মনকে কাজ জোগাতে গিয়ে বিপন্ন হ'তে হয় না।

মনকে বিদায় দিতে হ'লে আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে ধরাধাম থেকে বিদায় নিতে হয়। কাজেই তা'কে রাখা চাই। কিন্তু এই ভূতটীকে পুষেও ত আমাদের রক্ষা নাই। তা'কে রাখতে গিয়ে আমাদের লাভ অপেক্ষা লোকসান বেশী। আমাদের দাসত্ব করার পরিবর্ত্তে মনই প্রকারান্তরে আমাদিগকে তার ক্রীতদাসরূপে ব্যবহার করে। এই মনকে বশীভূত করার জন্যই গুরুর প্রয়োজন। মন সহজে স্থির হয় না। অস্থিরতা ও চঞ্চলতাই এর স্বভাব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিষয় হ'তে-বিষয়ান্তরে সে ছুটে বেড়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়সকলকেও ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কাজেই আমাদেরও প্রতিনিয়ত অস্থিরভাবে কালযাপন করতে হয়। সূর্য্য যেমন কোন অজ্ঞাত বস্তুর দিকে প্রতি নিয়ত ছুটে চলেছে এবং তার সঙ্গে গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতিকেও টেনে নিয়ে যাচ্ছে, মনও তেমনি অস্থিরভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়দের নিয়ে অবিরাম গতিতে ছুটে চলেছে। মনের এই অস্থিরতা নিবারণ করতে না পারলে আমাদের কল্যাণ নাই। মন যদি শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদে ওঠানামা করে, তবে সে ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসে এবং তার সঙ্গে আমাদের চিত্ত, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিও স্থির হয়। স্থির জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমন চিত্ত স্থির হ'লে তা'তে ঠাকুরের প্রতিবিম্ব সুস্পষ্টভাবে পড়ে। এই অবস্থা লাভ হ'লেই আমাদের অভাবের নিবৃত্তি হয়। মনকে অশ্বমেধের ঘোড়ার মত ছেড়ে দিলে তার দ্বারা আমাদের অভাব দূর হয় না, বরং নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি হয়—আমাদের প্রাণান্ত হওয়ার উপক্রম হয়।

মন যে দুর্দ্দমনীয়, স্বয়ং ভগবান গীতায় একথা স্বীকার করেছেন এবং অভ্যাস-যোগের দ্বারা একে সংহত করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। শ্বাস প্রশ্বাস ধরে মনের ওঠানামা বা শ্বাস প্রশ্বাসে লক্ষ্য রাখা, এইটাই অভ্যাস-যোগ। ভগবানের নাম জপ করা, এও অভ্যাস-যোগ। মনকে বশীভূত করার এও একটা উপায়। কথায় বলে রাম নাম করলে ভূত থাকে না। ভগবানের নামে

মন-ভূতকেও দাবিয়ে রাখা যায়। শ্বাস প্রশ্বাসে লক্ষ্য রাখা এবং নাম করা, এই দুটো প্রক্রিয়াই যদি এক সঙ্গে করা যায়, তবে মনকে সংযত করা অনেকটা সহজসাধ্য হয়। তোমরা যে সাধন পেয়েছ, তা'তে এই দুই কাজই সিদ্ধ হয়। তাই, এই সাধন মুনি ঋষিদের অতি আদরের বস্তু ছিল। এই সাধনের দ্বারা কি লাভ হয়, তা প্রকাশ করে বলা সাধ্যাতীত। বললেও অনেকেরই পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। সাধনের দ্বারা নিজে নিজে এ সব উপলব্ধি করতে হয়।

আমার শারীরিক দুর্ভোগের অন্ত নাই। দেহটাকে নিয়ে যা খুসী তিনি তাই করুন। আমি ঝড়ের আগে এঁটো পাতার মত পড়ে আছি মাত্র। মধ্যে মধ্যে তোমাদের কুশল সংবাদ পেলে সুখী হ'ব। শুধু শারীরিক কুশল নয়, সাধন-ভজনের কুশল আমি জানতে চাই।

(প্রয়াগের জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ কলিকাতা

২৪।৬।৫০

বাসুদেবেষু—

সমুদ্র রত্নাকর—এই কিংবদন্তী দেবতাদিকে রত্নসম্ভার লাভের আশায় সমুদ্র মন্থনে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। সমুদ্র দেবতাদের আশা অপূর্ণ রাখেন নি; তা'দের পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ নানাবিধ রত্ন সে তা'দিকে উপঢৌকন প্রদান করেছিল। এই কথা জেনে দৈত্যরাও সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হ'ল। দেবতাদের আপ্যায়নের জন্য সমুদ্র তার ধনরত্ন নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছে, তা মোটেই সম্ভব নয়; অতএব দৈত্যরা মহা উৎসাহে সমুদ্র মন্থন আরম্ভ

করে দিল। কিন্তু সমুদ্রের পক্ষপাতিত্ব দেখে তারা বিমূঢ় হয়ে পড়ল। সমুদ্রকে যতই তারা মন্থন করে, ততই হলাহল উঠতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা এমন গুরুতর হয়ে দাঁড়াল যে সমস্ত বিশ্ব বিধ্বস্ত হওয়ার উপক্রম হ'ল। দেবতারা সমুদ্র-মন্থন কালে বা উত্থিত রত্নাদি বন্টনের সময় দেবাদিদেব মহাদেবকে আহ্বান করেন নি। এখন বিপদ উপস্থিত দেখে তাঁরা তাঁর শরণাপন্ন হ'লেন। দেবতারা যে তাঁকে উপেক্ষা করেছিলেন, সে কথা গণনার মধ্যে না এনে পাগলা ভোলা বিষপান করে জগৎ রক্ষা করলেন।

সমুদ্র যেমন রত্নাকর, আমাদের হৃদয়ও তেমনি রত্নাকর। রামপ্রসাদের গানে আছে—"ডুব দে রে মন কালী বলে—হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।" বিশ্বে যে সব রত্ন আছে, সে সমস্তই, এমন কি বিশ্বে যা নাই তাও আমাদের হৃদয় মন্থন করলে পাওয়া যায়, এ কথাটা আর্য্য মুনি-ঋষিরা জানতেন। তাই জীবকুলের সুখ সমৃদ্ধির জন্য হৃদয়-সমুদ্র মন্থন করার নানাবিধ কৌশল অর্থাৎ সাধন-প্রণালী তাঁরা উদ্ভাবন করে গেছেন। তার মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ মন্থন রজ্জু অবলম্বন করে হৃদয়-সমুদ্র মন্থন করার যে অপূর্ব্ব প্রণালী অনাদিকাল থেকে চলে আসছে, সেইটাই বিজ্ঞান-সম্মত ও সবচেয়ে কার্য্যকরী। ভগবান বুদ্ধদেবও এই সাধন-প্রণালীর সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন। শুধু তাই নয়; তিনি দৃঢ়তার সহিত এমন কথাও বলে গেছেন, "যারা শ্বাস প্রশ্বাস অবলম্বনে সাধনের বিরোধী তারা নির্ব্বাণেরও পরিপন্থী।

কোনও কোনও ব্যক্তি দেবোচিত গুণসম্পন্ন, আবার অনেকে আসুরিক লক্ষণবিশিষ্ট। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের সাধনা দৈবী সম্পদ লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই দেবতাদের সমুদ্র-মন্থন। পক্ষান্তরে, আসুরিক প্রকৃতির লোকদের যে সাধনা, সেইটাই পৌরাণিক আখ্যায়িকায় অসুরদের সমুদ্র-মন্থন। দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থন ব্যাপারটাকে একটা রূপক বলে কল্পনা করা যেতে পারে।

দেবভাবাপন্ন পুরুষেরা যে সাধন করেন, তদ্দ্বারা তাঁরা অনেক অপার্থিব সম্পদ লাভ করেন। কিন্তু আসুরিক প্রকৃতির লোকেরা তা'দের সাধন-লব্ধ সম্পদ বা শক্তি জগতের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের জন্য নিয়োজিত করার কল্পনা করে বলে তা'দের সাধনায় নিজেদেরও কোন কল্যাণ হয় না—জগতেরও সর্ব্বনাশ সাধন করে। পৌরাণিক ভাষায় তাদের সমুদ্র-মন্থনকালে বিষ উত্থিত হয়ে সমস্ত জগত ধ্বংস করতে উদ্যত হয়।

দেবতাদের সমুদয় প্রচেষ্টা যেমন জগতের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত হয়, আমাদিগকেও তেমনি 'জগদ্ধিতায়' আত্মনিয়োগ করতে হবে। জগতের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করলেই আমাদের নিজেদের কল্যাণ আপনা হ'তে হ'বে। এ জন্য পৃথকভাবে কোন চেষ্টা করতে হ'বে না। আমাদের সাধনের উদ্দেশ্য হ'বে দৈবী সম্পদ লাভ। জগন্মঙ্গল শক্তি বা সম্পদ লাভ করে জগতের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যেই যদি আমরা তা প্রয়োগ করি, তবে আমরা জগতের অকল্যাণের কারণ হ'ব এবং পরিণামে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে। পুরাকালে অসুরেরা কঠোর সাধনার দ্বারা ব্রহ্মাদির কাছে বর লাভ ক'রে, দেবতা ও মানব সমাজের উপর অযথা উৎপীড়ন ক'রে, শেষে নিজেরা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই দেবভাব ও অসুরভাব দু'ই আছে। দেবভাব যা'দের বেশী, তারা সাধন-প্রভাবে দৈবী সম্পদকেই এমনভাবে বাড়িয়ে তোলে যে, তা'দের আসুরিক ভাবটা মাথা তুলবার অবকাশ বা সুযোগ পায় না। কিন্তু আসুরিক প্রবৃত্তি যা'দের প্রবল, তা'রা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সাধনভজন আসুরিক বৃত্তির ইন্ধনস্বরূপেই ব্যবহার করে। কাজেই তা'দের দেবভাব চিরতরে চাপা পড়ে যায়। এ সাধনে জগতের অনিষ্টই হয়, ইষ্ট কিছুই হয় না। পুরাকালে অসুরের সাধনা তাই ভয়াবহরূপ ধারণ করত। শূদ্রগণকে সাধারণতঃ যে তপস্যার অনুমতি দেওয়া হ'ত না, তার কারণ

এই যে, শূদ্র প্রধানতঃ তমোভাবাপন্ন, অর্থাৎ অসুর-মনোবৃত্তি সম্পন্ন ছিল। কাজেই তাদের সাধনায় জগতের ইষ্টের চেয়ে অনিষ্টের আশঙ্কাই বেশী থাকত। এই কারণেই বশিষ্ঠের আদেশে শ্রীরামচন্দ্র কঠোর তপস্যানিরত শূদ্রকের শিরশ্ছেদ করেছিলেন।

সাধনার দ্বারা জগতের হিত এবং অহিত দুইই হ'তে পারে। দৈবীগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে পড়লে এর থেকে অমৃতের উদ্ভব হয়; আবার আসুরিক ব্যক্তির সাধনায় বিষ উত্থিত হয়। দৈবীসম্পদ-বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের সাধনা জগতকে স্বর্গে রূপান্তরিত করতে পারতো, কিন্তু বিজ্ঞান আজ অসুরের হাতে পড়ে তার আসল উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছে। সমগ্র জগৎ বিজ্ঞানের বিষে জর্জ্জরিত হ'বার উপক্রম হয়েছে। স্বয়ং ভগবান বা মহাদেব আবির্ভূত হয়ে যদি এই বিষ পান করেন, তবেই জগৎ রক্ষা পাবে। অন্য উপায় নাই।

সে কথা যাক। আমার বক্তব্য এই যে, কঠোর সাধনা করাই সব নয়। সাধনের উদ্দেশ্য কি, অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে সেটা জেনে নেওয়া চাই। শক্তি বা সম্পদ অর্জ্জন করে একটা অহং-সর্ব্বস্ব জীবে পরিণত হওয়াই যদি সাধনের লক্ষ্য হয়, তবে সে সাধন আমাদের সর্বনাশের হেতু হবে। অপরপক্ষে সাধনলব্ধ সম্পদ জগতের কল্যাণার্থ ব্যয়িত হ'বে, এইটাই যদি সাধনের লক্ষ্য হয়, তবে সেই সাধনই প্রশংসার্হ এবং এতে সাধকের তথা জগতের হিতসাধন হ'বে। অতএব শুধু সাধন করে গেলেই হ'বে না, সাধনের দ্বারা সাধক কি লাভ করতে চায়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা চাই।

আমার শারীরিক ভোগ অবিচ্ছেদে চলেছে। আমি যাঁর হাতে যন্ত্রস্বরূপ তিনি যদি যন্ত্রটিকে ব্যবহারে না লাগিয়ে অকর্ম্মণ্য করে রাখতে চান, তা'তে ত আমার বলার কিছু নাই।

তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

(খুলনার জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্‌ গলসী

১১।১।৫১

কল্যাণীয়েষু—

তোমার পত্র পাওয়ার আগে থেকেই আমার অন্তরে রোদন-ধ্বনি উঠেছিল; কারণ এই নিদারুণ দুঃসংবাদের আভাস আমি ইতিপূর্ব্বেই পেয়েছিলাম। এত বড় বিপদ বুঝি মানুষের আর হয় না! এরূপ বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করাও সাধারণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। যে পুত্ররত্ন তুমি লাভ করেছিলে, মানুষের বহু ভাগ্যেই তেমন জোটে এবং তা'কে অকালে হারাণোর মত দুর্ভাগ্য আর কিছু হ'তে পারে না। আমার মনে হচ্ছে, এ সময় তোমাকে কাছে পেলে দু'জনেই বুকফাটা কান্না কেঁদে হৃদয়ের সমস্ত শোক উজাড় করে দিতাম।

এই ত সংসার। যে সংসারের সুখই আমাদের কাম্য, শোক, দুঃখ প্রভৃতি তা'র আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায় এবং সুযোগ পেলেই আমাদের ঘাড়ে চড়ে বসে। যিনি যত বড় শক্তিশালী, সম্পদ্‌শালী বা ধর্ম্মাত্মা হোন না কেন, এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কা'রও নাই। তবে এদের অভিযান সকলের বিরুদ্ধে সমানভাবে চললেও, এরা ধর্ম্মাত্মাগণকে মোটেই বিচলিত বা অভিভূত করতে পারে না। সংসারটাকে মায়া বলে যাঁরা উপলব্ধি করেছেন, জাগতিক তাবৎ বিষয়বস্তু মিথ্যা স্বপ্ন বলে যাঁদের মনে প্রতীতি জন্মেছে, জন্মমৃত্যু তাঁদের কাছে গাছের পাতা গজানো এবং পাতা খসার মত তুচ্ছ ব্যাপার বলে মনে

হয়। সুখ দুঃখ তাঁদের কাছে আলো আঁধারের পর্য্যায় বলে ধারণা হয়। একটা গল্প বলি শোন :

এক ছিল চাষা। তার স্ত্রী আর একমাত্র পুত্র ছাড়া সংসারে আর কেউ ছিল না। একদিন চাষা মাঠে লাঙ্গল দিতে গেছে এমন সময় দৈব দুর্ঘটনায় বাড়ীতে তার ছেলে হঠাৎ মারা গেল। ছেলের মা আছাড় খেয়ে কতক্ষণ ধরে কাঁদল। তারপর মাঠ থেকে চাষাকে ডাকতে গেল। সমস্ত শুনে চাষা মোটেই অভিভূত হ'ল না। প্রশান্তভাবে বললে, "তা তুই এখন বাড়ী যা। আমি আর খানিকটা জমি লাঙ্গল দিয়ে পরে যাব এখন।" এত বড় বিপদে চাষাকে অটল থাকতে দেখে স্ত্রী তা'কে গালাগালি দিতে লাগল। "একমাত্র ছেলে মারা গেল, তবুও চোখে এক ফোঁটা জল নাই, এমন পাষণ্ডের হাতে আমি পড়েছি" বলে সে কাঁদতে লাগল। চাষা তখন হেসে বললে, "ওরে পাগলী, রাগ করিস কেন? শোন, কাল রাত্রে বড় সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। দেখলাম, আমি রাজা হয়েছি, আমার ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই। আমার সাত সাতটি ছেলে, তারা যেন সাতটি রত্ন। রূপে, গুণে, বিদ্যা বুদ্ধিতে, জগতে কোথাও তাদের তুলনা নাই। আমার ঐশ্বর্য্য আর পুত্রদি'কে নিয়ে আমি আনন্দে বিভোর হয়ে কাল কাটাচ্ছিলাম, এমন সময় ভোর বেলার পাখীর গানে আমি জেগে উঠলাম—আর অমনি আমার সোনার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। আমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, তেমন সব পুত্র, নিমেষের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেল। এখন বল দেখি, কা'র জন্য কাঁদি? এই সাতটি পুত্র রত্নের জন্য, না এই যে গরীবের ছেলে আমাদের কুঁড়ে ঘর আঁধার করে গেল তার জন্য?" উত্তেজিত হয়ে চাষার স্ত্রী উত্তর দিলে, "সাত পুত্র আবার কোথায়? ও সব ত স্বপ্ন—ওদের জন্য আবার কান্না কি?" চাষা তখন বললে, "ওরে পাগলী, এও স্বপ্ন। এই যে ছেলের মোহ

এতদিন তোকে ঘিরে রেখেছিল, যার মৃত্যু তোকে এতখানি অভিভূত করে তুলেছে, এও স্বপ্ন!"

এও স্বপ্ন! সেই চাষার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে সুরে সুর মিলিয়ে আমিও বলি—তোমার এই যে পুত্রবিয়োগ, এও স্বপ্ন। তার আসা, দু'দিনের হাসি হাসা, তার হারিয়ে যাওয়া—এ সবই স্বপ্ন, সবই মিথ্যা। সত্য শুধু সেই ভগবান, যিনি অনন্ত সাজে সেজে অনন্তকাল ধরে অনন্তভাবে লীলা করছেন; তাঁর যা খেলা, যাতে তিনি আনন্দ পান, তা'তে আমাদের দুঃখ প্রকাশ করা ত মোটেই সমীচীন নয়; তাঁর খেলা আমরাও উপভোগ করব, তাঁর আনন্দে আমরাও আনন্দ প্রকাশ করব। তা যদি না পারি, তাঁর আনন্দ উৎসবে যোগ দেওয়ার মত মনোবৃত্তির অধিকারী যদি আমরা না হতে পারি, তবে তাঁকে ভালবাসার কোন অর্থ হয় না, তাঁর ভালবাসা অর্জ্জন করার কোন যোগ্যতাও আমাদের থাকে না। তবে পুত্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা কি খুব একটা অপরাধের কাজ? তা নয়। যে তোমার হৃদয়ের এতখানি জায়গা জুড়ে বসেছিল, যার সঙ্গে তোমার একটা ব্যবহারিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল, তার বিয়োগে কাতর বা অভিভূত হ'বে না, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কাঁদো—চিৎকার করে কাঁদো। তোমার কান্না যেন ইহলোকের যবনিকা ভেদ করে তোমার ছেলের কাণে গিয়ে পৌঁছায়।

কিন্তু এ চাষার কথাও ঠেলে ফেলার মত নয়। চাষা বেদান্ত পড়েছিল কিনা জানিনা, তবে তার হৃদয়ে যে বেদান্তজ্ঞান বিশেষভাবে স্ফুরিত হয়েছিল, এতে সন্দেহের অবকাশ নাই। আমাদের প্রাচীন ঋষিদের শিক্ষাও ঐ এক—"ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা।" এর অর্থ চাষা যেভাবে গ্রহণ করেছিল, তোমাকে ঠিক সেভাবে গ্রহণ করতে বলি না। ব্রহ্ম ছাড়া কোথাও কিছু নাই। ব্রহ্মই তোমার সন্তানরূপে এসেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ

বৃন্দাবন পরিত্যাগ করায় নন্দ যশোদা যেমনভাবে কেঁদেছিলেন, তোমাদের ব্রহ্মগোপাল ইহধাম ত্যাগ করায় তোমরাও তেমনিভাবে কাঁদ। এ কান্নায় আনন্দ পাবে, জীবনের কল্যাণও যথেষ্ট হবে।

আমার শরীর বর্ত্তমানে মোটের উপর ভালই। ঠাকুর তোমাদের প্রাণে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

(ময়মনসিং-এর জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

গলিগ্রাম
২২।১।৫১

বাপুদেবেষু—

একই কথা বার বার তোমাকে কত বলি! সাধন ভজনে অবহেলা বা আলস্য কোন কারণেই আমি বরদাস্ত করব না। হাল ছেড়ে দিয়ে আমার ঘাড়ে সমস্ত চাপিয়ে শিব সেজে বসে থাকতে চাও, আমার উপর নির্ভর করে সমস্ত দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চাও—নির্ভরতা কি এত সোজা জিনিষ?

গুরুর বা ভগবানের উপর নির্ভর করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার অধিকার শুধু তা'দেরই আছে, যারা অদম্য পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ করেও অভীষ্ট লাভে সক্ষম হয় নাই—যাদের কঠোর সাধনা সিদ্ধির পরিবর্ত্তে এনে দিয়েছে ব্যর্থতার গ্লানি। সর্ব্বপ্রকার বিফল প্রচেষ্টার দ্বারা তা'দের হৃদয় যখন হাঁপিয়ে উঠে, দেহ মন যখন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, তখন কোন দিকে কূলকিনারা না পেয়ে, আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস হারিয়ে তা'রা একান্তভাবে তাদের ইষ্টদেবতার

শরণাপন্ন হয়, তাঁরই করুণার উপর ষোল আনা নির্ভর করে। এই যে নির্ভরতা, এটাই ঠিক ঠিক নির্ভরতা।

মহাভারতের সেই করুণ দৃশ্য একবার কল্পনার নেত্রে ফুটিয়ে তোল দেখি! পাশাখেলায় যুধিষ্ঠির তাঁর সর্ব্বস্ব, এমন কি দ্রৌপদীকে হারিয়েছেন। দুর্য্যোধনের আদেশে প্রকাশ্য রাজসভায় দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করবার জন্য দুঃশাসন তার পশু-প্রবৃত্তি নিয়োজিত করেছে, আর দ্রৌপদী একদিকে তাঁর ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে প্রাণপণে কাপড়খানাকে আঁকড়ে ধরে আছেন, কাতরভাবে যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন প্রভৃতির সাহায্য ভিক্ষা করছেন, আর অপরদিকে ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাঁর আকুল প্রার্থনা ভগবানের চরণে পৌঁছে দিচ্ছেন। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। দুঃশাসনের শক্তির কাছে তাঁকে পরাজয় মানতে হ'ল। তাঁর পঞ্চস্বামী সত্যে আবদ্ধ। দুর্য্যোধনের নিকট ভীষ্ম, দ্রোণ, প্রভৃতির দাসখৎ লেখা আছে। কাজেই এঁদের কাছ থেকেও কোন সাহায্য এলোনা। ভগবান অভিমানভরে জগতের কোন্ গোপন কোণে লুকিয়ে আছেন, তারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অভিমান কিসের জান? ঐ যে দ্রৌপদী ভগবানের শরণাপন্ন হয়েও স্বাবলম্বন বা আত্মনির্ভরতার উপর আস্থাবতী, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির মুখাপেক্ষী, এটা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। তিনি কি এত ক্ষুদ্র যে তাঁর সামর্থ্য দ্রৌপদীকে সেই ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার করার পক্ষে অপ্রতুল? তাঁর উপরেই যদি নির্ভর করতে হয়, তবে আর পাঁচটার শরণাপন্ন হওয়ার ত কোন অর্থ হয় না। তাঁর কৃপা লাভ করবার যোগ্যতা শুধু তখনই হয়, যখন নিখিল বিশ্বের অস্তিত্ববোধ হৃদয় থেকে মুছে যায়, যখন আমাদের সমস্ত অবলম্বন একে একে খসে যায় এবং তিনি ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট থাকেন না।

দ্রৌপদী হয়রাণ হয়ে পড়লেন। অবশেষে নিজের সমস্ত প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে, কা'রও মুখাপেক্ষী না হয়ে যুক্ত করে শুধু ভগবানের

নিকট করুণা ভিক্ষা করতে লাগলেন। এতক্ষণে ভগবানের দয়া হ'ল। তিনি কেমন ক'রে অপ্রত্যাশিত ও অলৌকিকভাবে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিলেন, সে কথা তোমার অজানা নাই।

নির্ভরতা বড় কঠিন জিনিষ। বর্ত্তমানে তোমার পক্ষে তা আদৌ সম্ভবপর নয়। নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান যখন থাকবে না, বিশ্বের সব কিছু যখন একান্ত তুচ্ছ বলে মনে হ'বে, এমন কি নিজের অস্তিত্ববোধ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হ'বে, যখন গুরু বা ভগবানকেই একান্ত-শরণ বলে মনে হ'বে, তখনই ঠিক ঠিক নির্ভরতা আসবে! তার আগে নয়। আর এই নির্ভরতা আসা মাত্র তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি এবং সম্পদ ভক্তের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করবেন। এই নিয়মেই প্রহ্লাদ তাঁর প্রবল পরাক্রান্ত পিতার রোষবহ্নি হ'তে নিস্তার পেয়েছিলেন; ভগবান ছাড়া প্রহ্লাদ আর কিছুই জানতেন না, বা মানতেন না বলেই তিনি সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে পদে পদে রক্ষা করেছিলেন। দ্রৌপদীর উপাখ্যান অথবা প্রহ্লাদ-চরিত্র উপন্যাস বলে উপেক্ষা করো না। এ সব ঘটনা সত্যই ঘটেছিল এবং এখনও প্রকৃত নির্ভরশীল সাধু ভক্তগণের জীবনে অনুরূপ ঘটনা যে কত ঘটছে, কেই বা তার খবর রাখে, আর কেই বা বিশ্বাস করে।

একটা কথা শুনলাম। তুমি নাকি Union Board-এর Chairman হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছ। তোমার জীবনের সকল প্রকার কল্যাণের জন্য তুমি আমারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর, এই কথাটা জানিয়ে ইতিপূর্ব্বে অন্ততঃ তিন খানা চিঠি আমাকে লিখেছ; অথচ এই Chairman হয়ে নিজেই নিজের কল্যাণ সাধনের জন্য প্রবল প্রচেষ্টা শুরু করে দিয়েছ, এ দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোন্‌খানে? এরূপ নির্ভরতার অর্থ আমার বুদ্ধির অগম্য; তা' ছাড়া সাংসারিক কাজে আত্মনির্ভরতার অভাব নাই, যত অভাব ঐ সাধন-ভজনের বেলায়। এরই বা অর্থ কি?

ভাবের ঘরে চুরি করো না। গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টাকে মোটেই সাধু প্রচেষ্টা বলা যায় না। হয় বল, "জীবনের শুভাশুভের ভার গুরুর উপর ন্যস্ত করে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকব"; নয়ত বল, 'আত্মবিশ্বাস হারিয়ে, গুরুর উপর নির্ভর করে, চুপচাপ করে বসে থাকা আমার দ্বারা সম্ভবপর নয়।" দু'নৌকায় পা দিলে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশী থাকে। আমাকে সাক্ষীগোপালের মত খাড়া রেখে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মত চলতে গিয়ে যদি ঠকতে হয়, সে দায়িত্ব তোমার; আমার নয়। "ভট্‌চায মশায়, কাল আমাকে দিল্লী যেতে হ'বে, একটা দিন দেখে দিন ত"—এ নির্ভরতা ভট্‌চায মশায়ের উপর ততটা নয়, যতটা নিজের উপর; আর এতে রাস্তার কোনখানে train collision হয়ে যদি পা ভেঙ্গে যায়, তবে ভট্‌চায মশায় সে জন্য দায়ী হবেন না।

বাসনা কামনা যতদিন আছে, ততদিন নির্ভরতার কথা বলা প্রলাপোক্তি ছাড়া আমি আর কিছু মনে করি না। কর্ম্মযোগ অবলম্বন বা সাধনভজনের দ্বারা জ্ঞানের আগুন জ্বলে উ'ঠে যখন বাসনা কামনা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, তখনই কর্ম্মহীন অবস্থা বা নির্ভরতার যোগ্যতা লাভ হ'বে। কর্ম্ম না করে তা হওয়ার উপায় নাই। গীতাতে ত পড়েছ—"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।"

আজ এই পর্য্যন্ত। আমার colic pain আবার জানিয়েছে। তবে এবার কিছু কম। আশা করি কুশলে আছ।

(বোম্বাইয়ের জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্‌ গলসী

১১।২।৫১

বাসুদেবেষু—

তোমার চিঠি কাল পেয়েছি। তোমার প্রত্যেক পত্রেই একটা হতাশার সুর বেজে ওঠে দেখছি। এ চিঠিখানাতেও তা'র অপলাপ ঘটে নাই। ঠাকুরের সদাজাগ্রত আঁখি দুটি সকরুণ দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে; মঙ্গলময়ী জগজ্জননী ক্ষণকালের জন্যও তোমাকে চোখের আড়াল করেন না। তবু তোমার এই কাতরতা আমার চোখে বড় বিসদৃশ বলে মনে হয়।

যে সব বিভীষিকা তোমাকে অস্থির করে তুলেছে সেগুলো থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। এ সব ঠাকুরের আনন্দ-উৎসব, ব্রহ্মময়ীর লীলা-বিলাস; শোক দুঃখের অস্ত্র হাতে নিয়ে ঠাকুর তোমার সঙ্গে রণরঙ্গে মেতে গেছেন। তুমি শুধু অস্ত্রগুলোর দিকেই তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছ, যাঁর মঙ্গলহস্ত এই সকল অস্ত্রকে ধারণ করে আছে, তাঁর দিকে তোমার আদৌ দৃষ্টি নাই। তাই তোমার এই বিড়ম্বনা। আধিব্যাধির যবনিকা ফেলে দিয়ে আনন্দময়ী মা আমার আড়াল থেকে তোমার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করছেন। তুমি শুধু যবনিকা দেখে ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠ, যবনিকার অন্তরালে মঙ্গলময়ী জননীর শুভদৃষ্টির দিকে তোমার লক্ষ্য পড়ে না। তাই তোমার এই কাতরতা।

সংসারটা দুঃখের আগার নয়। এখানে শুধু সুখের রাজত্ব, আনন্দের মেলা, প্রেমের হাটবাজার। ঠাকুর জগতের অণুপরমাণুতে লুকিয়ে আছেন। জগতের প্রত্যেক বিষয় বস্তুর মধ্যদিয়ে বিশ্বজননী আত্মপ্রকাশ করছেন। তুমি যা'দিকে দুঃখদুর্দ্দশা ভেবে কাতর হও, তোমার পক্ষে অকল্যাণকর ভেবে তোমার ত্রিসীমানার মধ্যে আসতে দিতে ভয় পাও, যা'দিকে শত্রু মনে করে তাদের ধ্বংস সাধনে বদ্ধপরিকর হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে দাও, সে সব ঠাকুরেরই ছায়া—মহামায়ার মায়া। বন্ধু ভেবে তা'দিকে প্রেমালিঙ্গন দাও। তোমার একান্ত আত্মীয় মনে করে সাদরে তা'দিকে বরণ করে নাও। সবিস্ময়ে দেখবে তা'দের ভীষণতা দূর হয়ে গেছে; কঠোরতার পরিবর্ত্তে তা'দের অন্তর কোমলতায় ভরে উঠেছে, হিংসা-দ্বেষের পরিবর্ত্তে একটা অনাবিল প্রেম তা'দের হৃদয়ে ছাপিয়ে উঠেছে! তারপর কি হবে জান? এই সব দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ধকার যখন অপসারিত হয়ে যাবে, তখন দেখবে ঠাকুরের অপরূপ মূর্ত্তি। তখন উপলব্ধি করবে তাঁর প্রেমের গভীরতম গভীরতা। তোমার সমরলিপ্সা অন্তর্হিত হয়ে দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতি যখন একটা আত্মীয়তা-বোধ জাগ্রত হ'বে, তখন দেখবে, বরাভয়করা মা আমার তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন—চোখে তাঁর স্নিগ্ধ দৃষ্টি, মুখে তাঁর মধুর হাসি, বুকে তাঁর অফুরন্ত প্রেম-পীযুষ-ধারা।

ঠাকুরকে লাভ করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, মায়ের কোলে ওঠাই যদি আমাদের জীবনের সার্থকতা হয়, তবে দুঃখ-দুর্দ্দশা-রূপ তাঁর ছায়া-মূর্ত্তিগুলিকে অবজ্ঞা করা বা তাদের শত্রু মনে করে অন্তরে একটা বিদ্বেষের ভাব পোষণ করার মত নির্ব্বুদ্ধিতা আর কিছু হ'তে পারে না।

আবার বলি শোন। অভাব অশান্তি, দুঃখ-দুর্দ্দশা, আধি-ব্যাধি প্রভৃতির জ্বালাময়ী বিভীষিকা যখন তোমাকে ঘিরে ফেলবে, তখনই বুঝবে ঠাকুর

জটাশঙ্কর আসছেন ; তাই তাঁর ভূত প্রেত প্রভৃতি ছায়ারূপী অনুচরগুলোর তাণ্ডব নৃত্য সুরু হয়েছে। জগজ্জননীর আবির্ভাব সম্ভাবনা হয়েছে বলেই তাঁর ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি ছায়ামূর্ত্তি তোমাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করছে। বিশ্বাস কর, এই সব বিভীষিকা ঠাকুর বা জগন্মাতার অগ্রদূত। ভয় করো না। শোক দুঃখে অন্তরকে জর্জ্জরিত করে তুলো না। ঠাকুর আসছেন, ব্রহ্মময়ী তোমার দুয়ারে করাঘাত করছেন। পূজার আয়োজন কর, তাঁদের জন্য বরণডালা সাজাও, আনন্দ কর, উৎসব কর।

আবার বলি, কায়ার সন্ধান যদি পেতে চাও, তবে ছায়াকে অনাত্মীয় না ভেবে তা'র প্রতি একটা শ্রদ্ধা ফুটিয়ে তোল। সদাশিব ঠাকুরকে বা কল্যাণময়ী মা'কে পেতে হ'লে তাঁদের ভূতপ্রেত বা ডাকিনীযোগিনীগুলোর প্রতি, অর্থাৎ সাংসারিক ঝড়ঝঞ্ঝা প্রভৃতিকে সাদরে আলিঙ্গন দিতে হ'বে। তা যদি পার, তবে দেখবে তোমার সুখের দিন সমাগত। আর তা যদি না পার, তবে যে সুদিন তোমাকে আশ্রয় করার জন্য উৎসুক হ'য়ে রয়েছে, তা ভয়াবহভাবে পিছিয়ে পড়বে।

সাধন সম্বন্ধে যে সব কথা জানতে চেয়েছ, সাধনের দ্বারা তা আপনা হ'তেই বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়। উপদেশের দ্বারা এ সব ঠিক বোঝান যায় না, অনুভূতি বা উপলব্ধির দ্বারা বুঝতে হয়। আবার মৌখিক উপদেশের দ্বারা যতটা বোঝান যায়, পত্রের দ্বারা ততটা সম্ভবপর নয়। আজ আর সময় নাই। পরের পত্রে যতদূর সম্ভব বোঝাবার চেষ্টা করব।

আমার শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল। আশা করি, কুশলে আছ। কোন কারণেই বিচলিত না হয়ে মনটিকে একেবারে শান্ত করে ফেলতে চেষ্টা করবে। ঠাকুর তোমার সহায় হোন।

(চিরিমিরির জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ ৮, আনন্দ লেন,

কলিকাতা

২৮।৪।৫২

বাসুদেবেষু—

আমার রোগভোগের জন্য তোমরা অনর্থক চিন্তাগ্রস্ত হও কেন? এ রোগ প্রারব্ধের। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় নাই। তবু তোমাদের পাঁচজনের আগ্রহে ডাক্তার কবরেজ ডাকতে হয়, ঔষধও খেতে হয়। তা'তে সাময়িক উপকারও হয়ত অনেকটা হয়, কিন্তু আবার যে কে সেই। কাজেই আমার রোগ একরকম অবিচ্ছেদে চলেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু ভোগ প্রারব্ধের হ'লেও সবটাই যে তাই, তা নয়। আমার ইহজন্মকৃত কর্ম্মও এজন্য অনেকটা দায়ী। তুমি বলেছ, এত নিয়ম-নিষ্ঠা, সদাচার, সংযম সত্ত্বেও যদি এই প্রকার ভোগ হয়, তবে মানুষ নিরাপদ কেমন করে হ'বে? মানব-প্রকৃতির সঙ্গে যে সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, আমাদের সদাচারের দ্বারা সেইগুলিকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা যতই সফলতার দিকে অগ্রসর হয়, ততই তারা অন্য দিক দিয়ে আমাদি'কে হয়রাণ করে তুলতে উঠে পড়ে লেগে যায়; মায়াবীর মত রূপান্তর গ্রহণ ক'রে কখনও তারা উৎকট ব্যাধিরূপে প্রকট হয়, কখনও মানসিক অশান্তিরূপে আত্ম-প্রকাশ ক'রে আমাদের মনের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়; কখনও অভাবের রূপে উপস্থিত হয়ে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে পর্য্যুদস্ত করে তোলে, ইত্যাদি।

সাধারণের অজ্ঞাত হ'লেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন যোগীদের চোখে এ ব্যাপারটা ধরা পড়ে এবং এ জন্য তাঁরা মোটেই বিচলিত হন না। আমাদের প্রকৃতি-মহামায়াও মহাপ্রকৃতির অংশমাত্র। এই প্রকৃতিকে আশ্রয় করে যে সকল আধিব্যাধি, অভাব-অশান্তি প্রভৃতি মহাসাগরের উর্ম্মিমালার মত নৃত্যকরে, সেগুলোকে দেখে তাঁরা ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েন না, বরং এই নাচনের তালে তালে তাঁদেরও হৃদয় আনন্দে নেচে ওঠে। কারণ, এ সব খেলা যে মহামায়ার, আর এই মহামায়া যে আমাদের পরমাত্মীয়া! তাঁর মত সুহৃদ্ যে আমাদের আর কেউ থাকতে পারে না! আত্মীয়ভাবে আমাদের সঙ্গে তিনি যে প্রেমের খেলা খেলেন, আমাদের ভয় দেখান, তা'তে আমরা বিভ্রান্ত হ'ব কেন? রামপ্রসাদের গানে আছে—"ঐ দেখ্ সেই মাগীর খেলা—মায়ের আগুভাবে গুপ্তলীলা।"

উপরোক্ত কারণগুলো আমার অসুস্থতার জন্য বিশেষভাবে দায়ী হ'লেও, এর অন্যতম একটা নিগূঢ় কারণ আছে, যা মোটেই লঘুভাবে গ্রহণ করা চলে না। ঠাকুরের ইচ্ছায় জনসাধারণের মধ্যে সাধন প্রচার করার যে ব্রত আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে, আমার দৈহিক ভোগের এটাও একটা গুরুতর কারণ। ক্ষেত্র ঠিকভাবে প্রস্তুত করে না দিয়ে তা'তে বীজ বপন করলে যেমন সুফল লাভের আশা সুদূরপরাহত হয়ে ওঠে, তেমনি সাধন দেওয়ার অব্যবহিতপূর্ব্বে সাধন-প্রার্থীদের দেহ-মনকে অনুকূল করে নিতে হয়। সাপের ওঝা যেমন অনেক ক্ষেত্রে সাপের কামড়ে মরে, তেমনি দীক্ষার্থীদের বিষ নামাতে গিয়ে গুরুকেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষে জর্জ্জরিত হ'তে হয় এবং এই কারণে তাঁর দেহ মনের সুস্থতা বহুল পরিমাণে ব্যাহত হয়।

এখানে হয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে যে, দীক্ষার প্রাক্কালে যদি শিষ্যদের চিত্তশুদ্ধি ঘটে থাকে, তবে পরে আবার অনেককে অস্বাভাবিকভাবে কুক্রিয়াসক্ত হ'তে দেখা যায় কেন? তাদের হৃদয় নারকীয়ভাবে পূর্ণ হয় কেন? জমি

একবার তৈরী করে নিয়ে বীজ বপন করলেই কাজ শেষ হয়ে যায়না। আবার যেমন তা'তে আগাছা গজিয়ে ওঠে এবং আবার তা পরিষ্কার করতে হয়, শিষ্যদের হৃদয়-ক্ষেত্রও তেমনি একবার বিশুদ্ধ করে নেওয়া সত্ত্বেও আবার মালিন্য প্রাপ্ত হয় এবং পুনঃ পুনঃ তা'কে নির্দোষ করে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ প্রয়োজনটা গুরুর চেয়ে শিষ্যেরই বেশী। শিষ্যের অধিকাংশ কাজ গুরুর দ্বারা নিষ্পন্ন হ'লেও শিষ্যের গৌরব রক্ষার জন্য তা'কে দিয়েও অনেক কাজ করিয়ে নিতে হয়। সবই যদি গুরু করে দেন, তবে শিষ্যের কৃতিত্ব মোটেই থাকে না। সাধনে সিদ্ধিলাভ করার জন্য কোন গৌরবই শিষ্য দাবী করতে পারে না। এই কারণে দীক্ষা লাভের পর অনেকখানি দায়িত্ব শিষ্যের উপরই বর্ত্তে এবং এই দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন না করার জন্য তা'র মনের মধ্যে আগাছা জন্মে। দীক্ষার সময় দোষশূন্য হওয়া সত্ত্বেও তার অবস্থা যেই কে সেই হয়ে দাঁড়ায়। 'যথা পূর্ব্বং তথা পরম্'। রামকৃষ্ণদেব যেমন বলতেন— "যাত্রীরা গঙ্গা স্নান করতে নামবার আগে তাদের পাপগুলো গঙ্গার ধারে গাছগুলোর উপরে চড়ে বসে থাকে। স্নান সেরে ওঠামাত্র সেগুলো আবার তা'দের ঘাড়ে চেপে বসে"—এও ঠিক তেমনি।

কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও আরও একটা প্রশ্নের মীমাংসা এখানেই হওয়া উচিত। সাধন দেওয়াতে নিজের দেহ মনের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও আমার সাধন প্রদানে নিবৃত্ত না হওয়ার কারণ কী? নিজের স্বার্থটাকে বড় করে দেখার মত সঙ্কীর্ণতা ছোটকাল থেকে আমার মধ্যে কোন দিনই ছিল না, আজও নাই। বর্ত্তমানে দেশ যে অধঃপতনের চরম সীমায় নেমে গেছে ধর্ম্মহীনতাই যে তার প্রথম এবং প্রধান কারণ, এই উপলব্ধি করে আমি বহুদিন প্রাণে দারুণ সন্তাপ ভোগ করেছি; কাতর প্রাণে চোখের জলে জগতের কল্যাণ প্রার্থনা করেছি। শেষে জনসাধারণের মধ্যে সাধন প্রদান করার একটা দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে জেগে ওঠে। সাধন প্রদানের আকাঙ্ক্ষার

মূলে আমি যখন সুষ্ঠুরূপে আমার ঠাকুরকে দেখতে পাই, তখন আমার সঙ্কল্প দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় এবং নিজের সুখ সুবিধার প্রশ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এই কারণে বিশেষ কোন বাধা অন্তরে না বোধ করলে তাঁর ইঙ্গিত ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি নিজের স্বার্থ, সুখ, শান্তি সব ভুলে প্রার্থীমাত্রকে সাধন দিয়ে থাকি। সাধারণে তা'দের সংস্কারমত আমার কথার বিকৃত ব্যাখ্যা করতে কুণ্ঠিত হ'বে না জানি। কিন্তু অপরের পক্ষে যাই হোক, আমার পক্ষে তা'দের অপব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হ'বে।

তোমরা কিছু ভেবো না। আমার দেহ মন, এমন কি জীবনটাও ঠাকুরের পায়ে ফেলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। এসব নিয়ে তিনি যা খুশি করুন, কোন বিষয়ে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই নাই। তাঁর বিরাট ইচ্ছার মধ্যে আমি আমার সমস্ত বাসনা কামনা ডুবিয়ে দিয়েছি।

আশা করি কুশলে আছ।

(কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

ঠাকুরবাড়ী,
চন্দননগর
২৫।৬।৫২

বাসুদেবেষু—

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে উপদেশ চেয়েছ। উপদেশ শুনে ব্রহ্মচর্য্য পালনের আশা দুরাশা বলেই আমি মনে করি। গুরুর কাছে থেকে তাঁর অনুগত হয়ে চ'লে এবং তাঁর আদর্শ সম্মুখে ধারণ করে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

আমার ঠাকুর এইভাবেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করেছিলেন। পুরাকালের শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে বাস করে এইভাবেই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করত। তথাপি এ সম্বন্ধে দু'চারটা কথা জেনে রাখা ভাল। এতে লাভ ছাড়া লোকসান নাই।

তুমি এখন ছাত্র। ছাত্রাবস্থাই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার প্রকৃষ্ট সময়। আগে ছাত্রেরা গুরুগৃহে অবস্থান করে বিদ্যা এবং ব্রহ্মচর্য্য দুইই অভ্যাস করত। কিন্তু নানাকারণে বর্ত্তমানে এরূপ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়েছে। আজকালকার বিদ্যায়তনগুলিতে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় তোমার মত মুষ্টিমেয় যে সকল ছাত্র ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা বা অভ্যাস করতে সমুৎসুক তা'দিকে অন্য গুরুর শরণাপন্ন হ'তে হয়, যদিও এতে তা'দিকে নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়।

ব্রহ্মচর্য্য কথাটার অর্থ হচ্ছে, পরব্রহ্মে নিত্য অবস্থিতি। গীতায় আছে —"ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্। স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণিস্থিতঃ॥" অর্থাৎ প্রিয় লাভ করে যিনি হৃষ্ট হন না, বা অপ্রিয় পেয়ে যিনি উদ্বেগ বোধ করেন না, সেই স্থির, অসংমূঢ় ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানতে পারেন এবং ব্রহ্মে নিত্য-স্থিতি লাভ করেন। প্রকৃত ব্রহ্মচারী হ'তে হ'লে বা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করতে হ'লে, মনকে এমনভাবে বিকারশূন্য করে তুলতে হ'বে যেন সকল অবস্থাতেই হৃদয়ে শান্তি অব্যাহত থাকে, জীবনে সর্ব্বতোভাবে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়-দমন ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম এবং প্রধান সাধন হ'লেও এবং এই কারণে নানাপ্রকার কঠোরতার আশ্রয় গ্রহণ অধিকাংশ স্থলেই অপরিহার্য হ'লেও ব্রহ্মচর্য্যের আসল উদ্দেশ্যটা অহরহঃ যাদের মনের মধ্যে জাগরূক থাকে, তাদের পক্ষে পৃথকভাবে এই সব সাধনের কোন প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য একটা আকুল উৎকণ্ঠার ফলে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ পরোক্ষভাবে তা'দের মধ্যে আপনা হতেই

সংঘটিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের এই প্রকার অন্তরঙ্গ সাধন জ্ঞানযোগীর পক্ষে সহজসাধ্য হ'লেও, সাধারণকে প্রথম অবস্থায় নানাবিধ ব্রত নিয়ম, আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি কর্ম্মযোগের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়ে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করতে হয়।

'ব্রহ্ম' কথাটার অর্থ এত ব্যাপক যে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন কিছুর পৃথক অস্তিত্ব কল্পনা করা যেতে পারে না। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুতে ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে আছেন বলে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—যেখানে যা কিছু আছে, সমস্তই ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করতে হ'লে বিশ্ব প্রকৃতির তাবৎ বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে একটা জ্ঞান লাভ করা অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। এই কারণে আগেকার গুরুরা ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার্থীদিগকে প্রথমতঃ প্রকৃতির পাঠশালায় ভর্ত্তি করে নিয়ে তা'দের মধ্যে প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু সমূহের একটা বিবেক জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। এইজন্য ব্রহ্মচর্য্য কথাটার দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, 'প্রকৃতি পাঠ'। এই প্রকৃতি-পাঠ পুরাকালে ব্রহ্মবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্বিত হওয়ায় আর্য্যঋষিরা বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্রে এতদূর অধিকার লাভ করেছিলেন, আধুনিক জড়বিজ্ঞান যার ত্রিসীমানাতেও পৌঁছুতে পারে না। সংসারে এসে সাংসারিক বস্তুনিচয়কে অবহেলা করে অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে পড়ে থাকার কোন অর্থ হয় না এবং প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের তাৎপর্য্যও তা নয়। অতএব প্রকৃতি-পাঠ ব্রহ্মচর্য্য সাধনের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ।

'ব্রহ্মচর্য্য' কথাটার তৃতীয় অর্থ (এবং সাধারণতঃ এই অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয়) বহিরঙ্গ সাধন হ'লেও বীর্য্য-ধারণ ব্রহ্মচর্য্য সাধনের প্রধান অঙ্গ। অবৈধভাবে বীর্য্য ক্ষয় করলে দেহের সুস্থতা বা মনের স্থৈর্য্যলাভ অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বিধিমত বীর্য্যধারণ দ্বারা দেহ মন বলশালী হয় এবং এই বলিষ্ঠ দেহ মনের সাহায্যে প্রকৃতিপাঠ খুব সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। প্রাচীনগণের অবিসংবাদী সিদ্ধান্ত হচ্ছে—"মরণং বিন্দু-পাতেন,

জীবনং বিন্দুধারণাৎ"। বীর্য্য ধারণ যে শুধু ভগবৎলাভেই সহায়ক হয় তা নয়, এর দ্বারা জাগতিক যে কোন সাধনা খুব সুসিদ্ধ হয়। ব্রহ্মচর্য্য বা বীর্য্যধারণের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লে, আমাদের জীবন-সৌধ এমন বলিষ্ঠ এবং সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে, যা অনেক সময় সমগ্র জগতে বিস্ময় উৎপাদন করে।

কিন্তু কতকগুলি বিধি নিষেধের মধ্যে থেকে জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে বীর্য্যধারণ অসম্ভব হয়ে ওঠে। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপায়ে গুরুর নির্দ্দেশমত চলে বাল্যকাল থেকে ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করলে যে জীবন তৈয়ারী হয়, কোন কারণেই তা'তে পতনের আশঙ্কা থাকে না। ঠাকুর শ্রীশ্রীকুলদানন্দ তাঁর গুরুর নিত্যসঙ্গী হয়ে এবং আনুগত্য স্বীকার করে যেরূপ নিয়মনিষ্ঠা এবং কঠোরতার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করেছিলেন, বর্ত্তমান যুগে তার তুলনা নাই বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি তাঁর ব্রহ্মচর্য্য-জীবনের দিনলিপি (ডায়েরী) লিখে রেখে গেছেন এবং 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ' নামে আংশিকভাবে যা প্রকাশিত হয়েছে, সেই গ্রন্থে সর্ব্বত্র ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার অনেক অপূর্ব্ব সঙ্কেত রয়েছে। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার্থীগণ এই পুস্তকগুলি পড়লে যথেষ্ট লাভবান হ'বে এবং তোমাকেও আমি এই বইগুলি ভাল করে পাঠ করতে উপদেশ দি'। অবশ্য শুধু বই পড়লে বা নিয়মকানুন জেনে রাখলেই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করা যায় না। কঠোর সঙ্কল্পে জীবনটাকে কতকগুলি বিধিনিষেধ এবং ব্রতনিয়মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে হয়। ফাঁকি দিয়ে কোন কিছু হওয়ার উপায় নাই; বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্য সাধনে কোন রকম ফাঁকি বা গোঁজামিল চলে না।

তুমি আমাদের সাধনের অন্তর্ভুক্ত নও, তা'তে কিছু যায় আসে না। যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হও না কেন, 'সদ্‌গুরুসঙ্গ'-এ উপদিষ্ট উপায় অবলম্বন করে অনায়াসে চলতে পার। আমাদের কোন সম্প্রদায় নাই। 'সদ্‌গুরুসঙ্গ'

গ্রন্থেও সাম্প্রদায়িকতার কোন বালাই নাই। সব সম্প্রদায় হ'তে মোক্ষকামী বেছে নিয়ে তা'দিকে পরাশান্তির পথে এগিয়ে দেওয়ার জন্যই গোসাঁইজীর আবির্ভাব। তোমার প্রয়োজনমত অনায়াসে ঐ গ্রন্থের সদ্ব্যবহার করতে পার।

আশা করি কুশলে আছ। ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন।

(হাওড়া নিবাসী পূর্ত্তবিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্‌

কলিকাতা
১৫।৪।৫৪

বান্ধবেষু—

গুরু বা সাধন সম্বন্ধে যা জানতে চেয়েছেন, পত্রের ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে সে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়। তথাপি সংক্ষেপে দুচার কথা বলবার চেষ্টা করছি।

আপনি ঠিকই বলেছেন, গুরু যখন ভগবান তখন শিষ্যের দীক্ষা প্রাপ্তি বা গুরুলাভ হওয়ামাত্র তার ব্রহ্মলাভ হয়ে যায়। তাই যদি হয়, দীক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গেই যদি শিষ্যের সিদ্ধিলাভ হয়, তবে আবার সাধন নিয়ে টানাটানি কেন? নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান ব্রত নিয়ম প্রভৃতি মেনে চলার প্রয়োজন হয় কেন?

এক কথায় আপনার প্রশ্নের উত্তর এই হয়, গুরুই যে ভগবান এই সত্যটা দীক্ষার আগে শিষ্যের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না বলে দীক্ষা বা গুরুলাভ করেও

তার ব্রহ্ম বা পরমপদ লাভ হয় না। বিশ্বাসের অভাবে চরম বস্তু পেয়েও তার কাছে তা অপ্রাপ্ত থেকে যায়।

গ্রামের প্রান্তভাগে একটা অশ্বত্থ গাছে ভূত বাস করে এবং বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ ক'রে অন্ধকার রাত্রে সে পথিকদের সর্ব্বনাশ সাধন করে—এই অলীক, অনাবশ্যক এবং অনিষ্টকর জনশ্রুতিটা আমাদের আত্মীয়-স্বজনের চেষ্টায় ছোটবেলা থেকে এমন গভীরভাবে আমাদের অন্তরে অঙ্কিত হয়ে যায় যে, পরিণত বয়সে যখনই অন্ধকারের মধ্যে সেই গাছের কাছে যাওয়ার কল্পনা করি, তখনই আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যদি কখনও অনিবার্য্য কারণে গভীর রাত্রে সেই দিক দিয়ে আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা যে শুধু ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠি তা নয়, হয়ত আমাদের সংস্কার দিয়ে গড়া একটা বিকট মূর্ত্তি আমাদের যাত্রাপথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভূত সম্বন্ধে একটা মিথ্যা গুজব আমাদের মধ্যে এমনভাবে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে, অথচ গুরু আর ব্রহ্ম যে অভিন্ন, এই সত্য সংস্কারটা আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে না; তার কারণ, আমাদের শৈশবাবস্থা থেকে এ বিষয়ে কোন চেষ্টাই থাকে না। না আমাদের তরফ থেকে, না আমাদের অভিভাবকদের তরফ থেকে; এবং তা হয় না বলেই, গুরু বা ব্রহ্মলাভের পরও আমরা আবার নূতন করে ভগবানকে পাওয়ার জন্য মহাসমারোহে কঠোর সাধনে আত্মনিয়োগ করি।

এইখানেই আমাদের গলদ। দীক্ষা গ্রহণ না করলে অন্যায় হয়, এইরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে আমরা অনেকেই গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করি। কিন্তু তিনি যে ব্রহ্মের প্রতীক, গুরুকরণের পূর্ব্বে তাঁর সম্বন্ধে এই বিশ্বাসটা হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কোন প্রয়োজনই আমরা অনুভব করি না। এই বিশ্বাস যদি আমাদের মধ্যে বিকশিত হ'ত, তবে গুরুলাভ হ'বে, এই কথা মনে উদিত হওয়া মাত্র আমাদের চিত্তে একটা শিহরণ জেগে উঠত, অন্তর জড়সড় হয়ে

যেত, অপূর্ব্ব পুলকে আমাদের হৃদয় ভরে উঠত। তারপর সাধন প্রাপ্ত হয়ে তাঁকে গুরুত্বে বরণ করার অধিকার লাভ করামাত্র, আমাদের চির অভীপ্সিত দেবতার চরণে আত্মসমর্পণ করে আমরা জন্ম সার্থক করতাম। তখন সাধন নয়—শুধু সেবা, শুধু পূজা, শুধু প্রেম নিবেদন করে আমরা আমাদের জীবনকে ধন্য করে তুলতাম।

'পতি পরম দেবতা'—এই সংস্কারটা বাল্যকাল থেকে হিন্দু কন্যার হৃদয়ে ফুটে ওঠার অনুকূলে সব রকম সুযোগ সে প্রাপ্ত হয়। পতি দেবতার চরণে হৃদয়-মনের সমস্ত শ্রদ্ধা উজাড় করে ঢেলে দেওয়ার মধ্যেই যে নারীজীবনের চরম সার্থকতা নিহিত থাকে, ঘরে বাইরে অনেক কিছু দেখে শুনে এই ধারণাটাই তার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়। তাই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর একটা আকুল উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় সে অতিবাহিত করে, যেদিন একজন অজ্ঞাত যুবাপুরুষকে স্বামীত্বে বরণ করে নেওয়ার সৌভাগ্য তার কাছে উদিত হবে। সে শুভলগ্ন সত্য সত্যই যখন সমুপস্থিত হয়, কতকগুলি বাহ্য আচার অনুষ্ঠান কয়েকটা মন্ত্র পাঠাদির মধ্যদিয়ে যখন সে তার অন্তর-দেবতাকে লাভ করে, তখন তার হৃদয়ে অন্তরতম আত্মীয়তার প্রতীকরূপে উজ্জ্বলভাবে প্রকট হয়ে ওঠে সেই নবাগত অতিথির প্রেমসুন্দর মূর্ত্তি, আর বিশ্বের অন্য সব আকর্ষণ যেন কোন্ যাদুমন্ত্রের প্রভাবে তা'র কাছে অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়।

একটা রাত্রির মধ্যে এই যে ওলোট পালোট হয়ে যায়, একজন অপরিচিত পুরুষ যে কুমারী-হৃদয় অধিকার ক'রে ত'ার মাতাপিতার চেয়েও গুরু হয়ে ওঠে, বিবাহকালে অনুষ্ঠিত ব্যাপারসমূহ অনেক পরিমাণে এর কারণ হ'লেও বালিকার হৃদয়ে তার শিশুকাল থেকে তিল তিল করে স্বামীত্বের যে সংস্কার গড়ে ওঠে, তারই ফলে এতবড় অঘটন সম্ভবপর হয়। ঠিক এমনিভাবে দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে যদি আমরা গুরুত্বের

সংস্কার হৃদয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারতাম, গুরুকে যদি আমাদের একান্ত শরণ বলে ধারণা করতে পারতাম, ব্রহ্মবস্তুর সহিত তাঁর সারূপ্যবোধ যদি আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হ'ত, তবে দীক্ষামাত্র গুরুই আমাদের কাছে ভগবানরূপে প্রতিফলিত হ'তেন, অপর কোন ভগবানকে পাওয়ার জন্য আমরা লালায়িত হ'তাম না। কাজেই সাধনের কোন প্রয়োজনও অনুভূত হ'ত না।

দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জীবের গুরুব্রহ্ম বা পরমপদ লাভ হয়, অর্থাৎ সে ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। "দীক্ষাগ্রহণমাত্রেন নরোনারায়ণোভবেৎ"— এই শাস্ত্রবাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য। অথচ গুরুর যথার্থ স্বরূপবিষয়ে একটা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অভাবে দীক্ষাদানরূপ এতবড় একটা অনুষ্ঠান, যার দ্বারা সকল চাওয়া-পাওয়ার অবসান হ'য়ে যায়, অনেকের হৃদয়েই তা তেমনভাবে রেখাপাত করতে পারে না।

পত্র দীর্ঘ হয়ে পড়ছে অথচ আমার বক্তব্যের একটা দিক মাত্র প্রদর্শিত হ'ল। এর আরও একটা গুরুতর দিক আছে। যদি আপনার আগ্রহ বুঝতে পারি, তবে আর একখানা পত্রে আরও যা বলবার আছে বলবার চেষ্টা করব। নতুবা আপনাকে চিঠি লেখা এই আমার প্রথম এবং এই হয়ত শেষ। আশা করি কুশলে আছেন। ঠাকুর আপনার কল্যাণ করুন।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ কলিকাতা

(২) ৫।৬।৫৪

বাসুদেবেষু—

আমার পূর্ব্বপত্র যে আপনাকে আনন্দ দিতে পেরেছে, তা জেনে খুব সুখী হয়েছি। আপনার মত উচ্চ-শিক্ষিতের কাছ থেকে এমন একখানা certificate পাওয়া কম গৌরবের কথা নয়। আপনার দ্বিতীয় পত্রে আপনি যে প্রশ্ন তুলেছেন, তারই উত্তর দেওয়ার জন্য আর একখানা পত্র আমি লিখতে চেয়েছিলাম এবং এই পত্রে তা'রই একটা সমাধান করার চেষ্টা করব।

আমার পরমগুরু ভগবান শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-জীউকে তাঁর কোন শিষ্য একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "অপরাপর সাধন অপেক্ষা আমাদের সাধন কোন বিষয়ে বিশেষত্ব দাবী করতে পারে কি না?" উত্তরে গোসাঁইজী বলেছিলেন, "হাঁ। অন্যান্য সাধন গুরুকৃপা ও সাধন-সাপেক্ষ, কিন্তু আমাদের সাধন শুধু গুরুকৃপা-সাপেক্ষ।" এ কথার তাৎপর্য এই যে, অন্যান্য সাধনে গুরু এবং শিষ্য উভয়ের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত শিষ্যের পক্ষে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব; কিন্তু গোস্বামীপ্রভু যে সাধন প্রদান করতেন তা' শিষ্যের তরফ থেকে কোন প্রকার অধ্যবসায়ের অভাবেও সিদ্ধি প্রদানে সমর্থ। অপরের কাছে গোসাঁইজীর উক্তি সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট এবং অতিশয়োক্তি বলে মনে হ'লেও, তাঁর সাধন-পরিবারভুক্ত অনেকেই এ কথার যাথার্থ্য বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। বলা বাহুল্য, আমি নিজেও গোস্বামীপ্রভুর কথা অভ্রান্ত বলেই মনে করি।

পূর্ব্বপত্রে আমি লিখেছিলাম যে, বাল্যকাল থেকে যদি আমাদের মনে গুরু ও ব্রহ্মের একত্ব বিষয়ক একটা সংস্কার গড়ে ওঠে, তবে গুরুকরণের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সিদ্ধিলাভ হয়। অবশ্য এর সঙ্গে গুরুশক্তির সংযোগ হওয়া চাই; অর্থাৎ ঠিক ঠিক গুরুকরণ বা দীক্ষা হওয়া চাই। কারণ, গভীর পরিতাপের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নামমাত্র গুরুকরণ হ'লেও আসল দীক্ষা হয় না। আর তা' যদি না হয়, তবে শিষ্যের অদীক্ষিত অবস্থায় সর্বপ্রকার সাধনা বা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সে গুরুনামধারী যে কোন অযোগ্য ব্যক্তিতে ব্রহ্মত্ব আরোপ করবে, তাঁর মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করবে, তা মোটেই সম্ভবপর নয়। শিষ্যের সাধনা যেখানে দীক্ষার পর থেকে আরম্ভ হয়, অর্থাৎ অদীক্ষিত অবস্থায় সাধনের অভাবে যার দীক্ষামাত্র ব্রহ্মপদ লাভ হয় না, তা'রও সাধনা গুরুকৃপা-সাপেক্ষ। কাজেই উভয় ক্ষেত্রেই শিষ্যের সিদ্ধিলাভের জন্য তা'র নিজের সাধনা এবং গুরুকৃপা উভয়ের সংযোগ চাই।

কিন্তু সদ্‌গুরুর দীক্ষায় একটা বিশেষত্ব আছে—গোস্বামী প্রভু যা দাবী করতেন। সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা পেলে শিষ্যের কিছুই করবার থাকে না। গুরুলাভের সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ হয়, তা সে যে অবস্থার বা যে পর্য্যায়ের লোক হোক না কেন। ঢোঁড়া সাপে যে ব্যাঙকে ধরেছে সে পালিয়ে বাঁচতে পারে বটে; কিন্তু যে ব্যাঙ গোখ্‌রো সাপের কবলে পড়েছে সে যদি কোন রকমে পালিয়েও যায়, তবু সে যে গর্ত্তে গিয়েও মরে থাকবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কাজেই গোখ্‌রো সাপে ধরামাত্র তা'র জীবনলীলা শেষ হয়ে যায়, এ কথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হয় না। বিষে জর্জ্জরিত অবস্থায় যেটা তা'র জীবনের স্পন্দন বলে মনে হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে সেটা মৃত্যুরই করাল ছায়া। তেমনি সদ্‌গুরু শিষ্যকে একবার স্পর্শ করামাত্র তা'র বিগত জীবনের অবসান হয় এবং

পুরাতনের ধ্বংসস্তূপের উপর একটা দেবতাবাঞ্ছিত জীবন গড়ে ওঠে। নদীতে যখন হঠাৎ প্রবল বান আসে, তখন যেমন তার ধ্বংস-লীলা ঘোলা জল, ফেনা, আবর্জ্জনা প্রভৃতি তাকে একটা বিশ্রী রূপ প্রদান করে, তেমনি সদ্‌গুরুর কৃপায় শিষ্য-হৃদয়ে যখন সাধনার বান ডেকে যায়, তখন কোন কোন ক্ষেত্রে আপাততঃ তার জীবনটাকে কুৎসিত বলে মনে হ'লেও, কিছুকাল পরে তা অভিনব সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে ওঠে। যেমন নদীর বন্যার প্রকোপ কমে গেলে সে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, আর বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলসমূহ শস্যশ্যামল হয়ে উঠে।

কথাগুলি অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া আপনার পক্ষে খুব দুরূহ, এমন কি অসম্ভব মনে হ'তে পারে তা জানি। কিন্তু অস্থিমজ্জায় যা সত্য বলে অনুভব করেছি, নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছি, কেউ বিশ্বাস করুক, বা না করুক, দৃঢ়তার সঙ্গে তা' প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বলেই আমি মনে করি। আমি যা বলেছি বাহ্য প্রমাণ বা যুক্তিতর্কের দ্বারা তা' বোঝান যায় না; শুধু তারাই বুঝতে বা বিশ্বাস করতে পারে, সদ্‌গুরু যাদের পাষাণ হৃদয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন, শুকনো ডালে ফুল ফুটিয়েছেন। সদ্‌গুরুর আচার ব্যবহার, চলাফেরা প্রভৃতি বাহ্যতঃ সাধারণ লোকের মত মনে হ'লেও, তাঁরা ব্রহ্মশক্তিতে শক্তিমান বলে শিষ্য-হৃদয়ে এমন একটা শক্তি সঞ্চার করতে সক্ষম হন, যার ফলে সে একটা দুর্ল্লভ অবস্থা লাভ করে ধন্য হয়। চুম্বকের আকর্ষণে যে লৌহ চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, সে যেমন অপর লৌহখণ্ডকেও চুম্বকত্ব প্রদান করতে পারে, তেমনি ব্রহ্মশক্তিতে শক্তিমান সদ্‌গুরু অপরের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে তার লৌহ-হৃদয়ের উপাদানগুলি এমন ভাবে পালটে দেন যে, সে একটা অভিনব রূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু গুরুশক্তি শিষ্য-হৃদয়ে এমন অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া করে যে, সে এই পরিবর্ত্তনের ফল প্রথমটা মোটেই উপলব্ধি করতে পারে না। তাই সাধনের পশ্চাদ্ধাবন করে হয়রাণ হয়।

কস্তুরী-গন্ধে উন্মত্ত মৃগ যেমন তার নাভিদেশে গন্ধদ্রব্যের সন্ধান না পেয়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করে, মণিহার তা'র কণ্ঠে বিলম্বিত থাকা সত্ত্বেও শিশু যেমন ভ্রান্তিবেশে চারিদিকে খুঁজে বেড়ায়, এও ঠিক তেমনি।

এ সম্বন্ধে এখনও সব কথা বলা হ'ল না। এখানে আর কিছু সম্ভবও নয়। যদি আপনার নির্দ্দেশ পাই, তবে পরপত্রে এ বিষয়ের আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। কিন্তু এতক্ষণ পর্য্যন্ত যা বলেছি, তা যদি আপনার ঢাকের বাদ্য বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি চুপ করে যাব। আশা করি কুশলে আছেন।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

(৩)

বরাহনগর

২৯।৭।৫৪

বাসুদেবেষু—

আপনার পত্র পেয়ে আপনাকে পুনরায় পত্র দিতে উৎসাহিত হ'লাম। আমি ঢোঁড়া সাপ, না গোখ্‌রো সাপ জিজ্ঞাসা করেছেন। ঢোঁড়া বা গোখ্‌রো যাই হই না কেন, যেহেতু আমি সাপ, আমার স্বভাব যে হিংস্র, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই। অতএব আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হ'বে না।

সদ্‌গুরু যে দীক্ষা দেন তার দ্বারা তিনি শিষ্যের হৃদয়-যন্ত্রকে নিজের ছাঁচে গড়ে তোলেন। তার যেখানে যত শিষ্য আছে, সবাই তাঁর সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই যে সারূপ্য লাভ, এটা যে দেহের সারূপ্য নয় অন্তরের, সে কথা বলাই বাহুল্য। কেন্দ্রীয় বেতার-যন্ত্রে সুর

সংযোগ করলে অনুরূপভাবে গঠিত সমস্ত বেতার-যন্ত্রেই যেমন সেই একই সুর বেজে ওঠে, তেমনি সদ্‌গুরুর হৃদয়ে সাধনের যে স্পন্দন বা নামের ধ্বনি ওঠে, তাঁর নিজের ছাঁচে ঢালা শত সহস্র শিষ্য-হৃদয়ও ঠিক সেই স্পন্দনে ধ্বনিত হয়। এতে শিষ্যের কোন প্রচেষ্টা বা কৃতিত্বের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সদ্‌গুরুর হৃদয়ে নাম বা সাধন অহর্নিশ চলতে থাকে ব'লে তাঁর শিষ্য-হৃদয়েও সাধন তরঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাই যদি হয় তবে সদ্‌গুরুর দেহত্যাগের পর যখন তাঁর সাধন বন্ধ হয়ে যায়, তখন শিষ্য-হৃদয়েও সাধন বা নাম-প্রবাহও স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই এইজন্য যে, সদ্‌গুরু স্থূল দেহটা ত্যাগ করলেও সূক্ষ্ম বা কারণশরীরে তিনি থেকে যান এবং তাঁর মধ্যে সাধন প্রবাহও অব্যাহত থাকে। পরলোক থেকেই তিনি স্বাভাবিক সাধন-প্রবাহ দ্বারা শিষ্য-হৃদয়েও সাধন-স্রোত প্রবহমান রাখেন। কথাগুলি ঠিক গুছিয়ে বলা হ'ল কিনা জানি না। মোটের উপর কথা এই যে, দীক্ষার সময় সদ্‌গুরু তাঁর শিষ্যের শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে নামটা এমনভাবে গেঁথে দেন যে, শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নাম আপনা থেকেই চলতে থাকে। অনেক সময় এই নাম বা মন্ত্র বা সাধনের কোন খোঁজ না পেলেও নাম-প্রবাহ যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত নিঃশব্দে অবিরাম গতিতে শিষ্যের শ্বাস বায়ুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, এতে সন্দেহ করার কোন কিছু নাই। শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে সজাগ দৃষ্টি থাকে না বলেই শিষ্য অধিকাংশ সময়েই সাধন বা নামের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া মাত্র নাম প্রকাশিত হয়ে তার কাছে ধরা দেয়। সে তখন নিরপেক্ষ দর্শকের মত নামের গতিবিধি লক্ষ্য করে মাত্র। নাম করার জন্য তা'র কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। শ্বাস প্রশ্বাসকে আশ্রয় করে নাম আপন মনে প্রবাহিত হয়।

শ্বাস প্রশ্বাসে মন না দিয়ে অনেক সময়ে অনেক প্রকারেও নামের সন্ধান পাওয়া যায়। কোথাও গীতবাদ্য বা সংকীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান হ'লে অকস্মাৎ নাম প্রকাশিত হয়ে সেই গীতবাদ্যের তালে তালে নেচে ওঠে। ভগবৎ প্রসঙ্গ শ্রবণে, ধূপধুনা অথবা কুসুমের আঘ্রাণে, দেবমূর্ত্তির দর্শনে এবং অপরাপর কারণেও সদ্‌গুরুর আশ্রিত শিষ্য-হৃদয়ে শ্বাসবায়ুর অন্তর্নিহিত নাম জেগে উঠতে দেখা যায়। এই সব বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ামাত্র সে নাম-সাধনের একটা প্রেরণা লাভ করে এবং আত্মচেষ্টার দ্বারা তার শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে নাম প্রবাহ মিশিয়ে দেয়, এরূপ মনে করার কোন হেতু নাই। দেহের কোন স্থানে কণ্টক বিদ্ধ হ'লে আমাদের অন্তর্নিহিত বেদনা যেমন স্বাভাবিকভাবে জেগে ওঠে, তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য যেমন কোন অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয় না, তেমনি উপরোক্ত গীতবাদ্য, পুষ্পগন্ধ প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ামাত্র শ্বাসবায়ুর মধ্যে অবস্থিত নাম শিষ্যের বিনা চেষ্টায় সহজভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

অতএব আমরা অনুক্ষণ স্বাভাবিকভাবে ঠাকুরের চরণে নাম প্রবাহ ঢেলে দি—প্রতিনিয়ত তাঁকে নমস্কার করি। এই সহজ আরাধনা অধিকাংশ সময়েই আমাদের অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের ঘরে যখন ব্রহ্মপূজার অনুষ্ঠান হয়, ঠাকুরের চরণে যখন ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী নিবেদিত হয়, পূজার মন্দিরে যখন মঙ্গল শঙ্খ বেজে ওঠে, হতভাগ্য আমরা তখন বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়াই অথবা ঘুমঘোরে অচেতন থাকি। আমাদের শুধু কর্ত্তব্য শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে এই পূজা দর্শন করে ধন্য হওয়া। সাধনার নিষ্ফল প্রয়াস করতে গিয়ে শক্তির অপব্যয় করে কোন লাভ নাই।

তথাপি যদি আমাদের সংস্কার সাধন অভ্যাসের জন্য আমাদের মধ্যে প্রেরণা জাগিয়ে তোলে, তবে যে পূজা বা প্রণাম-মন্ত্র আমরা অবিরত গুরুর চরণে পৌঁছে দি, তার মর্ম হৃদয়ে ধারণার দ্বারা অচঞ্চল চিত্তে

তাঁর উপাসনায় যোগদান করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এ বিষয়ে শ্রুতির উপদেশও ঠিক তাই। 'তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত'—সমগ্র বিশ্ব আমার ঠাকুরের বিরাট দেহ হ'তেই জাত হয়েছে, তাঁকে অবলম্বন করেই অবস্থান করছে এবং তাঁরই মধ্যে বিলীন হ'বে, এইটা উপলব্ধি করে শান্তভাবে তাঁকে উপাসনা করতে হ'বে। আমাদের মধ্যে যে সব নাম প্রচলিত আছে, তার তাৎপর্য্যও মূলতঃ এই শ্রুতিমন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাবেরই অনুরূপ।

আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করলাম। ঠাকুর আপনার কল্যাণ করুন।

(কুচবিহারের জনৈক ভক্তকে লিখিত)

(প্রথম)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্‌

কলিকাতা

৩।১২।৪৯

বাসুদেবেষু—

সর্ব্বসংস্কার বর্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক জ্ঞানের উন্মেষ হয় না। পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, উচ্চনীচ, ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রভৃতি বিবিধ সংস্কার যতদিন চিত্তকে আন্দোলিত করে তুলবে, ততদিন জ্ঞান তরঙ্গায়িত এবং খণ্ডিতভাবে হৃদয়ে প্রকাশিত হবে এবং এ জ্ঞান মনের অন্ধকার বিদূরিত করার পক্ষে মোটেই পর্য্যাপ্ত হবে না। বিচারের দ্বারা বা বই পড়ে অথবা কারও উপদেশ শুনে জ্ঞান লাভ হ'ল বলে মনে হয়ত একটা তৃপ্তি পাওয়া গেল, কিন্তু সংস্কারমুক্ত না হওয়ার দরুণ পরমুহূর্ত্তেই তা ওলোট পালোট হয়ে যায়। যেটা জ্ঞানরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়েছিল সেটা অজ্ঞান বলেই প্রতিভাত হয় এবং অপর একটা জ্ঞান সাময়িকভাবে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রকার আলো

আঁধারের খেলা মানবহৃদয়ে প্রতিনিয়ত চলছে এবং আমাদের মন সাম্যে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রকার দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে চলতে থাকবে অর্থাৎ বিবিধ প্রকারের যে সমস্ত সংস্কার আমাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে, তাদের উচ্ছেদ সাধন না করা পর্য্যন্ত জ্ঞান-সূর্য্যের সম্যক প্রকাশ হবে না— এবং তা না হলে আত্মার সাক্ষাৎকারও সম্ভব হবে না। আবার এ কথাও বলা যায় যে, প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত মন সংস্কারমুক্ত হতে পারে না। জ্ঞানই জ্ঞানের সাধন অর্থাৎ জ্ঞান বা বিচারের দ্বারা মনকে ক্রমশঃ সংস্কার-বর্জ্জিত করতে করতে জ্ঞানের উন্মেষ হয়। 'নেতি' 'নেতি' বলে বিচার করে সংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান-খড়্গ প্রয়োগের দ্বারা তাদের এক একটা করে ধ্বংস করার চেষ্টা করলে সর্ব্ব সংস্কার বিমুক্ত হওয়া যেতে পারে। সময়ে সময়ে মনে হয় বিচার-অস্ত্রের প্রয়োগে মন সকল প্রকার সংস্কার শূন্য হয়েছে; কিন্তু পুনরায় কিছুদিন পরে সংস্কারের আগাছায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়। এর কারণ এই যে, সিদ্ধিলাভের জন্য যে বিচারপদ্ধতি বা জ্ঞানকে অবলম্বন করা হয়, তা মোটেই ভ্রম প্রমাদ শূন্য নয়। তথাপি এই জ্ঞান-সাধন অনেক সময় নিষ্ফল হয় না এই জন্য যে, ভগবান সাধকের অধ্যবসায় এবং আন্তরিকতার পরিচয় পেয়ে করুণাপরবশ হয়ে তার হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের বাতি জ্বেলে দেন, যার দ্বারা সমস্ত কুসংস্কার এবং অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হয়ে যায়। সূর্য্য প্রকাশিত হলে কুয়াশা দূর হয়, না কুয়াশা দূর হলে সূর্য্য প্রকাশিত হন, একথা বলা যেমন শক্ত, তেমনি জ্ঞানের প্রকাশ আর সংস্কারের বিনাশ, এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা আগে আর কোন্‌টা পরে হয়, তা বলা দুঃসাধ্য। হয়তো দুটোই এক সঙ্গে হয়। কিন্তু এ ঝগড়ার কোন প্রয়োজন নাই। আসল কথা এই যে, ক্রমাগত বিচার বা জ্ঞান-সাধনের দ্বারা সাধক যখন হয়রাণ হয়ে ওঠে এবং তার সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত

হয়, তখন গুরু বা ভগবানের কৃপায় সে দিব্যজ্ঞান লাভ করে এবং সর্ব্বসংস্কার মুক্ত হয়।

বিচার বা জ্ঞানমার্গ ছাড়া সংস্কার-মুক্তির আর একটা উপায়ের কথা বলি। কাঁটা দিয়ে যেমন কাঁটা তোলা যায়, কানে জল দিয়ে যেমন জল বার করা যায়, তেমনি মনকে সংস্কার-বর্জ্জিত করার জন্য আরও কতকগুলো সংস্কার মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয়। যে কারণে দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয়, সেই কারণ যেমন অনেক সময়ে দেহকে ব্যাধিমুক্ত করতেও সহায়তা করে, তেমনি সংস্কারের কাঁটা দিয়ে সংস্কারের কাঁটা তোলার অপূর্ব্ব কৌশল আর্য্য-ঋষিরা আবিষ্কার করে গেছেন এবং এই কৌশলকে হিন্দুধর্ম্মের একটা বৈশিষ্ট্য বলা চলে। অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীরা, এমন কি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অনেকেও এই সমস্ত সংস্কারকে কুসংস্কার বলেই উড়িয়ে দিতে চায়, কিন্তু জ্ঞান বিচারে অসমর্থ জনসাধারণের পক্ষে এই পন্থাটা যে কত কার্য্যকরী তা বলে শেষ করা যায় না। উলুবনে মুক্তা ছড়িয়ে লাভ নেই। বিচার বা জ্ঞান জিনিষটা যত প্রয়োজনীয় বা মূল্যবানই হোক না কেন, অধিকাংশ লোকের কাছে এর অর্থবোধই হবে না এবং এজন্য তাদের কাছে এ জিনিষের প্রচার বা প্রয়োগ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে। অপর পক্ষে যে অজ্ঞান জনগণের মধ্যে সংস্কার-শ্রেণীরূপে আগে হতেই পুঞ্জীভূত হয়ে আছে এবং সেই গুলোই অভীষ্টসিদ্ধির সহায়ক বলে যাদের ধারণা, তাদের ঘাড়ে আরও কতকগুলো সংস্কার চাপিয়ে দিলে সিদ্ধিলাভের সুগম পন্থা বলে সেগুলো গ্রহণ করা তাদের পক্ষে অনেকটা সহজসাধ্য হবে। এই সব ক্রমবর্দ্ধমান সংস্কারের বোঝা নিয়ে পথ হাঁটতে হাঁটতে যখন তারা হাঁপিয়ে ওঠে অথচ এই পণ্ডশ্রমের কোন সার্থকতাই তারা উপলব্ধি করতে পারে না, তখন সংস্কারগুলোকে আপদ বা শত্রু বলেই তাদের মনে হয়, আর তাদের প্রাণের অন্তঃস্থল হতে এদের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য ভগবানের নিকট একটা

আকুল প্রার্থনা উত্থিত হয়। ভগবান তখন কৃপাপরবশ হয়ে তাদের হৃদয়ে জ্ঞানের আগুন জেলে দেন। এই আগুনে তাদের সংস্কারগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়, আর যে আত্মা সংস্কারাচ্ছন্ন থাকার জন্য এতদিন তাদের অগোচর ছিল, তা প্রকাশিত হয়ে পড়েন।

কিন্তু সব ক্ষেত্রেই যে এই প্রকার হয় তা নয়। কখনও কখনও জ্ঞানাগ্নির পরিবর্তে শুভ্র স্নিগ্ধ জ্ঞানের আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। সে আলোক সংস্কারগুলোকে দগ্ধ না করে তাদিকেও উদ্ভাসিত করে তোলে এবং সবিস্ময়ে সাধক দেখতে পায় যে, যাদিকে সে শত্রুভাবাপন্ন ভেবেছিল তারা আত্মারই অঙ্গীভূত, তার একান্ত সুহৃদ্। সে তখন প্রত্যেকটি সংস্কারের মূলে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে। সে সব সংস্কার তখন তাদের কাছে নিরর্থক বলে মনে হয় না, তাঁরই অঙ্গজ্যোতিঃরূপে সেগুলি তার কাছে দেদীপ্যমান হয়। সংস্কারগুলো মিথ্যা একথা খুবই ঠিক। কিন্তু এই সব সংস্কারের মূলে যদি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা হয়, তবে সেগুলি সারবান এবং সার্থক হয়ে ওঠে। কতকগুলি শূন্যের (০) কোন মান বা মূল্য নাই, কিন্তু এগুলির পশ্চাতে যদি একটী এক (১) স্থাপন করা যায় তবে যেমন শূন্যগুলি সার্থক হয়ে ওঠে, এও তেমনি।

আমার বক্তব্য এখনও শেষ হ'ল না এবং সব কথা হয়ত গুছিয়ে বলাও হ'ল না। যা হোক, এবিষয়ে আর একখানা পত্র আমি শীঘ্র তোমাকে লিখব আশা করছি এবং তা'তে জিনিষগুলো যাতে আরও পরিস্ফুট হয়, তার চেষ্টা করব।

আমার শরীর কোনরূপে চলে যাচ্ছে। তোমাদের কুশল কামনা করি।

(দ্বিতীয়)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

ভাগলপুর

২৯।১২।৪৯

বাসুদেবেষু—

আমরা প্রত্যেকেই কতকগুলো করে সংস্কার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করি। যে সব পারিপার্শ্বিকতার মধ্যদিয়ে আমাদের জীবন-ধারা প্রবাহিত হয়, তাদের প্রভাবে এই সব সংস্কারের হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে; অনুকূল আবহাওয়ায় কতকগুলো সংস্কার হয়ত আমাদের মধ্যে পুষ্টি লাভ করে, আবার কতকগুলো জন্মগত সংস্কার হয়ত প্রতিকূল আবহাওয়ায় ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে যায়! এই সব সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আমাদের আধ্যাত্মিকতার পানে অগ্রগতি ব্যাহত হয় বলে অনেক ধর্ম্মোপদেষ্টা এগুলোকে সংহারের পরামর্শ দেন। কিন্তু যে সংস্কারগুলোকে আশ্রয় করে আমাদের জীবন গড়ে উঠেছে, তাদের বিনাশ সাধন করা অনেকের কাছে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম বলেই মনে হয়। তারা এ উপদেশের সারবত্তা বা সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারে না। এই প্রকার অবস্থায় অনেকে জ্ঞান উপদেশের দ্বারা শিষ্যের দৃষ্টি খুলে দেন। যখন সে বুঝতে পারে যে এগুলো শুধুই ছায়া বা মায়া, তখন স্বতঃই এগুলোকে সংহার করার একটা প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে জেগে ওঠে, আর তাদের মধ্যে সাধন-সমর আরম্ভ হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জ্জুনের এই প্রকার মোহ উপস্থিত হয়েছিল। আত্মীয়দের ধ্বংস সাধন তাঁর কাছে অধর্ম্ম বলে প্রতীয়মান হয়েছিল এবং 'এতান্ হন্তুং ন ইচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন' বলে তিনি ধনুঃশর পরিত্যাগ করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন জ্ঞান উপদেশের দ্বারা অর্জ্জুনকে

যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেছিলেন। আত্মরাজ্য লাভের জন্য আমাদের মধ্যে যে সাধন-সমর অনুষ্ঠিত হয়, সেইটাই রূপকের ভাষায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নামে অভিহিত হয়েছে। কিন্তু সে কথা যাক। কোন কোন গুরু শিষ্যদিকে সংস্কারসমূহের সংহারে অনিচ্ছুক দেখেও জোর করে জ্ঞান বিচারের অস্ত্র প্রয়োগ করে সেগুলোকে ছেঁটে ফেলতে আদেশ দেন। আবার কেউ কেউ শিষ্যের বুদ্ধির ভেদ জন্মাবার চেষ্টা না করে সংস্কারগুলো ক্ষয় করার পরিবর্ত্তে সেগুলোর যাতে পুষ্টি সাধিত হয়, সেজন্য তাদিকে প্রোৎসাহিত করেন এবং সংস্কারের উপর সংস্কার তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। সুউচ্চ মন্দির গড়ে তোলবার চেষ্টায় শিশুরা যেমন ক্রমাগত কাঠির উপর কাঠি সাজিয়ে যায় এবং অবশেষে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে যখন তাদের কাঠির কাঠামো সমূলে ধুলিসাৎ হয়ে যায়, শিষ্যের ক্রমবর্দ্ধমান সংস্কারের প্রাকার তেমনি একদিন অকস্মাৎ তার অজ্ঞাতসারে ভেঙ্গে পড়ে এবং সে সংস্কাররূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। কার্য্য বা সিদ্ধি যদিও উভয় ক্ষেত্রেই একরূপ হয় অর্থাৎ সাধক যদিও উভয় ক্ষেত্রেই সংস্কার মুক্ত হয়, তথাপি কারণ বা সাধনা সম্পূর্ণ বিপরীত পথ ধরে চলতে থাকে। কোনও সাধক সংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযান করে, আর কেউ বা সংস্কারকে পূজা দিতে সাধন পথে অগ্রসর হয়। দুটোই সাধন-সমর, কিন্তু প্রথমটাকে প্রত্যক্ষ এবং দ্বিতীয়টাকে পরোক্ষ অভিযান (direct ও indirect action) বলা চলে।

সংস্কারসমূহের পুষ্টিসাধন বা কর্ম্মবন্ধের সৃষ্টি করে যারা সাধন পথে অগ্রসর হয়, সিদ্ধি লাভের বা সংস্কার-মুক্তির পরও তাদের মধ্যে অনেকের সংস্কার বা কর্ম্মের প্রতি একটা শ্রদ্ধা থেকে যায় এবং তারা অপরকেও সেগুলোকে অবজ্ঞা না করে তাদিকে অবলম্বন করে ধর্ম্ম লাভের উপদেশ দেন। আবার জ্ঞান-খড়্গ বা বিচার-অস্ত্রের প্রয়োগে সংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যারা সাধন পথে অগ্রসর হন, অভীষ্ট লাভের পর

তাঁদের মধ্যে অনেকের হৃদয় প্রেমে প্লাবিত হয়ে যায় এবং যে সংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে তাঁরা এতদিন বৈরীভাব পোষণ করেছিলেন তাদের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁদের হৃদয় পূর্ণ হয় এবং মিত্রভাবে তাঁরা তাদিকে আলিঙ্গন দান করেন। গোসাঁইজীর এই অবস্থা হয়েছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞান-পথের পথিক হয়ে তিনি হিন্দুধর্ম্মের ধর্ম্মাঙ্গ এবং সংস্কার-সমূহের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করেছিলেন; কিন্তু দিব্যজ্ঞান লাভের পর যখন প্রেম তাঁর হৃদয়ে উপচিত হয়ে উঠল, তখন আবার ধর্ম্মের বহিরঙ্গ এবং সংস্কারসমূহের প্রতি একটা অনুরাগ তাঁর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল এবং সেগুলোর প্রতি বিরাগ পোষণ না করে তাদের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি তাঁর আশ্রিতগণকে উপদেশ দিতে লাগলেন। তাঁর হৃদয়ে তখন প্রেমের বান ডেকেছিল, জ্ঞান তখন তাঁর মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছিল। তাই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি'। সাধন-সমরে অবতীর্ণ হয়ে তিনি যে সমস্ত সংস্কারের সংহার সাধন করেছিলেন, তাঁর প্রেম-সঞ্জীবনীধারার স্পর্শে সেগুলো আবার বেঁচে উঠেছিল, আর তিনি সাদরে তা'দিকে আলিঙ্গন দান করেছিলেন। কলিঙ্গ জয়ের পর মহারাজ অশোক রণক্ষেত্রের বীভৎস দৃশ্য দর্শন করে যেমন যুদ্ধ বিগ্রহের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন এবং জীবের হৃদয় জয় করবার জন্য হিংসার পরিবর্ত্তে প্রেমকে একান্তভাবে আশ্রয় করবার সঙ্কল্প করেছিলেন, তেমনি সংস্কারসমূহের উচ্ছেদের জন্য সাধকের সংগ্রাম জয়যুক্ত হওয়ার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিংসার পরিবর্ত্তে প্রেমে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়।

জ্ঞান বিচার কোন কোন সাধকের মুখ্য অবলম্বন হ'লেও কর্ম্ম-সংস্কার অল্পাধিক পরিমাণে তাদের মধ্যে থেকে যায়। তেমনি মূলতঃ কর্ম্ম-সংস্কারই যে সব সাধকের পাথেয় তাদের মধ্যে জ্ঞান বিচারের একটা ধারা—তা সেটা যত ক্ষীণই হউক না কেন—প্রবাহিত থাকে। তারপর সাধন পথে অগ্রসর

হতে হতে এমন একটা সন্ধিস্থলে এসে সাধক উপস্থিত হয়, যেখানে প্রেমভক্তির প্রবল জলোচ্ছাস জ্ঞান ও কর্ম্মের উভয় কূল প্লাবিত করে দেয়। এই ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করে সাধক কৃতকৃতার্থ হয় এবং তাঁর সিদ্ধি পূর্ণতা লাভ করে।

আজ এই পর্য্যন্ত। উপদেশ শুধু শুনে বা পড়ে গেলে কিছু হ'ল না। অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিজের উপলব্ধির সঙ্গে এগুলো মিলিয়ে নিতে হয়। তোমাদের কুশল কামনা করি।

(মধ্য-প্রদেশের জনৈকা শিষ্যাকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্‌

কলিকাতা
২২।৩।৫৭

বাসুদেবেষু—

সাধন ভজনের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় একথা মোটেই ঠিক নয়। কোন প্রকার সাধনই তাঁকে পাওয়ার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। ভগবানের কৃপার দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায়, আর কিছুতেই কিছু হয় না। তাই যদি হয়, তবে সাধন ভজনের সার্থকতা কি? এই প্রশ্ন স্বতঃই মনের মধ্যে উদিত হতে পারে। সাধন ভজনের দ্বারা যে কিছু হয় না বা হতে পারে না—এইটা উপলব্ধি করার জন্যই সাধন ভজন। অনেক মুমুক্ষু সাধকের মনে এই প্রকার একটা ধারণা থাকে যে তাদের সাধনা এবং অধ্যবসায়ের ফলে সিদ্ধি করতলগত হতে বাধ্য। কিন্তু এই ভ্রান্ত ধারণায়

যত শীঘ্র নিরসন হয়, ততই তাদের পক্ষে মঙ্গল। এই তত্ত্বটা বিশদ করবার জন্য এইখানে একটি আখ্যায়িকার অবতারণা করছি। শিশু বয়সে শ্রীকৃষ্ণ খুব চঞ্চল ছিলেন। তাঁর উৎপাতে বাড়ীশুদ্ধ লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। অবশেষে এই উপদ্রব বাড়ীর সীমানা ছাড়িয়ে বাইরেও বিস্তার লাভ করেছিল। প্রতিবেশীরাও তাঁর উৎপাতে অস্থির হয়ে উঠেছিল। ক্রমশঃ অবস্থা এমন গুরুতর আকার ধারণা করেছিল যে, তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে মা যশোদার কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করতে বাধ্য হ'ল। ছেলের দৌরাত্ম্যে মা যশোদা নিজে হয়রাণ হয়ে উঠেছিলেন। এখন সে পাড়াশুদ্ধ লোককে উত্যক্ত করে তুলেছে জেনে তাঁকে বেঁধে রাখার সঙ্কল্প করলেন এবং একগাছা গরুর দড়ি নিয়ে তাঁর কোমরে বাঁধতে গিয়ে দেখলেন সামান্য দড়ি কম পড়ছে। তখন আরও দড়ি জোড়া দিয়ে দেখেন আগে যতটুকু দড়ি কম পড়েছিল, এবারেও ঠিক ততখানি দড়িই কম হয়েছে। আবার দড়ি যোগ করা হল, কিন্তু কোন লাভই হ'ল না। এবারেও সেই একটুখানি দড়ি কম হ'ল। পুনঃ পুনঃ দড়ি যোগান দেওয়া সত্ত্বেও সেই যে অল্প পরিমাণ দড়ি কম পড়তে দেখে যশোদার বুদ্ধি লোপ পাবার উপক্রম হ'ল। তাঁকে গলদঘর্ম্ম হতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে কৃপাপরবশ হয়ে স্বেচ্ছায় তাঁর কাছে বাঁধা পড়লেন।

অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির গল্পগুলি এক একটি তত্ত্ব পরিস্ফুট করবার জন্য রচিত হয়েছে। উপরোক্ত আখ্যায়িকায় এই তত্ত্বটাই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে যে সাধকের আত্মপ্রচেষ্টা-রূপ সাধনা, তা সেটা যত কঠোর বা তীব্র হউক না কেন, ভগবানকে বাঁধার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। শুধু তাঁর কৃপার দ্বারাই তাঁকে বাঁধা বা লাভ করা যায়। সাধন ভজন তাঁর কৃপা লাভ করার একটা হেতু বা উপায়, একথা বলাও মোটেই ঠিক হবে না। তাঁর কৃপা অহৈতুকী অর্থাৎ কোন

প্রকার হেতু বা কারণের অপেক্ষা না করেই তাঁর কৃপা জীবের উপর বর্ষিত হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রকারেরা এ কথা বার বার বলে গেছেন।

সাধনার দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় না বা তাঁর কৃপা অহৈতুকী, এর অর্থ এই নয় যে, সমস্ত প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুতে হবে। গোসাঁইজী বলতেন, সাধন ভজনের উদ্দেশ্য শুধু জেগে থাকা যেন ভগবানের কৃপা এলে সাধক তা ধরতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ কৃপা আমাদের উপর অবিরাম ধারায় বর্ষিত হচ্ছে। সূর্য্য যেমন পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে সকলকে সমানভাবে কিরণ প্রদান করেন, ভগবানের করুণাও তেমনি সকলের উপর সমানভাবে ঝরে পড়ছে। সাধন নিয়ে যারা থাকেন, তা'দিকে তিনি কৃপা করেন, আর সিদ্ধিলাভের জন্য যাদের কোন প্রকার অধ্যবসায়ই নাই তারা তাঁর কৃপার পাত্র নয়, এ কথা অর্থহীন। তবু একটা বিশেষত্ব এই যে, তাঁর সেবা পূজায় বা নামে বা ধ্যান ধারণায় যারা সজাগ থাকে, তারা তাঁর কৃপা এলে সেটা জানতে বা ধরতে পারে এবং তার সদ্ব্যবহার করে ধন্য হয়। কিন্তু যারা সাধনহীন তাদের উপর দিয়ে ভগবানের কৃপা প্রবাহিত হয়ে গেলেও তারা তা টের পায় না। কৃপা লাভ হলেও তার কাছে কৃপা অপ্রাপ্ত থেকে যায়।

অতএব সিদ্ধি বা কর্ম্মফল লাভের আশা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ না করে কর্ত্তব্যবোধে নিষ্কামভাবে আমাদিকে সাধনা বা কর্ম্ম করে যেতে হবে, এই হচ্ছে গীতার উপদেশ। গীতার উপদেশের প্রতিধ্বনি করে আমিও তোমাদিকে বলি, কর্ম্মেই তোমাদের অধিকার, কর্ম্মফলে নয়। সদ্‌গুরু প্রদর্শিত পথে ক্রমাগত হেঁটে যেতে হবে। হয়ত পথের কাঁটা পদদ্বয়কে ক্ষতবিক্ষত করে তুলবে, হয়ত পথ চলতে নিত্য নূতন বাধার সম্মুখীন হতে হবে, হয়ত যাত্রাপথ বহুস্থানে বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠবে, হয়ত কোন কালেই পথের শেষ দৃষ্টির সীমানায় মধ্যে আসবে না, তবু বিশ্রাম

করা বা পশ্চাৎপদ হওয়ার কল্পনাও করা চলবে না; পথের শেষ দৃষ্টিগোচর হয় কিনা দেখবার জন্য অধীর আগ্রহে বারংবার নিষ্ফল দৃষ্টিপাত করে একাগ্রতা নষ্ট করা চলবে না। ভগবানের নির্দ্দেশ মনে করে কর্ত্তব্য বোধে ক্রমাগত হেঁটে যেতে হবে। চলার নেশা, চলার আনন্দেই বিভোর হয়ে থাকতে হবে। পথের শেষে যিনি আছেন, যাঁর উদ্দেশে তোমার পথ চলা সুরু হয়েছে, পথের মাঝখানেই তোমার সাথী হয়ে তোমার হাত ধরে তিনি তোমায় গন্তব্য পথে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁকে দেখতে না পেলেও এটা তুমি স্পষ্ট অনুভব করবে। তোমার চলার কষ্ট তোমার গ্রাহ্যের মধ্যেই আসবে না। পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা তখন তোমায় সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবে না। পথের কাঁটা তখন পুষ্পশয্যায় পরিণত হবে। একটা মহাভাবে তোমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠবে, কোন প্রকার ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ ভাবনা, কোন প্রকার লাভের সঙ্কীর্ণ আকাঙ্ক্ষা তোমার হৃদয় স্পর্শ করতে পারবে না। একটা আকুল আবেগ নিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয় যে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী, তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমুদ্র এগিয়ে আসে; আর যাকে লাভ করার জন্য নদীর অভিসার সুরু হয়েছিল, তার অজ্ঞাতসারে হলেও সে সেই সাগরের হাত ধরে নেচে নেচে অগ্রসর হয়।

আমার শরীর এখন কিছু সুস্থ বলে মনে হচ্ছে। কোরিয়ার যুদ্ধের মত আমার দেহে যেন স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্যের ঠেলাঠেলি চলছে। কখনও স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্যকে অভিভূত করে ফেলছে, আবার কখনও অস্বাস্থ্য শক্তি সঞ্চার করে স্বাস্থ্যকে হ'টে যেতে বাধ্য করছে। কিন্তু আমার দেহ স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্যের লীলাভূমি হ'লেও ঠাকুর আমাকে জয়-পরাজয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। আমার দেহটা আমার নয়, একটা থাকার খাঁচা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

আশা করি কুশলে আছ।

(ফরিদপুরের জনৈক পুরোহিত শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্   সদ্‌গুরু নিবাস

ভুবনেশ্বর

১০।৫।৫০

বাসুদেবেষু—

একখানা ছবি কল্পনার চোখে ফুটিয়ে তুলতে পার? গঙ্গার জল একটা স্থানে জমাট হয়ে বরফের পুতুলের আকার ধারণ করেছে। এই পুতুল গঙ্গার অর্চ্চনা করছে। তার পূজার উপকরণ শুধু গঙ্গাজল। অর্থাৎ বরফের পুতুল, যা গঙ্গাজলেরই বিকার, গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে গঙ্গাজল দিয়ে গঙ্গাপূজা করছে। এই পুতুলের গঙ্গাপূজার মত আমরাও প্রতিনিয়ত ব্রহ্মপূজা করছি। আমরা যা কিছু করি আমাদের নিজেদের আনন্দ বা তৃপ্তির জন্য। আত্মতর্পণ, আত্মসেবা বা আত্মপূজাই আমাদের সকল কর্ম্মে প্রেরণা প্রদান করে, আমাদের সমস্ত কাজ আমাদিকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়। জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক আমরা নিজেদের আত্মার পরিতৃপ্তির জন্যই স্ত্রী-পুত্রাদিকে ভালবাসি, দেশ-সেবায় উদ্বুদ্ধ হই; কখনও ধর্ম্মপথে বিচরণ করি, আবার কখনও অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করি। কখনও প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, দয়া প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তিসমূহ আমাদের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে যত্নবান হই, আবার কখনও অধর্ম্ম, কাম, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতিকে প্রশ্রয় প্রদান করি। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই ব্রহ্ম-সমুদ্রের অংশ। তিনি সিন্ধু আমরা বিন্দু, তিনি অগ্নি আমরা স্ফুলিঙ্গ, তিনি শিব আমরা জীব। পূর্ণ এবং তার অংশের মধ্যে যেমন স্বরূপগত কোন পার্থক্য নাই, তেমনি পরমাত্মা আর তাঁর অংশ আমাদের জীবাত্মা

স্বরূপতঃ এক। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকেই ব্রহ্মের এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। অতএব দাঁড়ায় এই যে, আত্মতৃপ্তি আত্ম-সেবা বা আত্মপূজার জন্যই যখন আমাদের সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, তখন আমরা আমাদের যাবতীয় কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মেরই তর্পণ, সেবা বা পূজা করি। কিন্তু এই সব কর্ম্মও ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নয়। 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।' বিশ্বের সব কিছুই ব্রহ্ম। অতএব 'কায়েন মনসা বাচা' আমরা যে সকল কর্ম্ম করি সে গুলিও ব্রহ্ম। ব্রহ্মপূজার উপকরণসমূহ যেমন ব্রহ্ম (ব্রহ্মার্পণং হবির্ব্রহ্ম) তেমনি আমাদের আত্মপূজার অর্থাৎ আমাদেব অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্মও ব্রহ্ম। যজ্ঞেশ্বর নিজেই নিজের উদ্দেশ্যে নিজেকে আহুতি প্রদান করেন, ভগবান নিজেই নিজেকে নিজের দ্বারা অর্চ্চনা করেন। তিনিই পূজারী তিনিই ভোক্তা—আবার ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প, চন্দন প্রভৃতিও সবই তিনি। তা ছাড়া তাঁকে অবলম্বন করে তাঁরই কোলে বসে পূজারী পূজা করেন। তিনি ছাড়া আর কেউ যে কারও আশ্রয় নাই! বরফের পুতুলের গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে গঙ্গাজল দিয়ে গঙ্গাপূজার চিত্রটী যদি হৃদয়ে জাগরূক রাখতে পার তবে ব্রহ্মই ব্রহ্মের কোলে বসে ব্রহ্মোপবাসের সাহায্যে ব্রহ্মপূজা করছেন, এ চিত্রটি মনের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা ক্রমশঃ সহজসাধ্য হয়ে আসবে।

আমরা যে বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান করে থাকি তার উদ্দেশ্য কী? প্রতিমা নির্ম্মাণ করে, বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে, ভূরি ভোজনের আয়োজন করে, আমরা যে উৎসবে মেতে যাই, তার সার্থকতা কী? প্রণালীমত পূজা করতে করতে পূজারী এমন একটা অবস্থা লাভ করেন, যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠার ফলে প্রতিমা ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হন এবং পূজার উপকরণ প্রভৃতিতে এবং আপনাতেও ব্রহ্ম দর্শন করে ধন্য হন। শুধু তাই নয়, তাঁর এই দিব্যদৃষ্টির গণ্ডী ক্রমশঃ পরিধি বিস্তার করে সমস্ত বিশ্ব ছেয়ে ফেলে, আর সে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করে, যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি পড়ে তাঁহা

কুঞ্চ স্ফুরে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উদ্দেশ্য সফল হতে দেখা যায় না। কারণ বাহ্য বিষয়গুলোতেই পূজারীর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে বলে অন্তর্লক্ষ্যে পৌঁছান তার পক্ষে দুরূহ হয়ে ওঠে। যাঁর উদ্দেশ্যে পূজা প্রদান করা হয়, পূজারী নিজে, পূজার উপকরণ সমূহ এবং পূজা সম্পর্কিত সব কিছুই যে ব্রহ্ম, এই সত্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে পারলে তবেই পূজার দ্বারা আশুফল পাওয়া যায়, নতুবা পূজা পূজামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

খড় মাটী বা রং প্রভৃতির সাহায্যে আমরা পূজার জন্য যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করি তা যে জড় নয়, চিন্ময়ী প্রতিমা, পূজার আগে এই বিশ্বাসটা খুব দৃঢ়ভাবে মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হয়। এরই নাম বোধন। এই সত্য-বোধের দ্বারা নিজে উদ্বুদ্ধ হয়ে, প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে, তারপর পূজা করতে হয়। তবেই প্রতিমাপূজার দ্বারা পূজারীর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। প্রতিমায় সত্য-বোধ বা ব্রহ্মবোধ জাগ্রত হ'লে ক্রমশঃ সবই ব্রহ্মময় হয়ে যায়, আর সাগরের উর্ম্মিমালার মত সব কিছুই ব্রহ্ম-সমুদ্রে ভাসমান মনে হয়। ব্রহ্মময়ী মায়ের কোলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বিষয়বস্তুই নর্ত্তনশীল মনে হয়, তারাও ব্রহ্মজ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে ওঠে, ব্রহ্ম আর তাদের মধ্যে পৃথক সত্ত্বা অনুভবের মধ্যে আসে না।

পূজাদির দিকে তোমার একটা বেশ ঝোঁক আছে, এটা খুব সুখের বিষয়। কিন্তু গতানুগতিক ভাবে পূজা না করে পূজায় যাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পার, পূজার মধ্যে একটা নূতন আলোক সম্পাত করতে পার, এ বিষয়ে চেষ্টিত হ'লে তবেই তোমার পূজা সার্থক হবে। নতুবা সাধারণ পূজকদের মত মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি বাইরের কেতাদুরস্ত আদব কায়দা গুলোই যদি তোমার আকর্ষণের বস্তু হয়, তবে কস্মিন্‌কালেও পূজার দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না। সাধারণতঃ আমরা কী দেখতে পাই? পূজারী আজীবন পূজা করে মরে, কিন্তু না হয় তার নৈতিক উন্নতি,

না হয় চরিত্র গঠন, না হয় ধর্ম্মলাভ। এভাবে পূজা করে দলে ভিড়ে গেলে চলবে না। পূজার একটা নূতন মর্য্যাদা যদি প্রতিষ্ঠা করতে পার, তোমার পূজা যদি অন্ধভাবে অনুষ্ঠিত না হয়, তোমার প্রতিমা বা পটের মধ্যে যদি চৈতন্যের অধ্যাস হয়, তোমার পূজায় তোমার ইষ্ট দেবতা যদি সঞ্জীবিত হয়ে ওঠেন, এ সব যদি সম্ভবপর হয়, তবে তোমার পূজার দ্বারা শুধু তুমি নিজেই লাভবান হবে না, পূজার একটা আদর্শ স্থাপন করতে পারবে, গতানুগতিকতা পরিত্যাগ করে অন্যে তোমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করতে পারবে, পূজার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আর তা যদি না পার, তবে ছেলেদের মত পুতুল খেলায় লাভ কি?

আজ এই পর্য্যন্ত। বলবার বা লিখবার অনেক কিছুই ত আছে? কিন্তু কে বা সব শোনে, লেখেই বা কে? শারীরিক অসুস্থতার জন্য এ বিষয়ে কতকটা ত্রুটি আমার দিক হতেও হয়ত হচ্ছে। কিন্তু এটাকে আমি মোটেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনতাম না, যদি জানা বা শেখার প্রকৃত আগ্রহ কারও মধ্যে দেখতাম। আশা করি কুশলে আছ।

(মথুরাবাসী জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ গলসী (বর্দ্ধমান)

২৬।২।৫০

বাসুদেবেষু—

ব্রহ্মের নির্গুণ বিভাব বা তূরীয় অবস্থা সম্বন্ধে কোন কিছুই বলা বা চিন্তা করা যায় না। এই নির্গুণ ব্রহ্ম যখন মায়া উপাধি অঙ্গীকার করে সগুণ হন, তখন তাঁর এই সগুণ বিভাবই আমাদের ধারণা বা চিন্তার বিষয় হতে পারে। এই সগুণ ভাবের আবার তিনটি অবস্থা। জাগ্রত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি। এমন একদিন ছিল যখন স্থূল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বমাত্র ছিল না। সমগ্র বিশ্বকে আপনার মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে ভগবান যেন গভীর নিদ্রামগ্ন ছিলেন, অর্থাৎ পুরাণের ভাষায়, প্রলয় পয়োধিতে তিনি ভাসমান ছিলেন বলে একে কারণ-সমুদ্রও বলা যায়। তারপর প্রলয় রজনীর যখন শেষ হয়ে আসছিল, তখন তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন—'একোঽহং বহুস্যাম'—আমি একা আছি, আমাকে বহু হতে হবে। এইটাই তাঁর স্বপ্নাবস্থা। তারপর এই স্বপ্নকে রূপ দেওয়ার জন্য তিনি জেগে উঠলেন। এইটাই তাঁর জাগ্রত অবস্থা। জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর স্বপ্ন বা ইচ্ছাকে ব্যক্ত করার জন্য 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণ করলেন আর এই ওঁকার বা প্রণব থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হ'ল। এই ওঁকারের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সঙ্কল্পকে বা নিজেকে অভিব্যক্ত করলেন বলে এই ওঁকার বা প্রণবই ব্রহ্ম। অব্ ধাতু, উষ্ ধাতু আর মন্ ধাতুর আদ্য অক্ষর অর্থাৎ অ, উ, ম এই তিনটি বর্ণের সংযোগে ওঁকারের উৎপত্তি হয়েছে। অব বা অব্যতে বা জগৎ যাঁর দ্বারা রক্ষিত হয় অর্থাৎ সত্ত্বগুণী

বিষ্ণু, উষ্ বা উষ্যতে বা জগৎ যাঁর দ্বারা সংহার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তমোগুণী শিব, আর মন্ বা মন্যতে বা যাঁর ইচ্ছামাত্র জগৎ সৃষ্ট হয় অর্থাৎ রজোগুণী ব্রহ্মা—প্রণব এই তিনের সমষ্টি। অতএব ওঁকারের অর্থ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কারণ পরমাত্মা। ভগবানের একটা নাম যেমন 'ওঁ' তেমনি তাঁর আর একটি ছদ্মনাম 'তজ্জলান্'। 'তজ্জলান্' এর অর্থ তজ্জ, তল্ল, তদন—অর্থাৎ তাঁর থেকেই বিশ্ব উদ্ভূত হয়ে তাঁকে আশ্রয় করেই অবস্থিতি করছে আর তাঁরই মধ্যে লয় প্রাপ্ত হবে। কিন্তু এসব বলতে হলে অনেক কথার অবতারণা করতে হয়। এখন শুধু কাজের কথাই বলি।

প্রণবকে আশ্রয় করে যেমন জীব জগৎ বা বিশ্বের সব কিছু নেমে এসেছে, তেমনি এই প্রণবকে আশ্রয় করে বা ওঁকারকে ধরে সকলকে উঠতে হবে—ব্রহ্মের সঙ্গে বিলীন হতে, ব্রহ্মকে লাভ করতে হবে। অর্থাৎ বারংবার প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ বা জপ অর্থাৎ শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা তদ্ভাবাপন্ন বা তদাকার প্রাপ্ত হতে হবে। প্রণব, ভগবান এবং ভগবানের নাম—উভয়েরই জ্ঞাপক। অতএব মোটের উপর দাঁড়ায় এই যে, ভগবানের নামের দ্বারা ভগবানকে পেতে হবে। ওঁকার ছাড়া যেমন ব্রহ্মের আর একটা নাম তজ্জলান্, তেমনি ব্রহ্মবাচক আরও অনেক নাম আছে এবং এগুলিকে আশ্রয় করেও ব্রহ্মলাভ হতে পারে। তবে এই সকল নাম সাধন কেমন করে করতে হয়—অর্থাৎ নাম জপের প্রণালী, সদ্গুরুর কাছ থেকে জেনে নিতে হয়। তা না হলে নাম-সাধনে বড় একটা ফল পাওয়া যায় না।

জিনিষটা বেশ ভাল করে উপলব্ধি করার জন্য একখানা ছবি মনের মধ্যে ফুটিয়ে তোল। ভগবান যেন এক গাছা দড়ি ঝুলিয়ে দিয়েছেন, আর তার মধ্য হতে উদ্ভূত হয়ে নিখিল বিশ্ব যেন এই দড়ি ধরে নেমে

এসেছে। এই দড়ির অগ্রভাগ থেকে আরও কতকগুলো দড়ি নির্গত হয়ে চতুর্দ্দিকে সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্র্যও এই সকল দড়ি ধরে অনন্ত বিশ্বে যাতে ছড়িয়ে পড়তে পারে সেইজন্য যে মূল রজ্জুটা ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত এইটাই হচ্ছে প্রণব, আর এর থেকে যে সমস্ত শাখা-রজ্জু নির্গত হয়েছে, ঐগুলো ভগবানের আরও অসংখ্য নাম, যেগুলো অবলম্বন করে প্রণবেই পৌঁছান যায়। কিন্তু এর মধ্যে যে রহস্য নিহিত আছে তা আর একদিন বোঝাবার চেষ্টা করব।

এই যে ছবি কল্পনা করতে বললাম, এর অনুরূপ ছবি পুরাণকারও অঙ্কিত করেছেন এবং এই পৌরাণিক ছবি অবলম্বন করে আমরাও পট প্রস্তুত করেছি—যদিও জনসাধারণের যাতে বোধগম্য হতে পারে, সেজন্য উল্টোভাবে এই পট অঙ্কিত হয়েছে। আমি ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের কথা বলছি। নারায়ণের নাভি হতে পদ্মের মৃণাল নির্গত হয়েছে আর এই মৃণালের অগ্রভাগে অনন্তদল পদ্মের মধ্যে ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত আছেন—অর্থাৎ সৃষ্টি কার্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পদ্মের মৃণালকে যদি রজ্জু মনে করা যায় এবং রজ্জু হতে বিস্তৃত অসংখ্য শাখা-রজ্জুকে যদি মৃণালের অগ্রভাগ হতে নির্গত পদ্মের অসংখ্য দল বলে ধরা যায়, তা হলে আমি যে ছবি কল্পনা করতে বলছি তার সঙ্গে পুরাণোক্ত এই ছবির সর্ব্বাংশে সামঞ্জস্য লক্ষিত হবে। কিন্তু অপটু পটুয়ার আঁকা পটের মত ছবিখানাকে উল্টোভাবে কল্পনা করলে চলবে না। গীতার সেই 'ঊর্দ্ধমূলমধঃ-শাখম্" শ্লোকাংশের ভাবানুযায়ী বিশ্বমূল ভগবানকে উর্দ্ধে স্থাপন করতে হবে—শাখা প্রশাখা প্রভৃতি অর্থাৎ বিশ্ব প্রকৃতি থাকবে নিম্নের দিকে।

পুরাণে আছে, ব্রহ্মা পদ্মের মৃণাল ধরে তার মধ্য দিয়ে মূলে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ ভগবানকে পাবার জন্য বহুকাল ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়ায় পুনরায় তিনি স্বস্থানে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন তিনি দৈববাণী শুনলেন 'তপ', 'তপ'—অর্থাৎ তপস্যা কর। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

গোস্বামীজিউ বলেছেন—এই দৈববাণী শুনে ব্রহ্মা যে সাধনা করেছিলেন, সেই সাধনাই গোসাঁইজী লাভ করেছিলেন এবং সেইটাই তাঁর শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে চলে আসছে। অতএব আমাদের এই সাধন সনাতন বস্তু। সৃষ্টির আদিকাল থেকে এ সাধন প্রবাহ বর্ত্তমান যুগে এসে পৌঁচেছে। এই সাধনের মধ্যে যে মাধুর্য্য আছে, তা যতই সাধন পথে অগ্রসর হবে ততই প্রকাশিত হবে। এই অমূল্য বস্তু লাভ করেও যদি এর অমর্য্যাদা কর, জাগতিক ক্ষুদ্র সুখে মত্ত হয়ে এই পরম ধনকে যদি উপেক্ষা করে চল, তবে তোমাদের পক্ষে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

আমার শরীর এখন মন্দের ভাল। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

(শ্রীবৃন্দাবনে সাধনরত জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

ভুবনেশ্বর
২০।৫।৫৫

বাসুদেবেষু—

শ্রীরাধা শ্যাম-অভিসারে চলেছেন। বনপথে সখীদের সঙ্গে দেখা। সখীরা তাঁকে দেখে বিস্মিত হল, যদিও একাকিনী বনপথে শ্রীরাধিকাকে যেতে দেখা তাদের কাছে মোটেই নূতন নয়। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মধ্যে বিচ্ছেদের পালা চলছিল, তাই সখীদের এই বিস্ময়। সখীরা জিজ্ঞাসা করল—"এমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে কোথায় চলেছিস সই?" আনন্দোৎফুল্ল

হয়ে শ্রীরাধা উত্তর দিলেন—"দেখ, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। শ্রীকৃষ্ণ আজ আমাকে স্মরণ করেছেন। এতদিন বিরহের পর আজ তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হবে বলে তাঁর কাছে চলেছি।" আনন্দে অধীর হয়ে সখীরা বললে—"শুধু তোর নয় সই, আজ আমাদেরও বড় আনন্দের দিন। তুই যা—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তোর যখন মিলন হবে, তখন আমরাও এই বনে উৎসবে মেতে যাব। কিন্তু আয়, আগে তোকে সাজিয়ে দি। এতদিন পর তাঁর কাছে যাবি, সালঙ্কারা হয়ে সুবেশে যেতে হয়। কিন্তু তোর রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ, গয়না ত নাই! আয় পুষ্পপত্র দিয়েই যতদূর পারি তোকে সাজিয়ে দি। একটু সেজে গুজে না গেলে তাঁর ভালবাসা কেমন করে পাবি সই? শ্রীরাধার মুখে রক্তিম আভা দেখা দিল, চোখ দুটি ছল্ ছল্ করে উঠল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন,—"ওগো, তাঁকে তোমরা ভুল বুঝো না। তাঁর ভালবাসার পাত্রী হতে হলে গহনার প্রয়োজন হয় না। কোন প্রকার অলঙ্কারই তাঁকে ভোলাবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। তাঁকে যারা চায়, তাঁর জন্য তাদের ভালবাসা কতখানি, তাই শুধু তিনি লক্ষ্য করেন, আর তাই দেখে কার কতখানি ভালবাসা পাবার যোগ্যতা তার বিচার করেন। গহনা আছে কিনা, সে সব তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন না।" এই বলেই শ্রীরাধা ত্বরিত পদে গন্তব্য পথে অগ্রসর হলেন।

শ্রীরাধা ঠিকই বলেছিলেন। ভগবান বাইরের কোন লক্ষণ, আভরণ বা অলঙ্কার দেখে কাউকে ভালবাসেন না। এ সব জিনিষ গণনার মধ্যে না এনে তিনি শুধু লক্ষ্য করেন তাঁর অনুরক্তগণের প্রেম তাঁর প্রতি কতখানি এবং তাই দেখে তিনি তাঁর বিচারের সৌধ গড়ে তোলেন। তাই আমরা দেখতে পাই, শ্রীরাধাকে তিনি রুক্মিণী সত্যভামার চেয়েও বেশী ভালবাসতেন, যদিও এঁরা ছিলেন রাজকন্যা এবং এঁদের বেশভূষা, রত্নালঙ্কার প্রভৃতি কিছুরই অপ্রতুল ছিল না।

গোপীরা যে ভুল করেছিল, সেই ভুল অনেক মুমুক্ষু সাধকই করে থাকেন। তাঁরা অলঙ্কারের দ্বারা ভগবানকে ভোলাবার কল্পনা করেন। শুধু বেশভূষা মালা তিলক প্রভৃতি নয়, কঠোর সাধনার দ্বারা নানা বিভূতি ও যোগৈশ্বর্য্য অর্জ্জন করে তাঁরা ভগবানের কাছে যেতে চান, তাঁর ভালবাসা, তাঁর কৃপা লাভ করবার জন্য। কিন্তু এ সব বহির্বস্তুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে তিনি শুধু দেখেন, সেখানে তাঁর প্রতি তাদের কতখানি দরদ, কতখানি প্রেম ভালবাসা নিহিত আছে। আর তাই দেখে যে সব সাধক নানাবিধ বিভূতি ঐশ্বর্য্য লাভ করেছে, তাদিকে হয়ত তাঁর কৃপা হতে বঞ্চিত করেন, আর যারা শুধু ভক্তিমাত্র সার করে পড়ে আছে, তাদিকে তাঁর প্রেম দান করে কৃতার্থ করেন। বেশভূষা বা অলঙ্কারাদির মোহ তাদেরই বেশী যাদের অন্তরের সৌন্দর্য্য নাই বা থাকলেও তা ধর্ত্তব্য নয়। যেখানেই বেশভূষার পারিপাট্য বা অলঙ্কারের জলুস্, সেখানেই ভিতরে গলদ থাকার সম্ভাবনা বেশী ; ডাক্তারেরা যে dress করে, তার মধ্যে যেমন থাকে পচা ঘা। কোন জিনিসের সম্বন্ধে সঠিক বিচার করতে হলে সেটাকে উলঙ্গ ক'রে—in its nakedness—দেখতে হবে। ভগবান ঠিক এই ভাবেই বিচার করে থাকেন। গোপীরা কাত্যায়নী ব্রত করেছিল। তার ফল প্রদানের জন্য তিনি এই প্রকার বিচারই করেছিলেন। তাদের আভরণ উন্মোচন করে, তাদের বস্ত্র হরণ করে তিনি তাদের পরীক্ষা করেছিলেন। এর নির্গলিত অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি তাদের বাহ্য বিষয়বস্তুগুলোকে মোটেই আমল না দিয়ে তাদের অন্তর লক্ষ্য করেছিলেন।

যোগ-বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্য, এ সব গহনা ছাড়া কিছুই নয়। এই সব অবলম্বনে যাঁরা ভগবানের কাছে যেতে চান, তাঁদের মধ্যে একটা অভিমান থাকে, আর এই অভিমান ভগবানের কৃপালাভের বিশেষ অন্তরায়। ভক্তিপ্লুত চিত্ত নিয়ে তাঁর কাছে যেতে হবে। আর কিছুরই আবশ্যক নাই। এ কথা

উপলব্ধি না করে অনেকেই ঐশ্বর্য বিভূতি প্রভৃতি নিম্নস্তরের জিনিসগুলির প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়, আর যে ভক্তি বা প্রেম তাঁকে লাভ করার জন্য প্রধান অবলম্বনীয় তার প্রতি আদৌ আস্থাসম্পন্ন হয় না। ভগবান ভক্তিলভ্য। তিনি ভাবগম্য। আর কিছুই তাঁর ভালবাসা পাবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। ঐশ্বর্য্যের দ্বারা তাঁর ঐশ্বর্য্যই লাভ হয়। তাঁর মাধুর্য্য, প্রেম বা ভালবাসা এর দ্বারা লাভ করা যায় না। শ্রদ্ধা ভক্তির দ্বারা তাঁর কাছে যেতে হবে। অপরাপর সাধনের আবশ্যকতা কি ?

যোগৈশ্বর্য্যের প্রতি তোমাদের যেন মোহ মোটেই না থাকে। ভগবানের কাছে যাওয়ার পথে এগুলো আপনি আসে। এর জন্য আবার সাধনা কেন ? এ সব লাভ করবার জন্য কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা ত করাই ঠিক নয়, অযাচিতভাবে এলেও এগুলোকে বর্জ্জন করেই ভক্তিপথের পথিক হতে হয়। ভগবান তাঁর প্রেমপ্রার্থীদিকে অধিকাংশ সময়েই কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে ফেলেন। তাঁর মাধুর্য্য-রসের আস্বাদন করবার জন্য কোন ভক্তকে তাঁর কাছে আসতে দেখলে, তিনি তার পথের সম্মুখে নানাবিধ ঐশ্বর্য্য ছড়িয়ে রাখেন। এই সব ঐশ্বর্যে যারা মুগ্ধ হয় এবং এই সব সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তারা তাদের অভীষ্ট বস্তু ভুলে যায় এবং এই ঐশ্বর্য্যই তখন তাদের কাছে প্রলোভনের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। যারা এসব তুচ্ছ করে গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়, তারাই তাঁর কোলে উঠে মাধুর্য্য-রসের আস্বাদন করে ধন্য হয়। ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক মুখরোচক কথা বললেও, সে সব গ্রাহ্য করো না। খুব সাবধান।

আশা করি কুশলে আছ।

(কাশীবাসী জনৈক বিরাগী শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

দার্জিলিঙ

২২।৫।৫৫

বাসুদেবেষু—

একটা গল্প বলি শোন। তোমার প্রশ্নের উত্তর এই গল্পের মধ্যেই পাবে।

ঋষিদের একটা Conference (সম্মেলন) বসে গেল। তাঁরা শুনেছেন পাঁচ বছরের ছেলে ধ্রুব নাকি ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেছে। তিনি প্রায়ই তাঁর কাছে সশরীরে আবির্ভূত হন, তার সঙ্গে কথা কন, খেলা করেন, কৌতুক করেন, তাকে সঙ্গে নিয়ে নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান, আরও কত কি। এই সব শুনে তাঁরা বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তাঁরা কতকাল ধরে তপস্যা করছেন তার ঠিকানা নেই, দেহ অস্থিচর্ম্মসার হয়ে গেছে, মাথায় জটা বেঁধে সেগুলো পেকে উঠেছে, দেহে উই-ঢিপি জন্মে গেছে, তবু তাঁরা তাঁকে সশরীরে সম্ভোগ করার অধিকার লাভ করেন নি। আর ঐ পাঁচ বছরের শিশু, ঐটুকু ছেলে, তপস্যা করার সময়ই বা পেলে কোথায়, আর তার পক্ষে কী তপস্যাই বা সম্ভব যে এরই মধ্যে ভগবানের সমস্ত করুণা তার উপর ঝরে পড়ল! তাঁরা সকলে ধ্রুবের নিকট গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে রহস্য ভেদ করবেন সাব্যস্ত করলেন। যথাকালে তাঁরা সকলে ধ্রুবের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করলেন। ধ্রুব তাঁদের নিকট প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে না পেরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। ঋষিরা তখন বললেন—"ভগবানের সঙ্গে এবার যখন তোমার সাক্ষাৎ হবে, তখন তাঁকে আমাদের সমস্যার কথা বলে এর উত্তর চাইবে। আমরা পুনরায় তোমার কাছে এসে যেন তা জানতে পারি। ধ্রুব সম্মত হলে ঋষিরা স্বস্থানে গমন করলেন।

ভগবান বিষ্ণু ধ্রুবের নিকট আসামাত্র ধ্রুব তাঁকে সমস্ত পরিচয় দিয়ে ঋষিদের প্রতি তাঁর অবিচারের হেতু জানতে চাইল। ভগবান বললেন—"চল নৌকা চড়ে আগে একটু ঘুরে আসি, ঋষিদের প্রশ্নের উত্তর পরে দেব এখন।" এই বলে তিনি ধ্রুবকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। একটু দূরেই একটী সুন্দর হ্রদ। অতি স্বচ্ছ তার বারিধারা মলয় স্পর্শে হিল্লোল তুলে নাচছে। ঘাটে বাঁধা ছোট একটি পানসী, জল তরঙ্গের তালে তালে নৃত্য সুরু করে দিয়েছে। আনন্দে ধ্রুবের হৃদয় ভরে উঠল। বিষ্ণুর ইঙ্গিতে সে নৌকায় উঠে বসল, আর বিষ্ণু স্বহস্তে দাঁড় টানতে লাগলেন। ভক্ত ও ভগবানকে বক্ষে ধারণ করে পানসীখানা তীরের মত মাঝ-দরিয়ায় ছুটে গেল। কিছুক্ষণ পর বিষ্ণু হঠাৎ দাঁড়টানা বন্ধ করলেন। অদূরে জলের মধ্যে কি একটা দেখিয়ে বললেন, "বলতে পার ধ্রুব, ওটা কী?" বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধ্রুব বললে—"ওটা কি একটা পাহাড়?" বিষ্ণু বললেন, "তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। কিন্তু কিসের পাহাড় বলত?" ধ্রুব কোন উত্তর দিতে পারল না দেখে বিষ্ণু বললেন—"অস্থির পাহাড়। কার অস্থি জান?" শুনে ধ্রুব চমকে উঠে বললে—"অস্থির পাহাড় তাও কি সম্ভব? এখানে এত অস্থি কেমন করে আসবে?" বিষ্ণু বললেন—"সত্যই ওটা একটা অস্থি-পাহাড়, আর এ সব অস্থি তোমার।" ধ্রুব শিউরে উঠল। সে যেন কোন মায়াপুরে এসে পড়েছে। চীৎকার করে সে বলে উঠল—"আপনার সম্মুখে রক্তমাংসের দেহ নিয়ে আমি বসে আছি। আমার অস্থি ওখানে কেমন করে যাবে? আর আমার অস্থি দিয়ে এতবড় একটা পাহাড় তৈরী হবে, তাই বা কেমন করে সম্ভব?" ভগবান কোন উত্তর করলেন না। শান্ত গম্ভীরভাবে পুনরায় দাঁড় বেয়ে তিনি তীরের দিকে নৌকা নিয়ে চললেন। কিছুক্ষণ পরে ডাঙ্গার একটা স্থানে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন—"ওখানে কি দেখছো, বলতে পার?" "পাহাড়!

ওটাও কি একটা অস্থির পাহাড়?" সভয়ে কম্প্রকণ্ঠে ধ্রুব উত্তর দেয়। বজ্রগম্ভীর স্বরে ভগবান বললেন—"হ্যাঁ, ওটাও একটা অস্থির পাহাড় এবং ওসব অস্থিও তোমার।" ধ্রুব নিশ্চল, নিস্পন্দ, নির্ব্বাক। সে জেগে ছিল, না স্বপ্ন দেখছিল ঠিক করতে পারছিল না। তার মাথা ঘুরছিল। কতগুলো এলোমেলো অসংলগ্ন চিন্তার তরঙ্গ উঠছিল সেখানে। ভগবানের তেজোদ্দীপ্তবাণী তার চিন্তাতরঙ্গ আলোড়িত করে দিল। ভগবান বললেন—"শোন ধ্রুব! তোমার সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হতে বৃক্ষলতাদির অসংখ্য যোনী ভ্রমণ করে যখন তুমি জীব জন্ম গ্রহণ করেছিল, তখন থেকে পশু পক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতি যোনীর মধ্য দিয়ে তোমার যে জীবনধারা প্রবাহিত হয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ জন্মের অস্থি প্রতিবার তোমার মৃত্যুকালে আমি সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করার পরেও কত জন্ম তুমি আমাকে জানবার চেষ্টা কর নাই। তোমার সেই সকল ব্যর্থ মনুষ্য-জন্মের অস্থিগুলিও প্রতিবার তোমার মৃত্যুকালে আমি যত্নে আহরণ করেছিলাম। এই সকল মনুষ্য ও মনুষ্যেতর জীব-জন্মের সংগৃহীত অস্থিগুলি দিয়ে আমি একটা পাহাড় সাজিয়েছিলাম—যে পাহাড় তুমি একটু আগে জলের মধ্যে দেখেছ। তারপর যখন থেকে তোমার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ সার্থক হয়েছিল, যখন থেকে আমাকে জানবার জন্য তোমার একটা প্রচেষ্টা সুরু হয়েছিল, তোমার সেই সব জন্মের অস্থিগুলিও প্রত্যেকবার তোমার দেহাবসানকালে আমি সংগ্রহ করেছিলাম এবং তোমার বিগত জন্ম পর্য্যন্ত যে সব অস্থি সংগৃহীত হয়েছিল, সেইগুলি দিয়ে ডাঙ্গার উপর আমি ঐ পাহাড় সাজিয়ে রেখেছি। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়াটার দিকে তাকিয়ে দেখ—তোমার বিগত জন্মের কয়েকখানি অস্থি দিয়ে ঐ চূড়া নির্ম্মাণ করেছি।" ধ্রুবকে তাঁর কথাগুলো গলাধঃকরণ করবার অবসর দেওয়ার জন্যই যেন ভগবান নীরব হলেন।

ক্ষণকাল পরে তিনি আবার বললেন—"ঋষিদের প্রশ্নের উত্তর তুমি এখন পেয়েছ আশা করি! তাঁরা আবার এলে তাঁদিকে বলবে তোমার সুদীর্ঘ তপস্যা জীবনের একটা অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র দেখে তাঁরা যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তা কত ভ্রান্ত। আমাকে পাবার জন্য তোমাকে বিশেষ কোন তপস্যা করতে হয় নাই বলে পক্ষপাতিত্বের যে অপবাদ আমার ঘাড়ে তাঁরা চাপাতে চেয়েছেন, সেটা কতটা মূঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত, তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ ডাঙ্গার উপর ঐ পাহাড়। তাঁদের জটা পেকে গেছে, গায়ে উইঢিপি জন্মে গেছে, ইত্যাকার দাবী উত্থাপন করে তাঁদের তপস্যাকালের সুদীর্ঘতার একটা ধারণা জাগিয়ে দিয়ে যদি চমক লাগিয়ে দিতে চান, তুমিও তাঁদিকে বলবে, তোমাকে আমার তপস্যায় কত জন্মজন্মান্তর অতিবাহিত করতে হয়েছে, কত অসংখ্যবার মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। সে সব হিসাব আমার কাছে আছে, আর সেই হিসাব অনুসারেই আমি বিচার করে থাকি। এ ক্ষেত্রেও তাই করেছি।"

নৌকা ততক্ষণ ঘাটে এসে ভিড়েছিল। উভয়ে নৌকা হতে অবতরণ করলেন। ধ্রুব ভূতাবিষ্টের মত বিষ্ণুর অনুসরণ করলেন।

সকলে কুশলে আছ আশা করি। আমার দেহ সুস্থ বা অসুস্থ কিছুই বলা চলে না।

করা বা পশ্চাৎপদ হওয়ার কল্পনাও করা চলবে না; পথের শেষ দৃষ্টিগোচর হয় কিনা দেখবার জন্ম অধীর আগ্রহে বারংবার নিষ্ফল দৃষ্টিপাত করে একাগ্রতা নষ্ট করা চলবে না। ভগবানের নির্দ্দেশ মনে করে কর্ত্তব্য বোধে ক্রমাগত হেঁটে যেতে হবে। চলার নেশা, চলার আনন্দেই বিভোর হয়ে থাকতে হবে। পথের শেষে যিনি আছেন, যাঁর উদ্দেশে তোমার পথ চলা সুরু হয়েছে, পথের মাঝখানেই তোমার সাথী হয়ে তোমার হাত ধরে তিনি তোমায় গন্তব্য পথে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁকে দেখতে না পেলেও এটা তুমি স্পষ্ট অনুভব করবে। তোমার চলার কষ্ট তোমার গ্রাহ্যের মধ্যেই আসবে না। পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা তখন তোমায় সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবে না। পথের কাঁটা তখন পুষ্পশয্যায় পরিণত হবে। একটা মহাভাবে তোমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠবে, কোন প্রকার ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ ভাবনা, কোন প্রকার লাভের সঙ্কীর্ণ আকাঙ্ক্ষা তোমার হৃদয় স্পর্শ করতে পারবে না। একটা আকুল আবেগ নিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয় যে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী, তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমুদ্র এগিয়ে আসে; আর যাকে লাভ করার জন্য নদীর অভিসার সুরু হয়েছিল, তার অজ্ঞাতসারে হলেও সে সেই সাগরের হাত ধরে নেচে নেচে অগ্রসর হয়।

আমার শরীর এখন কিছু সুস্থ বলে মনে হচ্ছে। কোরিয়ার যুদ্ধের মত আমার দেহে যেন স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্যের ঠেলাঠেলি চলছে। কখনও স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্যকে অভিভূত করে ফেলছে, আবার কখনও অস্বাস্থ্য শক্তি সঞ্চার করে স্বাস্থ্যকে হ'টে যেতে বাধ্য করছে। কিন্তু আমার দেহ স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্যের লীলাভূমি হ'লেও ঠাকুর আমাকে জয়-পরাজয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। আমার দেহটা আমার নয়, একটা থাকার খাঁচা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

আশা করি কুশলে আছ।

(ফরিদপুরের জনৈক পুরোহিত শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্‌ সদ্‌গুরু নিবাস

ভুবনেশ্বর

১০.৫।৫০

বাসুদেবেষু—

একখানা ছবি কল্পনার চোখে ফুটিয়ে তুলতে পার? গঙ্গার জল একটা স্থানে জমাট হয়ে বরফের পুতুলের আকার ধারণ করেছে। এই পুতুল গঙ্গার অর্চ্চনা করছে। তার পূজার উপকরণ শুধু গঙ্গাজল। অর্থাৎ বরফের পুতুল, যা গঙ্গাজলেরই বিকার, গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে গঙ্গাজল দিয়ে গঙ্গাপূজা করছে। এই পুতুলের গঙ্গাপূজার মত আমরাও প্রতিনিয়ত ব্রহ্মপূজা করছি। আমরা যা কিছু করি আমাদের নিজেদের আনন্দ বা তৃপ্তির জন্য। আত্মতর্পণ, আত্মসেবা বা আত্মপূজাই আমাদের সকল কর্ম্মে প্রেরণা প্রদান করে, আমাদের সমস্ত কাজ আমাদিকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়। জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক আমরা নিজেদের আত্মার পরিতৃপ্তির জন্যই স্ত্রী-পুত্রাদিকে ভালবাসি, দেশ-সেবায় উদ্বুদ্ধ হই; কখনও ধর্ম্মপথে বিচরণ করি, আবার কখনও অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করি। কখনও প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, দয়া প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তিসমূহ আমাদের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে যত্নবান হই, আবার কখনও অধর্ম্ম, কাম, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতিকে প্রশ্রয় প্রদান করি। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই ব্রহ্ম-সমুদ্রের অংশ। তিনি সিন্ধু আমরা বিন্দু, তিনি অগ্নি আমরা স্ফুলিঙ্গ, তিনি শিব আমরা জীব। পূর্ণ এবং তার অংশের মধ্যে যেমন স্বরূপগত কোন পার্থক্য নাই, তেমনি পরমাত্মা আর তাঁর অংশ আমাদের জীবাত্মা

স্বরূপতঃ এক। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকেই ব্রহ্মের এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। অতএব দাঁড়ায় এই যে, আত্মতৃপ্তি আত্ম-সেবা বা আত্মপূজার জন্যই যখন আমাদের সকল কর্ম নিষ্পন্ন হয়, তখন আমরা আমাদের যাবতীয় কর্মের দ্বারা ব্রহ্মেরই তর্পণ, সেবা বা পূজা করি। কিন্তু এই সব কর্মও ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নয়। 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।' বিশ্বের সব কিছুই ব্রহ্ম। অতএব 'কায়েন মনসা বাচা' আমরা যে সকল কর্ম করি সে গুলিও ব্রহ্ম। ব্রহ্মপূজার উপকরণসমূহ যেমন ব্রহ্ম (ব্রহ্মার্পণং হবির্ব্রহ্ম) তেমনি আমাদের আত্মপূজার অর্থাৎ আমাদের অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্মও ব্রহ্ম। যজ্ঞেশ্বর নিজেই নিজের উদ্দেশ্যে নিজেকে আহুতি প্রদান করেন, ভগবান নিজেই নিজেকে নিজের দ্বারা অর্চ্চনা করেন। তিনিই পূজারী তিনিই ভোক্তা—আবার ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প, চন্দন প্রভৃতিও সবই তিনি। তা ছাড়া তাঁকে অবলম্বন করে তাঁরই কোলে বসে পূজারী পূজা করেন। তিনি ছাড়া আর কেউ যে কারও আশ্রয় নাই! বরফের পুতুলের গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে গঙ্গাজল দিয়ে গঙ্গাপূজার চিত্রটী যদি হৃদয়ে জাগরূক রাখতে পার তবে ব্রহ্মই ব্রহ্মের কোলে বসে ব্রহ্মোপবাসের সাহায্যে ব্রহ্মপূজা করছেন, এ চিত্রটি মনের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা ক্রমশঃ সহজসাধ্য হয়ে আসবে।

আমরা যে বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান করে থাকি তার উদ্দেশ্য কী? প্রতিমা নির্মাণ করে, বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে, ভূরি ভোজনের আয়োজন করে, আমরা যে উৎসবে মেতে যাই, তার সার্থকতা কী? প্রণালীমত পূজা করতে করতে পূজারী এমন একটা অবস্থা লাভ করেন, যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠার ফলে প্রতিমা ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হন এবং পূজার উপকরণ প্রভৃতিতে এবং আপনাতেও ব্রহ্ম দর্শন করে ধন্য হন। শুধু তাই নয়, তাঁর এই দিব্যদৃষ্টির গণ্ডী ক্রমশঃ পরিধি বিস্তার করে সমস্ত বিশ্ব ছেয়ে ফেলে, আর সে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করে, যাহা যাহা দৃষ্টি পড়ে তাঁহা

ক্লুক্ষ স্ফুরে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উদ্দেশ্য সফল হতে দেখা যায় না। কারণ বাহ্য বিষয়গুলোতেই পূজারীর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে বলে অন্তর্লক্ষ্যে পৌঁছান তার পক্ষে দুরূহ হয়ে ওঠে। যাঁর উদ্দেশ্যে পূজা প্রদান করা হয়, পূজারী নিজে, পূজার উপকরণ সমূহ এবং পূজা সম্পর্কিত সব কিছুই যে ব্রহ্ম, এই সত্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে পারলে তবেই পূজার দ্বারা আশুফল পাওয়া যায়, নতুবা পূজা পূজামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

খড় মাটী বা রং প্রভৃতির সাহায্যে আমরা পূজার জন্য যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করি তা যে জড় নয়, চিন্ময়ী প্রতিমা, পূজার আগে এই বিশ্বাসটা খুব দৃঢ়ভাবে মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হয়। এরই নাম বোধন। এই সত্য-বোধের দ্বারা নিজে উদ্বুদ্ধ হয়ে, প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে, তারপর পূজা করতে হয়। তবেই প্রতিমাপূজার দ্বারা পূজারীর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। প্রতিমায় সত্য-বোধ বা ব্রহ্মবোধ জাগ্রত হ'লে ক্রমশঃ সবই ব্রহ্মময় হয়ে যায়, আর সাগরের উর্ম্মিমালার মত সব কিছুই ব্রহ্ম-সমুদ্রে ভাসমান মনে হয়। ব্রহ্মময়ী মায়ের কোলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বিষয়বস্তুই নর্ত্তনশীল মনে হয়, তারাও ব্রহ্মজ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে ওঠে, ব্রহ্ম আর তাদের মধ্যে পৃথক সত্তা অনুভবের মধ্যে আসে না।

পূজাদির দিকে তোমার একটা বেশ ঝোঁক আছে, এটা খুব সুখের বিষয়। কিন্তু গতানুগতিক ভাবে পূজা না করে পূজায় যাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পার, পূজার মধ্যে একটা নূতন আলোক সম্পাত করতে পার, এ বিষয়ে চেষ্টিত হ'লে তবেই তোমার পূজা সার্থক হবে। নতুবা সাধারণ পূজকদের মত মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি বাইরের কেতাদুরস্ত আদব কায়দা গুলোই যদি তোমার আকর্ষণের বস্তু হয়, তবে কস্মিন্‌কালেও পূজার দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না। সাধারণতঃ আমরা কী দেখতে পাই? পূজারী আজীবন পূজা করে মরে, কিন্তু না হয় তার নৈতিক উন্নতি,

না হয় চরিত্র গঠন, না হয় ধর্ম্মলাভ। এভাবে পূজা করে দলে ভিড়ে গেলে চলবে না। পূজার একটা নূতন মর্য্যাদা যদি প্রতিষ্ঠা করতে পার, তোমার পূজা যদি অন্ধভাবে অনুষ্ঠিত না হয়, তোমার প্রতিমা বা পটের মধ্যে যদি চৈতন্যের অধ্যাস হয়, তোমার পূজায় তোমার ইষ্ট দেবতা যদি সঞ্জীবিত হয়ে ওঠেন, এ সব যদি সম্ভবপর হয়, তবে তোমার পূজার দ্বারা শুধু তুমি নিজেই লাভবান হবে না, পূজার একটা আদর্শ স্থাপন করতে পারবে, গতানুগতিকতা পরিত্যাগ করে অন্যে তোমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করতে পারবে, পূজার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আর তা যদি না পার, তবে ছেলেদের মত পুতুল খেলায় লাভ কি?

আজ এই পর্য্যন্ত। বলবার বা লিখবার অনেক কিছুই ত আছে? কিন্তু কে বা সব শোনে, লেখেই বা কে? শারীরিক অসুস্থতার জন্য এ বিষয়ে কতকটা ত্রুটি আমার দিক হতেও হয়ত হচ্ছে। কিন্তু এটাকে আমি মোটেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনতাম না, যদি জানা বা শেখার প্রকৃত আগ্রহ কারও মধ্যে দেখতাম। আশা করি কুশলে আছ।

(মথুরাবাসী জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ গলসী (বর্দ্ধমান)

২৬।২।৫০

বাসুদেবেষু—

ব্রহ্মের নির্গুণ বিভাব বা তুরীয় অবস্থা সম্বন্ধে কোন কিছুই বলা বা চিন্তা করা যায় না। এই নির্গুণ ব্রহ্ম যখন মায়া উপাধি অঙ্গীকার করে সগুণ হন, তখন তাঁর এই সগুণ বিভাবই আমাদের ধারণা বা চিন্তার বিষয় হতে পারে। এই সগুণ ভাবের আবার তিনটি অবস্থা। জাগ্রত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি। এমন একদিন ছিল যখন স্থূল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বমাত্র ছিল না। সমগ্র বিশ্বকে আপনার মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে ভগবান যেন গম্ভীর নিদ্রামগ্ন ছিলেন, অর্থাৎ পুরাণের ভাষায়, প্রলয় পয়োধিতে তিনি ভাসমান ছিলেন বলে একে কারণ-সমুদ্রও বলা যায়। তারপর প্রলয় রজনীর যখন শেষ হয়ে আসছিল, তখন তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন—'একোঽহং বহুস্যাম'—আমি একা আছি, আমাকে বহু হতে হবে। এইটাই তাঁর স্বপ্নাবস্থা। তারপর এই স্বপ্নকে রূপ দেওয়ার জন্য তিনি জেগে উঠলেন। এইটাই তাঁর জাগ্রত অবস্থা। জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর স্বপ্ন বা ইচ্ছাকে ব্যক্ত করার জন্য 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণ করলেন আর এই ওঁকার বা প্রণব থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হ'ল। এই ওঁকারের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সঙ্কল্পকে বা নিজেকে অভিব্যক্ত করলেন বলে এই ওঁকার বা প্রণবই ব্রহ্ম। অব্ ধাতু, উষ্ ধাতু আর মন্ ধাতুর আদ্য অক্ষর অর্থাৎ অ, উ, ম এই তিনটি বর্ণের সংযোগে ওঁকারের উৎপত্তি হয়েছে। অব বা অব্যাতে বা জগৎ যাঁর দ্বারা রক্ষিত হয় অর্থাৎ সত্ত্বগুণী

বিষ্ণু, উষ্‌ বা উগ্যাতে বা জগৎ যাঁর দ্বারা সংহার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তমোগুণী শিব, আর মন্‌ বা মন্যতে বা যাঁর ইচ্ছামাত্র জগৎ স্পষ্ট হয় অর্থাৎ রজোগুণী ব্রহ্মা—প্রণব এই তিনের সমষ্টি। অতএব ওঁকারের অর্থ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কারণ পরমাত্মা। ভগবানের একটা নাম যেমন 'ওঁ' তেমনি তাঁর আর একটি ছদ্মনাম 'তজ্জলান্'। 'তজ্জলান্' এর অর্থ তজ্জ, তল্ল, তদন—অর্থাৎ তাঁর থেকেই বিশ্ব উদ্ভূত হয়ে তাঁকে আশ্রয় করেই অবস্থিতি করছে আর তাঁরই মধ্যে লয় প্রাপ্ত হবে। কিন্তু এসব বলতে হলে অনেক কথার অবতারণা করতে হয়। এখন শুধু কাজের কথাই বলি।

প্রণবকে আশ্রয় করে যেমন জীব জগৎ বা বিশ্বের সব কিছু নেমে এসেছে, তেমনি এই প্রণবকে আশ্রয় করে বা ওঁকারকে ধরে সকলকে উঠতে হবে—ব্রহ্মের সঙ্গে বিলীন হতে, ব্রহ্মকে লাভ করতে হবে। অর্থাৎ বারংবার প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ বা জপ অর্থাৎ শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা তদ্‌ভাবাপন্ন বা তদাকার প্রাপ্ত হতে হবে। প্রণব, ভগবান এবং ভগবানের নাম—উভয়েরই জ্ঞাপক। অতএব মোটের উপর দাঁড়ায় এই যে, ভগবানের নামের দ্বারা ভগবানকে পেতে হবে। ওঁকার ছাড়া যেমন ব্রহ্মের আর একটী নাম তজ্জলান্, তেমনি ব্রহ্মবাচক আরও অনেক নাম আছে এবং এগুলিকে আশ্রয় করেও ব্রহ্মলাভ হতে পারে। তবে এই সকল নাম সাধন কেমন করে করতে হয়—অর্থাৎ নাম জপের প্রণালী, সদ্‌গুরুর কাছ থেকে জেনে নিতে হয়। তা না হলে নাম-সাধনে বড় একটা ফল পাওয়া যায় না।

জিনিষটা বেশ ভাল করে উপলব্ধি করার জন্য একখানা ছবি মনের মধ্যে ফুটিয়ে তোল। ভগবান যেন এক গাছা দড়ি ঝুলিয়ে দিয়েছেন, আর তার মধ্য হতে উদ্ভূত হয়ে নিখিল বিশ্ব যেন এই দড়ি ধরে নেমে

এসেছে। এই দড়ির অগ্রভাগ থেকে আরও কতকগুলো দড়ি নির্গত হয়ে চতুর্দ্দিকে সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্র্যও এই সকল দড়ি ধরে অনন্ত বিশ্বে যাতে ছড়িয়ে পড়তে পারে সেইজন্য যে মূল রজ্জুটা ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত এইটাই হচ্ছে প্রণব, আর এর থেকে যে সমস্ত শাখা-রজ্জু নির্গত হয়েছে, ঐগুলো ভগবানের আরও অসংখ্য নাম, যেগুলো অবলম্বন করে প্রণবেই পৌছান যায়। কিন্তু এর মধ্যে যে রহস্য নিহিত আছে তা আর একদিন বোঝাবার চেষ্টা করব।

এই যে ছবি কল্পনা করতে বললাম, এর অনুরূপ ছবি পুরাণকারও অঙ্কিত করেছেন এবং এই পৌরাণিক ছবি অবলম্বন করে আমরাও পট প্রস্তুত করেছি—যদিও জনসাধারণের যাতে বোধগম্য হতে পারে, সেজন্য উল্টোভাবে এই পট অঙ্কিত হয়েছে। আমি ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের কথা বলছি। নারায়ণের নাভি হতে পদ্মের মৃণাল নির্গত হয়েছে আর এই মৃণালের অগ্রভাগে অনন্তদল পদ্মের মধ্যে ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত আছেন—অর্থাৎ সৃষ্টি কার্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পদ্মের মৃণালকে যদি রজ্জু মনে করা যায় এবং রজ্জু হতে বিস্তৃত অসংখ্য শাখা-রজ্জুকে যদি মৃণালের অগ্রভাগ হতে নির্গত পদ্মের অসংখ্য দল বলে ধরা যায়, তা হলে আমি যে ছবি কল্পনা করতে বলছি তার সঙ্গে পুরাণোক্ত এই ছবির সর্ব্বাংশে সামঞ্জস্য লক্ষিত হবে। কিন্তু অপটু পটুয়ার আঁকা পটের মত ছবিখানাকে উল্টোভাবে কল্পনা করলে চলবে না। গীতার সেই 'ঊর্দ্ধমূলমধঃ-শাখম্" শ্লোকাংশের ভাবানুযায়ী বিশ্বমূল ভগবানকে ঊর্দ্ধে স্থাপন করতে হবে—শাখা প্রশাখা প্রভৃতি অর্থাৎ বিশ্ব প্রকৃতি থাকবে নিম্নের দিকে।

পুরাণে আছে, ব্রহ্মা পদ্মের মৃণাল ধরে তার মধ্য দিয়ে মূলে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ ভগবানকে পাবার জন্য বহুকাল ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়ায় পুনরায় তিনি স্বস্থানে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন তিনি দৈববাণী শুনলেন 'তপ', 'তপ'—অর্থাৎ তপস্যা কর। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

গোস্বামীজিউ বলেছেন—এই দৈববাণী শুনে ব্রহ্মা যে সাধনা করেছিলেন, সেই সাধনাই গোসাঁইজী লাভ করেছিলেন এবং সেইটাই তাঁর শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে চলে আসছে। অতএব আমাদের এই সাধন সনাতন বস্তু। সৃষ্টির আদিকাল থেকে এ সাধন প্রবাহ বর্ত্তমান যুগে এসে পৌঁচেছে। এই সাধনের মধ্যে যে মাধুর্য্য আছে, তা যতই সাধন পথে অগ্রসর হবে ততই প্রকাশিত হবে। এই অমূল্য বস্তু লাভ করেও যদি এর অমর্য্যাদা কর, জাগতিক ক্ষুদ্র সুখে মত্ত হয়ে এই পরম ধনকে যদি উপেক্ষা করে চল, তবে তোমাদের পক্ষে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে ?

আমার শরীর এখন মন্দের ভাল। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

(শ্রীবৃন্দাবনে সাধনরত জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্‌

ভুবনেশ্বর
২০।৫।৫৫

বাসুদেবেষু—

শ্রীরাধা শ্যাম-অভিসারে চলেছেন। বনপথে সখীদের সঙ্গে দেখা। সখীরা তাঁকে দেখে বিস্মিত হল, যদিও একাকিনী বনপথে শ্রীরাধিকাকে যেতে দেখা তাদের কাছে মোটেই নূতন নয়। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মধ্যে বিচ্ছেদের পালা চলছিল, তাই সখীদের এই বিস্ময়। সখীরা জিজ্ঞাসা করল—"এমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে কোথায় চলেছিস সই ?" আনন্দোৎফুল্ল

হয়ে শ্রীরাধা উত্তর দিলেন—"দেখ, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। শ্রীকৃষ্ণ আজ আমাকে স্মরণ করেছেন। এতদিন বিরহের পর আজ তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হবে বলে তাঁর কাছে চলেছি।" আনন্দে অধীর হয়ে সখীরা বললে—"শুধু তোর নয় সই, আজ আমাদেরও বড় আনন্দের দিন। তুই যা—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তোর যখন মিলন হবে, তখন আমরাও এই বনে উৎসবে মেতে যাব। কিন্তু আয়, আগে তোকে সাজিয়ে দি। এতদিন পর তাঁর কাছে যাবি, সালঙ্কারা হয়ে সুবেশে যেতে হয়। কিন্তু তোর রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ, গয়না ত নাই! আয় পুষ্পপত্র দিয়েই যতদূর পারি তোকে সাজিয়ে দি। একটু সেজে গুজে না গেলে তাঁর ভালবাসা কেমন করে পাবি সই? শ্রীরাধার মুখে রক্তিম আভা দেখা দিল, চোখ দুটি ছল্ ছল্ করে উঠল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন,—"ওগো, তাঁকে তোমরা ভুল বুঝো না। তাঁর ভালবাসার পাত্রী হতে হলে গহনার প্রয়োজন হয় না। কোন প্রকার অলঙ্কারই তাঁকে ভোলাবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। তাঁকে যারা চায়, তাঁর জন্য তাদের ভালবাসা কতখানি, তাই শুধু তিনি লক্ষ্য করেন, আর তাই দেখে কার কতখানি ভালবাসা পাবার যোগ্যতা তার বিচার করেন। গহনা আছে কিনা, সে সব তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন না।" এই বলেই শ্রীরাধা ত্বরিত পদে গন্তব্য পথে অগ্রসর হলেন।

শ্রীরাধা ঠিকই বলেছিলেন। ভগবান বাইরের কোন লক্ষণ, আভরণ বা অলঙ্কার দেখে কাউকে ভালবাসেন না। এ সব জিনিষ গণনার মধ্যে না এনে তিনি শুধু লক্ষ্য করেন তাঁর অনুরক্তগণের প্রেম তাঁর প্রতি কতখানি এবং তাই দেখে তিনি তাঁর বিচারের সৌধ গড়ে তোলেন। তাই আমরা দেখতে পাই, শ্রীরাধাকে তিনি রুক্মিণী সত্যভামার চেয়েও বেশী ভালবাসতেন, যদিও এঁরা ছিলেন রাজকন্যা এবং এঁদের বেশভূষা, রত্নালঙ্কার প্রভৃতি কিছুরই অপ্রতুল ছিল না।

গোপীরা যে ভুল করেছিল, সেই ভুল অনেক মুমুক্ষু সাধকই করে থাকেন। তাঁরা অলঙ্কারের দ্বারা ভগবানকে ভোলাবার কল্পনা করেন। শুধু বেশভূষা মালা তিলক প্রভৃতি নয়, কঠোর সাধনার দ্বারা নানা বিভূতি ও যোগৈশ্বর্য্য অর্জ্জন করে তাঁরা ভগবানের কাছে যেতে চান, তাঁর ভালবাসা, তাঁর কৃপা লাভ করবার জন্য। কিন্তু এ সব বহির্বস্তুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে তিনি শুধু দেখেন, সেখানে তাঁর প্রতি তাদের কতখানি দরদ, কতখানি প্রেম ভালবাসা নিহিত আছে। আর তাই দেখে যে সব সাধক নানাবিধ বিভূতি ঐশ্বর্য্য লাভ করেছে, তাদিকে হয়ত তাঁর কৃপা হতে বঞ্চিত করেন, আর যারা শুধু ভক্তিমাত্র সার করে পড়ে আছে, তাদিকে তাঁর প্রেম দান করে কৃতার্থ করেন। বেশভূষা বা অলঙ্কারাদির মোহ তাদেরই বেশী যাদের অন্তরের সৌন্দর্য্য নাই বা থাকলেও তা ধর্ত্তব্য নয়। যেখানেই বেশভূষার পারিপাট্য বা অলঙ্কারের জলুস্, সেখানেই ভিতরে গলদ থাকার সম্ভাবনা বেশী; ডাক্তারেরা যে dress করে, তার মধ্যে যেমন থাকে পচা ঘা। কোন জিনিসের সম্বন্ধে সঠিক বিচার করতে হলে সেটাকে উলঙ্গ ক'রে—in its nakedness—দেখতে হবে। ভগবান ঠিক এই ভাবেই বিচার করে থাকেন। গোপীরা কাত্যায়নী ব্রত করেছিল। তার ফল প্রদানের জন্য তিনি এই প্রকার বিচারই করেছিলেন। তাদের আভরণ উন্মোচন করে, তাদের বস্ত্র হরণ করে তিনি তাদের পরীক্ষা করেছিলেন। এর নির্গলিত অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি তাদের বাহ্য বিষয়বস্তুগুলোকে মোটেই আমল না দিয়ে তাদের অন্তর লক্ষ্য করেছিলেন।

যোগ-বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্য, এ সব গহনা ছাড়া কিছুই নয়। এই সব অবলম্বনে যাঁরা ভগবানের কাছে যেতে চান, তাঁদের মধ্যে একটা অভিমান থাকে, আর এই অভিমান ভগবানের কৃপালাভের বিশেষ অন্তরায়। ভক্তিপ্লুত চিত্ত নিয়ে তাঁর কাছে যেতে হবে। আর কিছুরই আবশ্যক নাই। এ কথা

উপলব্ধি না করে অনেকেই ঐশ্বর্য বিভূতি প্রভৃতি নিম্নস্তরের জিনিসগুলির প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়, আর যে ভক্তি বা প্রেম তাঁকে লাভ করার জন্য প্রধান অবলম্বনীয় তার প্রতি আদৌ আস্থাসম্পন্ন হয় না। ভগবান ভক্তিলভ্য। তিনি ভাবগম্য। আর কিছুই তাঁর ভালবাসা পাবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। ঐশ্বর্য্যের দ্বারা তাঁর ঐশ্বর্য্যই লাভ হয়। তাঁর মাধুর্য্য, প্রেম বা ভালবাসা এর দ্বারা লাভ করা যায় না। শ্রদ্ধা ভক্তির দ্বারা তাঁর কাছে যেতে হবে। অপরাপর সাধনের আবশ্যকতা কি ?

যোগৈশ্বর্য্যের প্রতি তোমাদের যেন মোহ মোটেই না থাকে। ভগবানের কাছে যাওয়ার পথে এগুলো আপনি আসে। এর জন্য আবার সাধনা কেন ? এ সব লাভ করবার জন্য কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা ত করাই ঠিক নয়, অযাচিতভাবে এলেও এগুলোকে বর্জ্জন করেই ভক্তিপথের পথিক হতে হয়। ভগবান তাঁর প্রেমপ্রার্থীদিকে অধিকাংশ সময়েই কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে ফেলেন। তাঁর মাধুর্য্য-রসের আস্বাদন করবার জন্য কোন ভক্তকে তাঁর কাছে আসতে দেখলে, তিনি তার পথের সম্মুখে নানাবিধ ঐশ্বর্য্য ছড়িয়ে রাখেন। এই সব ঐশ্বর্যে যারা মুগ্ধ হয় এবং এই সব সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তারা তাদের অভীষ্ট বস্তু ভুলে যায় এবং এই ঐশ্বর্য্যই তখন তাদের কাছে প্রলোভনের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। যারা এসব তুচ্ছ করে গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়, তারাই তাঁর কোলে উঠে মাধুর্য্য-রসের আস্বাদন করে ধন্য হয়। ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক মুখরোচক কথা বললেও, সে সব গ্রাহ্য করো না। খুব সাবধান।

আশা করি কুশলে আছ।

(কাশীবাসী জনৈক বিরাগী শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্‌

দার্জিলিং

২২।৫।৫৫

বাসুদেবেষু—

একটা গল্প বলি শোন। তোমার প্রশ্নের উত্তর এই গল্পের মধ্যেই পাবে।

ঋষিদের একটা Conference (সম্মেলন) বসে গেল! তাঁরা শুনেছেন পাঁচ বছরের ছেলে ধ্রুব নাকি ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেছে। তিনি প্রায়ই তাঁর কাছে সশরীরে আবির্ভূত হন, তার সঙ্গে কথা কন, খেলা করেন, কৌতুক করেন, তাকে সঙ্গে নিয়ে নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান, আরও কত কি। এই সব শুনে তাঁরা বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তাঁরা কতকাল ধরে তপস্যা করছেন তার ঠিকানা নেই, দেহ অস্থিচর্ম্মসার হয়ে গেছে, মাথায় জটা বেঁধে সেগুলো পেকে উঠেছে, দেহে উই-ঢিপি জম্মে গেছে, তবু তাঁরা তাঁকে সশরীরে সম্ভোগ করার অধিকার লাভ করেন নি। আর ঐ পাঁচ বছরের শিশু, ঐটুকু ছেলে, তপস্যা করার সময়ই বা পেলে কোথায়, আর তার পক্ষে কী তপস্যাই বা সম্ভব যে এরই মধ্যে ভগবানের সমস্ত করুণা তার উপর ঝরে পড়ল! তাঁরা সকলে ধ্রুবের নিকট গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে রহস্য ভেদ করবেন সাব্যস্ত করলেন। যথাকালে তাঁরা সকলে ধ্রুবের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করলেন। ধ্রুব তাঁদের নিকট প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে না পেরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। ঋষিরা তখন বললেন—"ভগবানের সঙ্গে এবার যখন তোমার সাক্ষাৎ হবে, তখন তাঁকে আমাদের সমস্যার কথা বলে এর উত্তর চাইবে। আমরা পুনরায় তোমার কাছে এসে যেন তা জানতে পারি। ধ্রুব সম্মত হলে ঋষিরা স্বস্থানে গমন করলেন।

ভগবান বিষ্ণু ধ্রুবের নিকট আসামাত্র ধ্রুব তাঁকে সমস্ত পরিচয় দিয়ে ঋষিদের প্রতি তাঁর অবিচারের হেতু জানতে চাইল। ভগবান বললেন—"চল নৌকা চড়ে আগে একটু ঘুরে আসি, ঋষিদের প্রশ্নের উত্তর পরে দেব এখন।" এই বলে তিনি ধ্রুবকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। একটু দূরেই একটী সুন্দর হ্রদ। অতি স্বচ্ছ তার বারিধারা মলয় স্পর্শে হিল্লোল তুলে নাচছে। ঘাটে বাঁধা ছোট একটি পানসী, জল তরঙ্গের তালে তালে নৃত্য সুরু করে দিয়েছে। আনন্দে ধ্রুবের হৃদয় ভরে উঠল। বিষ্ণুর ইঙ্গিতে সে নৌকায় উঠে বসল, আর বিষ্ণু স্বহস্তে দাঁড় টানতে লাগলেন। ভক্ত ও ভগবানকে বক্ষে ধারণ করে পানসীখানা তীরের মত মাঝ-দরিয়ায় ছুটে গেল। কিছুক্ষণ পর বিষ্ণু হঠাৎ দাঁড়টানা বন্ধ করলেন। অদূরে জলের মধ্যে কি একটা দেখিয়ে বললেন, "বলতে পার ধ্রুব ওটা কী?" বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধ্রুব বললে—"ওটা কি একটা পাহাড়?" বিষ্ণু বললেন, "তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। কিন্তু কিসের পাহাড় বলত?" ধ্রুব কোন উত্তর দিতে পারল না দেখে বিষ্ণু বললেন—"অস্থির পাহাড়। কার অস্থি জান?" শুনে ধ্রুব চমকে উঠে বললে—"অস্থির পাহাড় তাও কি সম্ভব? এখানে এত অস্থি কেমন করে আসবে?" বিষ্ণু বললেন—"সত্যই ওটা একটা অস্থি-পাহাড়, আর এ সব অস্থি তোমার।" ধ্রুব শিউরে উঠল। সে যেন কোন মায়াপুরে এসে পড়েছে। চীৎকার করে সে বলে উঠল—"আপনার সম্মুখে রক্তমাংসের দেহ নিয়ে আমি বসে আছি। আমার অস্থি ওখানে কেমন করে যাবে? আর আমার অস্থি দিয়ে এতবড় একটা পাহাড় তৈরী হবে, তাই বা কেমন করে সম্ভব?" ভগবান কোন উত্তর করলেন না। শান্ত গম্ভীরভাবে পুনরায় দাঁড় বেয়ে তিনি তীরের দিকে নৌকা নিয়ে চললেন। কিছুক্ষণ পরে ডাঙ্গার একটা স্থানে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে বললেন—"ওখানে কি দেখছো, বলতে পার?" "পাহাড়!

ওটাও কি একটা অস্থির পাহাড়?" সভয়ে কম্প্রকণ্ঠে ধ্রুব উত্তর দেয়। বজ্রগম্ভীর স্বরে ভগবান বললেন—"হ্যাঁ, ওটাও একটা অস্থির পাহাড় এবং ওসব অস্থিও তোমার।" ধ্রুব নিশ্চল, নিস্পন্দ, নির্ব্বাক। সে জেগে ছিল, না স্বপ্ন দেখছিল ঠিক করতে পারছিল না। তার মাথা ঘুরছিল। কতগুলো এলোমেলো অসংলগ্ন চিন্তার তরঙ্গ উঠছিল সেখানে। ভগবানের তেজোদ্দীপ্তবাণী তার চিন্তাতরঙ্গ আলোড়িত করে দিল। ভগবান বললেন—"শোন ধ্রুব! তোমার সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হতে বৃক্ষলতাদির অসংখ্য যোনী ভ্রমণ করে যখন তুমি জীব জন্ম গ্রহণ করেছিল, তখন থেকে পশু পক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতি যোনীর মধ্য দিয়ে তোমার যে জীবনধারা প্রবাহিত হয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ জন্মের অস্থি প্রতিবার তোমার মৃত্যুকালে আমি সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করার পরেও কত জন্ম তুমি আমাকে জানবার চেষ্টা কর নাই। তোমার সেই সকল ব্যর্থ মনুষ্য-জন্মের অস্থিগুলিও প্রতিবার তোমার মৃত্যুকালে আমি যত্নে আহরণ করেছিলাম। এই সকল মনুষ্য ও মনুষ্যেতর জীব-জন্মের সংগৃহীত অস্থিগুলি দিয়ে আমি একটা পাহাড় সাজিয়েছিলাম—যে পাহাড় তুমি একটু আগে জলের মধ্যে দেখেছ। তারপর যখন থেকে তোমার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ সার্থক হয়েছিল, যখন থেকে আমাকে জানবার জন্য তোমার একটা প্রচেষ্টা সুরু হয়েছিল, তোমার সেই সব জন্মের অস্থিগুলিও প্রত্যেকবার তোমার দেহাবসানকালে আমি সংগ্রহ করেছিলাম এবং তোমার বিগত জন্ম পর্য্যন্ত যে সব অস্থি সংগৃহীত হয়েছিল, সেইগুলি দিয়ে ডাঙ্গার উপর আমি ঐ পাহাড় সাজিয়ে রেখেছি। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়াটীর দিকে তাকিয়ে দেখ—তোমার বিগত জন্মের কয়েকখানি অস্থি দিয়ে ঐ চূড়া নির্ম্মাণ করেছি।" ধ্রুবকে তাঁর কথাগুলো গলাধঃকরণ করবার অবসর দেওয়ার জন্যই যেন ভগবান নীরব হলেন।

ক্ষণকাল পরে তিনি আবার বললেন—"ঋষিদের প্রশ্নের উত্তর তুমি এখন পেয়েছ আশা করি! তাঁরা আবার এলে তাঁদিকে বলবে তোমার সুদীর্ঘ তপস্যা জীবনের একটা অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র দেখে তাঁরা যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তা কত ভ্রান্ত। আমাকে পাবার জন্য তোমাকে বিশেষ কোন তপস্যা করতে হয় নাই বলে পক্ষপাতিত্বের যে অপবাদ আমার ঘাড়ে তাঁরা চাপাতে চেয়েছেন, সেটা কতটা মূঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ ডাঙ্গার উপর ঐ পাহাড়। তাঁদের জটা পেকে গেছে, গায়ে উইঢিপি জন্মে গেছে, ইত্যাকার দাবী উত্থাপন করে তাঁদের তপস্যাকালের সুদীর্ঘতার একটা ধারণা জাগিয়ে দিয়ে যদি চমক লাগিয়ে দিতে চান, তুমিও তাঁদিকে বলবে, তোমাকে আমার তপস্যায় কত জন্মজন্মান্তর অতিবাহিত করতে হয়েছে, কত অসংখ্যবার মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। সে সব হিসাব আমার কাছে আছে, আর সেই হিসাব অনুসারেই আমি বিচার করে থাকি। এ ক্ষেত্রেও তাই করেছি।"

নৌকা ততক্ষণ ঘাটে এসে ভিড়েছিল। উভয়ে নৌকা হতে অবতরণ করলেন। ধ্রুব ভূতাবিষ্টের মত বিষ্ণুর অনুসরণ করলেন।

সকলে কুশলে আছ আশা করি। আমার দেহ সুস্থ বা অসুস্থ কিছুই বলা চলে না।

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

ভুবনেশ্বর
২।৭।৫৫

বাসুদেবেষু—

তুমি এবং তোমার মত আরও অনেককে আমি উপদেশ ছলে যে সব গল্প বলে থাকি, তাদের মধ্যে কোন কোনটির কোন পৌরাণিক ভিত্তি আছে কি না সন্দেহ করছো। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পুরাণাদির সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই কম, এ কথা স্বীকার করতে মোটেই আমাব সঙ্কোচ নাই। এ সব বিষয়ে আমার যা কিছু অভিজ্ঞতা তার অধিকাংশ অপরের কাছ থেকে শুনে বা অন্যান্য বই পড়ে আমি লাভ করেছি এবং এগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলে বিশ্বাস করে তবেই আমি গ্রহণ করেছি। কোন্ পুরাণ বা গ্রন্থে আমার আখ্যায়িকাগুলি স্থান লাভ করেছে, তা স্মরণ করে বা খোঁজ করে বলা আমার পক্ষে কঠিন। কাজেই এ বিষয়ে তোমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আমি অক্ষম। হয়ত কোন কোন গল্প পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত আকারে আমার নিকট উপস্থিত হয়েছে। আবার এমনও হতে পারে যে প্রচলিত পুরাণ সংহিতাদির মধ্যে হয়ত কোনটীর নামগন্ধও নাই। তথাপি এ সব আখ্যায়িকা যে ভিত্তিহীন, এ কথা স্বীকার করতে আমি মোটেই প্রস্তুত নই।

এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থসমূহের অনেকাংশ এখনও পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। হয়ত সেগুলি এখনও কোথাও পুঁথির আকারে অযত্নে রক্ষিত হয়ে কীটদষ্ট হচ্ছে, অথবা হয়ত অনেক জিনিস ছাপা গ্রন্থ বা হাতের লেখা

পুঁথির কোনটাতেই নাই, লোকপরম্পরায় শ্রুত হয়ে সেগুলি এখনও পর্য্যন্ত চলে আসছে। এদের বিষয়বস্তু বা আখ্যায়িকার ভিত্তি ছাপা গ্রন্থ বা পুঁথিতে নয়, মানুষের হৃদয়ে। এগুলি যে বিকৃত অবস্থায় আমাদের কাছে পৌঁছে নাই, আমি তা বলি না। তবু অন্ততঃ আমার কাছে এগুলি সত্য বলেই মর্য্যাদা লাভ করে, যদি আমি দেখতে পাই যে তত্ত্বজ্ঞানলাভে সেগুলি সহায়তা করছে।

এই অসত্যের যুগে ছাপা জিনিসকেই লোকে মর্যাদা দেয় বেশী, তা না হলে খাঁটী জিনিসের উপরও কেউ বিশ্বাস স্থাপন করতে চায় না। ছাপা কাপড় যেমন খেলো হলেও একটা চমক লাগিয়ে দেয় আর অনেকেই তার মর্য্যাদা করে, কিন্তু যে কাপড় ছাপা নয়, জিনিষ হিসাবে তা খুব উঁচুদরের হলেও তার কদর সাধারণের কাছে তেমন হয় না। ছাপা গ্রন্থাদিতে যা আছে তার চেয়েও ঢের অমূল্য সম্পদ নিহিত আছে সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে যা তাঁরা গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত হয়েছেন। এই কারণে ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় থাকা সত্ত্বেও সাধু মহাপুরুষ এবং গুরুর পদতলে বসে ধর্ম্মশিক্ষা করতে হয়। তাঁদের নিকট গচ্ছিত অমূল্য নিধির সদ্ব্যবহার না করে ছাপা গ্রন্থাদির প্রতি যারা বেশী অনুরক্ত, ঠিক ঠিক শিক্ষা তাদের লাভ হওয়া কঠিন। গুরুর উপদেশ ছাড়া শাস্ত্র বোঝা যায় না। সদ্‌গুরুর কথাবার্ত্তা, উপদেশ, আচার ব্যবহার প্রভৃতির প্রতি মনোযোগী হলে শাস্ত্রের মর্ম্ম বহুল পরিমাণে উদ্ঘাটিত হয়। তাঁদের জীবনই শাস্ত্রের ভাষ্য। কাজেই কোন শাস্ত্রতত্ত্ব বোঝাবার জন্য যদি তাঁরা কোন গল্পের অবতারণা করেন, পুরাণাদিতে যার সন্ধান মেলে না, তবে তার প্রামাণিকতায় সন্দেহ করা খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাঁদের এ সব আখ্যায়িকা যদি স্বকপোল-কল্পিতও হয়, তথাপি শাস্ত্রার্থ বোধের সহায়ক বলে এগুলিকে সম্যক মর্য্যাদা দিতে হয়। পুরাণাদি গল্পসমূহ আমাদের

কাছে সমাদর লাভ করে তাদের ঐতিহাসিক সত্যতার জন্য নয়। অনেক বস্তুই ঋষিদের কল্পনা-প্রসূত। কিন্তু কাল্পনিক হলেও তত্ত্ববোধের উন্মেষক বলে সেগুলো আমাদের কাছে সত্য হিসাবেই মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়। ভগবানের কল্পনা বিশ্বসৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই জগৎকে যেমন কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তেমনি ঋষিদের বা ঋষিকল্প মহাপুরুষদের কল্পনা যা সৃষ্টি করেছে তাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা না করে সত্য বলে সমাদর করাই সুগম পন্থা।

হিতোপদেশ, Æsops Fables প্রভৃতিতে যে সকল গল্প আছে, সে সব কোনকালেই কেউ সত্য বলে বিশ্বাস করে না। কিন্তু এই সব গল্পের একটা educative value আছে বলে এগুলোকে তাচ্ছিল্য করতেও কেউ পারে না। এই সমস্ত বইতে যে সকল গল্প আছে, সেইরূপ উপদেশাত্মক গল্প কেউ যদি রচনা ক'রে বলে, তবে সেগুলোকেও অবজ্ঞা করা বা তাদের সার্থকতায় সন্দিহান হওয়াও কারও পক্ষে সম্ভবপর হয় না। তা যদি না হয় তবে রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণাদির গল্পের অনুরূপ শিক্ষাপ্রদ গল্প কেউ যদি বানিয়েও বলে, তবে সেগুলোর প্রামাণিকতা নিয়ে মাথা ব্যথার কি কারণ থাকতে পারে, তা বুঝতে পারি না। গল্পের যেটা উপদেশ সেইটাই তার প্রাণ বা আত্মা। কাহিনীটা একটা অবলম্বন মাত্র। এটা বিভিন্ন বিষয় বস্তুর সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারে বললেও কিছু আসে যায় না। আসল উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে কি না, অর্থাৎ তত্ত্ববোধের সহায়ক হচ্ছে কি না, এইটাই লক্ষ্য করবার বিষয়। খোসা নিয়ে টানাটানি করে কোন লাভ নাই। আমার কথিত গল্পসমূহের প্রামাণিকতা, ভাষা, বর্ণনাভঙ্গী প্রভৃতি বাইরের জিনিষগুলোই যদি তোমাদের আকর্ষণের বস্তু হয়, রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদির গল্প সাধারণ অশিক্ষিত লোকেরা যে ভাবে গ্রহণ করে, তোমরাও যদি সেই ভাবে নাও, তবে

তোমাদেরও কোন উপকার সাধিত হবে না, আমারও তোমাদিগকে উপদেশ দানের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে। বর্ত্তমান প্রচলিত টাকা, আধুলি প্রভৃতির মধ্যে রূপোর ভাগ বড় একটা নাই বললেও চলে, তবু এগুলোতে যে ছাপ দেওয়া থাকে তারই জন্য এগুলো রূপোর দরেই বিক্রী হয়। তেমনি আমি যে সব গল্প বলি সেগুলো ভাগবত পুরাণাদিতে যদি নাও থাকে, তথাপি এই সব গ্রন্থের ছাপ তাদের মধ্যে থাকলে সেগুলো জনসাধারণের নিকট সমাদর লাভ করবে ভেবে এই ধরণের গল্প বলারই আমি বেশী পক্ষপাতী। নতুবা বাঘের গল্প বলেও এসব উপদেশ দেওয়া যেত। কিন্তু এই পুরাণাদি অধ্যুষিত দেশে সাধারণের নিকট তা তেমন মুখরোচক হ'ত না।

আশা করি কুশলে আছ। আমি একভাবেই আছি।

(জনৈক কংগ্রেস-কর্ম্মী হোমিওপ্যাথ ডাক্তার শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ কলিকাতা

২৬।১।৫৮

বাসুদেবেষু—

জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করতে চাও, এতে আমার আপত্তি বা অসম্মতি থাকবে কেন? জনসেবা আর ভগবানের সেবা, এ দু'টায় কোন তফাৎ আছে বলে আমি মনে করি না। এসব কাজে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

জনমঙ্গলের কাজে দশের এবং দেশের সেবা ত হয়ই, তা ছাড়া এতে একটা অনাবিল আনন্দ পাওয়া যায় এবং আত্মার কল্যাণও হয় যথেষ্ট। কিন্তু এ সকল কাজ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ এবং নিষ্কামভাবে করা চাই। তা না করে যদি নিজের স্বার্থটাকে বড় করে দেখা যায়, অথবা জনসেবার পরিবর্ত্তে যদি তাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করার আকাঙ্ক্ষাটাই প্রবল হয়ে ওঠে, তবে কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণকেই বরণ করে নেওয়া হয়। জনসেবাকে উপলক্ষ্য করে ভগবানেরই সেবা করছি, এই ভাবটা যদি মনের মধ্যে জাগরূক রাখা যায়, তবে একটা দীনতা হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রাখে, প্রভুত্ব বা কর্ত্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা মাথা তুলতে পারে না। এ বিষয়ে আমার সম্মতি আছে কি নাই জানার জন্য অপেক্ষা না করে আপনার অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবে, সেখানে কোন স্বার্থবুদ্ধি অথবা মান যশের আকাঙ্ক্ষা আত্মগোপন করে আছে কিনা। যদি এ দুটোর একটারও লেশমাত্র সেখানে দেখতে পাও, তবে সভয়ে জনসেবার কাছ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হবে। নতুবা মনুষ্যত্ববর্জ্জিত একটা অহংসর্ব্বস্ব জীবে পরিণত হতে হবে। অতএব এসব কাজে হাত দেওয়ার আগে বাসনা কামনার মূল হৃদয় থেকে তুলে ফেলতে হবে, এই আমার উপদেশ।

স্তুতি নিন্দা, জয় পরাজয়, মান অপমান প্রভৃতিকে উপেক্ষা করতে না পারলে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করা যায় না। ভাল বা মন্দ যাই কর না কেন, এ সব কাজে সুখ্যাতি এবং অখ্যাতি দুই-ই আছে। দশের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিলেও লোকের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিন্দাই হতে হবে, পদে পদে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হতে হবে। খারাপ কাজ করলে জনসাধারণের বিরাগভাজন ত হতেই হবে। কিন্তু ভাল কাজ করলেও স্বার্থবুদ্ধি রসাতলে ডুবিয়ে দিয়ে আত্মত্যাগকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করলেও, রেহাই পাবে না। এমন কতকগুলো সঙ্কীর্ণচেতা লোক আছে,

যারা সব কিছুতেই লোকের ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়ায়। এরা তোমার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠন করে লোকচক্ষে তোমাকে হেয় করবার জন্য উঠে পড়ে লাগবে এবং শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। সম্মানের আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে, তবে অসম্মান বা অপমান আসবেই, এ বিষয়ে তুমি স্থির নিশ্চয় হতে পার। সম্মান এবং অপমান, নিন্দা এবং প্রশংসা, জয় এবং পরাজয় ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, এসব জিনিষগুলো এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে যে একটাকে নিতে চাইলে অপরটাকেও শিরোধার্য্য করে নিতে হবে। হয় দুইই ত্যাগ করতে হবে, অথবা দুইই গ্রহণ করতে হবে। এই ত্যাগ করার অর্থ কর্ম্মত্যাগ নয়, কর্ম্মফল বা কামনা ত্যাগ। কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী হয়ে কাজ করতে গেলেই তা'তে প্রত্যবায় আছে। এই জন্যই গীতা নিষ্কাম কর্ম্মের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। কাজ করতে হলেই যখন পরাজয়ের গ্লানি মাথা পেতে নিতে হবে, নিন্দা এবং অপমানকে বরণ করে নিতে হবে, অধর্ম্মের অংশভাগী হতে হবে, তখন কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে দিয়ে অজগর বৃত্তি অবলম্বন করাই সুগম পন্থা, এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি যেন মনের মধ্যে না জাগে। খাবারে ভেজাল থাকতে পারে এই সন্দেহে আহার বন্ধ করা, জলে কৃমি থাকতে পারে এই আশঙ্কায় জলপান না করা, অথবা বাতাসে জীবাণু থাকতে পারে এই ভয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করে বসে থাকা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। খাদ্য পানীয় বা বাতাস যাতে দূষিত হতে না পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ সব জিনিস গ্রহণ করায় কোন অপরাধ নাই, বরং গ্রহণ না করলেই ভবলীলার অবসান হবে। তবে অবিশুদ্ধ অবস্থায় এ সব গ্রহণ করলে স্বাস্থ্য-হানি ঘটে বলে অপরাধী হতে হয়। তেমনি কর্ম্ম অনুষ্ঠানে কোন দোষ বা অপরাধ নাই। অবৈধভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানই দোষাবহ। কোন কর্ম্মই, তা সে কর্ম্ম আমাদের কাছে যত অপকর্ম্ম বা নিন্দনীয় বলেই মনে হোক না কেন, মোটেই দোষযুক্ত হয় না যদি আমরা তাকে শোধন ক'রে নি। কর্ম্মকে শোধন

করার তিনটী পন্থা গীতা নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন। ভগবানে কর্ম্মসমর্পণ ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন আর কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ। সাধারণের কাজে বা দেশসেবার জন্যই এই তিনটী পন্থার অনুসরণ করতে হবে তা নয়, সর্ব্ববিধ কর্ম্মই যাতে এইরূপে পালন করা যায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। এরই নাম কর্ম্মযোগ।

অর্থ বা যশের জন্য কোন কাজ করার প্রবৃত্তি যেন তোমার না হয়। এ সবের দ্বারা স্থায়ীভাবে অভাবের নিবৃত্তি হয় না। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে একটা ব্রহ্মক্ষুধা বা ভগবানের জন্য অভাববুদ্ধি নিহিত আছে। কিন্তু এটা যে কিসের ক্ষুধা বা কী বস্তুর অভাব, তা বুঝতে না পেরে আমরা জাগতিক বস্তু-সমূহের পশ্চাতে ধাবমান হই এবং সেগুলোর দ্বারা আমাদের অভাবের নিবৃত্তি হবে বা অভীষ্ট সিদ্ধি হবে ভেবে কিছুকাল তাদিকে নিয়ে খুব নাড়া-চাড়া করি। কিছুদিন পরেই সেগুলো আনন্দের পরিবর্ত্তে আমাদের নিরানন্দের কারণ হয়ে ওঠে, ক্ষুধা নিবৃত্তির পরিবর্ত্তে সেগুলো আমাদের ক্ষুধা আরও বাড়িয়ে দেয়, আর আমরা বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়ে পড়ি। শিশু যেমন একটা বস্তু নিয়ে কিছুকাল খেলা করে এবং সেটা ফেলে দিয়ে আবার একটা কিছু পাবার জন্য লালায়িত হয়, আমরাও তেমনি ভগবান আমাদের জন্য যে বিশ্বের মেলা বা খেলার ঘর সাজিয়ে রেখেছেন, সেখানে কখনও একটা কখনও আর একটা বিষয়বস্তুতে আসক্ত হই। কিন্তু কোনটাই চিরতরে আমাদের অভাবের নিবৃত্তি করতে সক্ষম হয় না। আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এমনিভাবে মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন করেই অপব্যয়িত হয়। ভবের খেলা যখন আমাদিকে খেলতে হবে, তখন এমনভাবে খেলা চাই, জাগতিক কর্ম্মসমূহ এমন ভাবে নিষ্পন্ন করা চাই যে বাইরে থেকে যাই বলে মনে হোক না কেন, অন্তরে যেন একটা আনন্দের ফল্গুধারা অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়। সে উপায় হচ্ছে নিষ্কামভাবে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান।

বৈধ সকল প্রকার কর্ম্মই তোমরা করবে। এইটাই তোমাদের কর্ত্তব্য। কর্ম্ম না করে বৈরাগ্য অবলম্বন করতে তোমাদিকে আমি বলি না। ভগবানকে লাভ করতে হলে কর্ম্মত্যাগ করতে বা বৈরাগী হতে হবে, অনেকেই এই রকম একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে। যত শীঘ্র এই ধারণার নিরসন হয়, ততই তাদের পক্ষে মঙ্গল। আমি হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে দু-একজনকে কর্ম্মবাহুল্য পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছি। কিন্তু সে নিয়ম নয়, বরং নিয়মের ব্যতিক্রম। তাদের পক্ষে তাই দরকার বলেই আধার অনুযায়ী এ প্রকার নির্দ্দেশ দিয়েছি। আশা করি এর দ্বারা বিভ্রান্ত হবে না।

আজ এই পর্য্যন্ত। খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজে লেগে যাও। তোমাদের প্রতি আমার আশীর্ব্বাদ ত আছেই এবং চিরকাল থাকবেও। ঠিকভাবে কাজ করলে ভগবানের আশীষ-ধারাও তোমাদের উপর বর্ষিত হবে এবং তা তোমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারবে। মানুষের মুখের দিকে তাকিও না। মানুষের কাছ থেকে কোন প্রকার সাহায্য পাবার প্রত্যাশা করো না এবং তার প্রয়োজনও কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। এইটা বিশেষভাবে মনে রেখো—মানুষ মানুষের ভাল বা মন্দ কিছুই করতে পারে না। দাতা একমাত্র ভগবান। আমরা যাকে ভাল বা মন্দ বলি, সে সব তাঁর কাছ থেকেই আসে। ভাল যদি পেতে চাও, তবে ভালভাবে বা বৈধভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা চাই। কোন প্রকার ফলের আকাঙ্ক্ষা করে কাজে হাত দেবে না। সব কাজই ভগবানের। তাঁর কাজ করতে ফল কামনা করার, উৎকোচ গ্রহণ করার প্রবৃত্তি হবে কেন? যে প্রকার ফলই আসুক না কেন, নির্ব্বিকার চিত্তে তা গ্রহণ করতে হবে।

এ সব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলতে হয়। কিন্তু পত্রে আর কত বলা যায়? আশা করি কুশলে আছ।

(খুলনার জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

(প্রথম)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্‌ বালিগঞ্জ

১০।২।৫৪

বাসুদেবেষু—

তুমি প্রশ্ন করেছো, ভগবান কোথায়? কোথায় তাঁর সেবাপূজা করবে, এই চিন্তা তোমাকে আকুল করে তুলেছে। তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে তোমাকে আমি প্রতিপ্রশ্ন করি—তিনি কোথায় নাই? জগতে কি এমন কোন স্থান বা বস্তু আছে, যেখানে তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত তোমার সেবা বা পূজা তাঁরই চরণে পৌঁছবে না? জগতের প্রতি অণুপরমাণুতে তিনি অনুস্যূত হয়ে আছেন। প্রত্যেক বিষয়বস্তুতে ওতঃপ্রোতভাবে তিনি মিশে আছেন। অথবা এমনও বলা যায় যে জগতের প্রতি অণুপরমাণু বা প্রত্যেক বিষয়বস্তু সবই ব্রহ্ম। কোথায় তাঁর সেবা বা পূজা পৌঁছে দেবে, এ চিন্তায় শুধু তুমি নয়, তোমার মত আরও অনেকেই দেহ মন অবসন্ন করে ফেলে, অথচ আমাদিকে তাঁর সেবাপূজার সুযোগ দেবার জন্য একা তিনি বহু হয়ে আছেন। সমস্ত রূপে সর্ব্বঘটে তিনি বিরাজমান আছেন। ঘট্‌ ঘট্‌ বিরাজে রাম।

ওই যে অনন্ত সুনীল আকাশ, ওই আকাশই ব্রহ্মের স্বরূপ। আবার ঐ অনন্ত আকাশে বিচরণশীল চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, এরাও ব্রহ্ম। ঐ আকাশ-বক্ষে প্রবহমান মলয়ানিল, ঐ আকাশ-পারাবারে ভাসমান বিহঙ্গকুল, এ সবও ব্রহ্ম। অনন্ত আকাশে পরিভ্রমণশীল আমাদের এই পৃথিবী এবং এই পৃথিবীর আশ্রয়ে অবস্থিত চেতন অচেতন তাবৎ বস্তু, সবই ব্রহ্ম।

তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হয় না। যেখানে তোমার প্রাণ চাইবে, তোমার মন যার প্রতি আকৃষ্ট হবে, সেইখানেই তাঁর উদ্দেশ্যে তুমি তোমার ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন কর। তোমার প্রেমের অশ্রু ঢেলে দাও। তাহলেই তোমার দেওয়া ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি, তোমার প্রেম-নিবেদন সবই সার্থক হয়ে উঠবে, কিছুই :বৃথা যাবে না। অনন্ত সাজে সেজে তিনি তোমার হৃদয়-দুয়ারে করাঘাত করছেন! দুয়ার খুলে তোমার সংস্কারমত তাঁর যে কোন একটী রূপ বেছে নিয়ে তাঁকে তোমার হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর, মনোমত সাজে তাঁকে সাজাও, তাঁর সেবা-পূজা কর, তাঁকে নমস্কার কর, তাঁর সঙ্গে কথা কও, রঙ্গরসে মেতে যাও, তোমার যা প্রয়োজন তার জন্য তাঁর কাছে আবদার কর। তোমার যা কিছু তাঁকে নিবেদন করে দাও। তাহলে তিনিও তাঁর অনন্ত প্রেম, অনন্ত ঐশ্বর্য্য তোমাকে উজাড় করে দেবেন।

অথবা যদি তোমার অহমিকা এরূপ সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির প্রশ্রয় দান করতে না চায়, একটা বস্তুতে ব্রহ্মত্ব আরোপ করতে তোমার প্রাণ যদি অস্বীকার করে, তবে তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করে সর্ব্বত্র তাঁকে নমস্কার কর, তাঁর সেবাপূজা করে কৃতার্থ হও! যে পাখীগুলি তোমার আঙ্গিনায় সমবেত হয়ে কলরব সুরু করে দিয়েছে—বিশ্বাস কর ওরা প্রত্যেকে এক একটী ব্রহ্ম! অনাহূত হয়েও তোমার সেবা গ্রহণ করবার জন্য তোমার বাড়ীতে ওরা সমুপস্থিত। একমুষ্টি তণ্ডুলকণা ছড়িয়ে দিয়ে ওদের সেবা করে ধন্য হও। 'জয় রাধেকৃষ্ণ' বলে ঐ যে ভিখারী তোমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে, ওকে মানুষ ভেবে আত্মবঞ্চনা করো না। স্বয়ং ভগবান ভিখারী-বেশে তোমাকে সেবার সুযোগ দিতে এসেছেন। তার প্রার্থনা পূর্ণ করে, ভগবানের সেবা করে আপনাকে কৃতার্থ কর। এই যে পিপীলিকার শ্রেণী সারিবদ্ধ হয়ে তোমারই পাশ দিয়ে আহারের অন্বেষণে চলেছে—ওরাই ত ব্রহ্মের এক একটী ক্ষুদ্র সংস্করণ! কিছু চিনি, গুড় বা

তাদের অন্য কোন প্রিয় খাদ্য ওদের সম্মুখে ধরে দাও, ওরা ভোজনানন্দে মেতে যাক। তাহলে তোমার ভগবানেরই সেবা করা হবে। তোমার আঙ্গিনায় ঐ যে চারাগাছগুলি জলের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে—তোমার সেবা গ্রহণ করবার জন্য ভগবানই ত ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন! একটুখানি জলদান করে তাদিকে সঞ্জীবিত করে তোল। ব্রহ্মসেবার ফল লাভ করে ধন্য হও। তাঁর সেবা করবার জন্য তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হয় না। বহুরূপী তিনি অনন্ত রূপ পরিগ্রহ করে আমাদের ভালবাসা পাবার জন্য, আমাদের সেবা পাবার জন্য অনন্তভাবে আমাদিকে আহ্বান করছেন। কিন্তু সে আহ্বানে আমাদের প্রাণে সাড়া জাগে না। যাঁর মত অনায়াসলভ্য আর কেউ নাই—থাকতে পারে না—তাঁকে খুঁজতে খুঁজতেই আমাদের জীবন লীলার অবসান হয়ে যায়। তাঁর সেবা করা আর হয় না!

দেখ, এমন একদিন ছিল যখন আর কেউ কোথাও ছিল না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তখন একমেবাদ্বিতীয়ম্। শুধু ব্রহ্মই বিরাজমান ছিলেন। কি জানি কেন অকস্মাৎ এই আপ্তকাম বিরাট পুরুষের মনের মধ্যে একটা অভাববুদ্ধি জেগে উঠল। নিঃসঙ্গ জীবন তাঁর কাছে যেন দুর্ব্বহ বলে মনে হতে লাগল। তিনি ভালবাসবেন বা উপভোগ করবেন এমন কেউ বা কিছু ছিল না। তাঁকেও ভালবাসবার বা উপভোগ করবার মত কেউ বা কিছু ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন একান্তভাবে একা! ভালবাসা পাওয়া এবং দেওয়ার নেশা—সম্ভোগের একটা আকুল উন্মাদনা তাঁর মনের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব সঙ্কল্প জাগিয়ে তুলেছিল—'একোঽহম্ বহুস্যাম প্রজায়েয়।' এই সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করবার জন্য প্রথমতঃ তিনি পুরুষ প্রকৃতিরূপে আপনাকে সংভিন্ন করলেন। তারপর এই পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি হ'ল। তিনি

বিশ্বের তাবৎ বিষয়বস্তুতে অনুপ্রবেশ করে তাঁর ভোগলালসা চরিতার্থ করতে লাগলেন ! সর্ব্বত্র এই প্রেমের খেলা অনুষ্ঠিত হতে লাগল। এ খেলায় আমরা যোগদান করি, তাঁর সঙ্গে আমরাও আনন্দ উপভোগ করি, এই উদ্দেশ্যেই ত তিনি সৃষ্টির খেলায় মেতেছিলেন। কিন্তু এমনি বিড়ম্বনা—এমনি অদৃষ্টের পরিহাস যে, আমরা তাঁকে কোথাও খুঁজে পাই না। যিনি আমাদের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র অবস্থান করছেন, জগতে সূচ্যগ্র পরিমাণ স্থানে ক্ষণকালের জন্যও যাঁর অপলাপ হয় না, যিনি ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই, তাঁকে অন্বেষণ করার জন্য আমরা পণ্ডশ্রম করি—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করে বেড়াই। আমরা খুঁজে বেড়াই পৃথিবীর কোন্ নিভৃত প্রান্তে, কোন্ সুদূর তীর্থে, কোন্ হিরন্ময় মন্দিরে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁকে আমরা খুঁজি বেদান্তে পুরাণে, উপনিষদে দর্শনে ; তাঁকে আমরা অন্বেষণ করি কাব্যের ছন্দে, পুষ্পের গন্ধে ; তাঁকে আমরা খুঁজে বেড়াই তুলসী আর বিল্বদলে। তাঁরই অন্বেষণে প্রবেশ করি গঙ্গাজলে ; তাঁকে খুঁজি ভূধরে কন্দরে, সাধুর অন্তরে, মৃন্ময়ী প্রতিমায়, আকাশের নীলিমায়। কিন্তু কোথায় তিনি লুকিয়ে আছেন, তার কোন সন্ধানই আমরা পাই না। তার কারণ বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন একটা মায়াজাল বিস্তার করে রেখেছেন, মায়ার একটা যবনিকা ফেলে দিয়ে নিজেকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন যে সুলভ হয়েও তিনি দুর্লভ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে পাবার পথ সুগম হয়েও ভয়াবহভাবে দুর্গম হয়ে আছে। মা যেমন শিশু সন্তানকে কাছে কাছে রেখেও আড়াল থেকে তার সঙ্গে লুকোচুরী করে একটা আনন্দ উপভোগ করেন, এও তেমনি। একদিকে জীবের সহিত ভগবানের মিলনের, তার সঙ্গে সম্ভোগের, একটা আকুল পিপাসা তাঁর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে ; অপর দিকে আত্মগোপন করে, অন্তরালে অবস্থান করে, জীবের মধ্যে বিরহ-বেদন জাগিয়ে তুলে এবং

নিজেও সেই বেদন স্বেচ্ছায় যেচে নিয়ে তিনি যে প্রেমের খেলা খেলেন ; এতেও তাঁর মধ্যে একটা অপার আনন্দ উপচিত হয়ে ওঠে। এই বিরহ তাঁর কাছে মিলনানন্দের মতই সুখদায়ক। এই অবস্থায় তাঁর সেবাপূজা করা কেমন করে সম্ভব—এটা সত্য সত্যই একটা গুরুতর সমস্যার কথা এবং এ হিসাবে তুমি যে প্রশ্ন করেছো তার জন্য তোমার বিশেষ অপরাধও কিছু নাই। এরই মধ্যে পত্রখানা দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। এ সমস্যা সমাধানের উপায় পরের পত্রে নির্দ্দেশ করব।

আমার শরীর বা স্বাস্থ্যের জন্য তোমরা মোটেই চিন্তিত হয়ো না। আমার দেহখানা যদি অচল হয়ে যায়, জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করে তাদিকে সেবার যে সুযোগ ঠাকুর আমাকে দিয়েছেন তা যদি তিনি প্রতিসংহার করেন, তবে এটাও তাঁর দয়া বলে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব। আশা করি সকলে কুশলে আছ।

(দ্বিতীয়)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

ইন্দ্রনগর

২।৬।৫৪

বাসুদেবেষু—

ভগবান ইন্দ্রিয়াতীত। তিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, এমন কি মন, যাকে ইন্দ্রিয়গণের রাজা বলা হয়, এদের কারও গ্রাহ্য বা বিষয়ীভূত নন। মনের দ্বারা যে তাঁকে মনন করা যায় না একথা উপনিষদের ঋষিরা বহুস্থানে তারস্বরে ঘোষণা করেছেন—'যন্মনসা ন মনুতে। মন বা বাক্য তাঁর কাছে পৌঁছতে না পেরে ফিরে আসে—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।' বুদ্ধিও সেখানে অচল। সেখানে চক্ষু, বাক্য, মন বা বুদ্ধি যেতে পারে না।

তাঁকে আমরা জানি না, কেমন করে তাঁর উপদেশ দেওয়া যাবে? যাকে তিনি প্রকাশিত করেন, সে তাঁকে কখনও প্রকাশিত করতে পারে না। সূর্য্যের ভাতিতে জগৎ আলোকিত বলে জগৎ যেমন কখনও সূর্য্যকে আলোকিত করতে পারে না, তেমনি ব্রহ্মের দীপ্তিতে মন, বুদ্ধি প্রভৃতি দীপ্তমান বলে এরা তাঁকে প্রকাশিত করতে পারে না। প্রশ্ন হতে পারে, তবে তাঁকে পাবার উপায় কি? এর একমাত্র উত্তর এই যে, তিনি ভক্তিলভ্য—তিনি ভাবগম্য! পুনশ্চ প্রশ্ন হতে পারে, যাঁকে দেখলাম না, যিনি কোন ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ীভূত নন, তাঁর দিকে ভাবের ফোয়ারা কেমন করে ছুটবে, ভক্তিআপ্লুত চিত্তে তাঁর সেবাপূজা করা কেমন করে সম্ভব হবে?

একটা কথা বিশেষভাবে প্রণিধান করা দরকার। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ এঁদের কাউকে আমরা দেখি নাই, অথচ এঁদের প্রতি আমরা একটা গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি কেন? কারণ, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এঁরা জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষ ছিলেন। রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে এঁরা ভূতলে আবির্ভূত হলেও এঁদের প্রতি মনুষ্যবুদ্ধি করা অধিকাংশক্ষেত্রেই আমরা অপরাধ বলে মনে করি। তাঁরা ভগবানের এতদূর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন যে ভগবজ্জ্যোতিঃ তাঁদের দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে উদ্ভাসিত করেছিল এবং এই কারণে তাঁদের দেহাশ্রিত অবস্থায় তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যারা সঙ্গ করেছিলেন তাঁরা তাঁদিকে অলৌকিক গুণ ও শক্তি-সম্পন্ন বলে প্রচার করে গেছেন। তাঁদের যে জীবন-চিত্র এবং চরিত্র তাঁরা অঙ্কন করে গেছেন, সেইগুলো আমাদিকে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে। তাঁরা ভগবানের অবতার বা ভগবদ্দশী মহাপুরুষ ছিলেন বলে আমাদের মনে একটা প্রতীতি জাগিয়ে তোলে। যদিও তাঁরা এখন সশরীরে ইহ জগতে বর্ত্তমান নাই, তথাপি তাঁদের অমর আত্মা সর্ব্বত্র অবস্থিতি করছে, এই বিশ্বাসে আমরা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি, তাঁদের পূজা করে ধন্য হই।

এই পূজা মানস পূজা হতে পারে, অথবা তাঁদের মূর্তি বা প্রতিকৃতি নির্মাণ করেও সেবা পূজা করা চলতে পারে। ঠিক এমনি ভাবে ভগবদ্‌-দ্রষ্টা ঋষিরা বা ঋষিকল্প মহাপুরুষেরা তাঁর সম্বন্ধে যা বলে গেছেন, ভগবানকে চোখে না দেখলেও, সেই সমস্ত পড়ে বা শুনে তাঁর মহিমা অবগত হয়ে, তাঁর প্রতি আমরা শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠি এবং তিনিই আমাদের পরম এবং চরম আশ্রয়, এই সত্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে পূজার অর্ঘ্য প্রদান করি। তাঁকে আমরা দেখতে পাই না, তা'তে ক্ষতি কি? তিনি যে সর্ব্বত্রগ! যে ঘাটে ও যে পটে আমরা তাঁর সেবাপূজা করব সেখানেই তাঁর আবির্ভাব হবে, আমাদের সেবাপূজা তিনি গ্রহণ করবেন।

মনে কর, তুমি তোমার পিতার অন্ধ সন্তান। তাঁকে দর্শন করার সুযোগ বা অধিকার হতে তুমি সর্ব্বতোভাবে বঞ্চিত। কিন্তু দেখতে না পেলেও তাঁকে প্রণাম করা বা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করায় তোমার কোন বাধা নাই। তুমি তাঁকে দেখতে পাও বা না পাও, তিনি যে তোমার প্রণাম ও শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করেন, এসব যে বৃথা হয় না, এই জ্ঞান বা বিশ্বাসে তুমি সুপ্রতিষ্ঠ বলে তাঁর সেবা বা তাঁকে ভক্তি করতে তুমি উৎসাহিত হও। তেমনি ভগবানকে দেখার মত তোমার দিব্যদৃষ্টি না থাকলেও সেই বিশ্বতশ্চক্ষু তোমার কার্য্যকলাপ সমস্তই প্রতিনিয়ত দেখতে পান, কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। তাঁর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তোমার দান, তা সেটা যত অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন, সবই তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করেন। তাঁকে তুমি শুধু দেখতে পাও না তা নয়, তোমার সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ই সেখানে অচল। তাঁর সম্বন্ধে কোন প্রকার অনুভূতি বা জ্ঞান যে তোমার ইন্দ্রিয়-পথে অন্তরে প্রবেশ করবে, তার উপায় নাই। তথাপি তাঁর অস্তিত্ব বিষয়ে তোমার মধ্যে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে। তাঁর সম্বন্ধে একটা আস্তিক্যবুদ্ধি এমনভাবে তোমার চিত্ত অধিকার করা চাই যেন কখনও কোন অবস্থায় কোন কারণেই তা বিচলিত না হয়।

তারপর, তিনি যে সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গলময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, দয়াময়—তাঁর সম্বন্ধে এই সমস্ত জ্ঞান এবং বিশ্বাসগুলোও দৃঢ়ভাবে অন্তরে জাগিয়ে তোলা চাই। তিনি এই সমস্ত জ্ঞান বা শক্তির অধিকারী, এ বিষয়ে তোমার অণুমাত্র সন্দেহ যদি না থাকে, তবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি স্বতঃই তোমার অন্তরে উপচিত হয়ে উঠবে; কোথায় তাঁর পূজা প্রথম করবে, এজন্য তোমাকে মোটেই চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে না।

অতএব ধর্মার্থীগণের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান আয়োজন একটা অটল আস্তিক্যবুদ্ধি মনের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা। এই আস্তিক্যবুদ্ধির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর যদি ধর্ম্মের হর্ম্ম্য গড়ে তোলা যায় এবং তিনি কি বস্তু বা তাঁর স্বরূপ কেমন এ বিষয়ে যদি আমাদের সঠিক ধারণা থাকে, তবে কোথায় কেমন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবে, বা কেন করবে, এ দুর্ভাবনায়, দেহ মন অবসন্ন করার কোন প্রয়োজন হয় না।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বাড়ীতে আমার ঠাকুরের সেবা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি তোমাকে বিশেষ করে বলেছিলাম এবং তাঁর পট স্থাপন করে মহাসমারোহে তাঁর সেবাপূজা আরম্ভ করেছিলে, এ সংবাদও আমি পেয়েছিলাম। এখন সে সব তুলে দিয়ে আপদের শান্তি করেছ নিশ্চয়। নতুবা ভগবানের সেবাপূজা কোথায় করবে, এতদিনে এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর অর্থ কি? ভগবদ্‌বুদ্ধিতে ঠাকুর জটাশঙ্করের পূজা করলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হবে। তাঁর প্রতি যদি তোমার ভক্তিশ্রদ্ধা না থাকে, তবে বৃথাই তোমার সাধন-ভজন বৃথাই তোমার জীবন ধারণ। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সম্বন্ধে লোচনদাসজী যে উক্তি করেছিলেন, সেই কথার প্রতিধ্বনি করে ঠাকুর সম্বন্ধে আমিও বলি—'হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল রে, লোচন বলে সেই জীব বৃথা এল আর গেল রে।' ঠাকুর তোমার অন্তরে সুবুদ্ধি জাগ্রত করুন। আশা করি সব কুশল।

(বর্দ্ধমানের জনৈক পণ্ডিত শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ ভুবনেশ্বর

১৬।৪।৫৬

বাসুদেবেষু—

আমার কোনও কোনও উপদেশে তোমরা কেউ কেউ নাকি অদ্বৈতবাদের গন্ধ পেয়েছ এবং এই কারণে তোমরা এক একটী অদ্বৈতবাদী হয়ে উঠেছ। আমি কোন বাদবিসম্বাদের মধ্যে নাই। তথাপি যদি তোমরা জোর করে আমাকে এর মধ্যে টেনে এনে ফেলতে চাও এবং আমাকে এই মতবাদের পোষক ভেবে একটা দল গঠন করতে চাও, তবে আর উপায় কি?

অখণ্ড অদ্বৈত ব্রহ্মবস্তু ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই যে মত, উপনিষদের ভাষায় যাকে ভূমাবাদ বলা যেতে পারে, এরই নাম অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদের দ্বারা সেই অবস্থাই সূচিত হয়, যে অবস্থায় দ্বৈতভ্রম তিরোহিত হয়ে অদ্বৈতেরই প্রতিষ্ঠা হয়, যে অবস্থায় একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিপথে আসে না—'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।' অদ্বৈত বেদান্তের সারমর্ম্ম হচ্ছে—ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নয় এবং এটাই হচ্ছে চরম তত্ত্ব। 'সোঽহম্, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি'—অর্থাৎ আমি সেই, তুমিই তিনি, এই আত্মা ব্রহ্ম, আমিই ব্রহ্ম—চতুর্ব্বেদের এই চারটী মহাবাক্য বা চরম উপদেশ একবাক্যে প্রচার করেছে—'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।' মুখে অদ্বৈতবাদের তুবড়ী ফোটান কঠিন কিছু নয়। যে অবস্থায় অদ্বৈতবাদের পোষকতা করার অধিকার জন্মে, সেই অবস্থা যদি কারও অধিগত হয়ে থাকে, তবে তিনিই প্রকৃত অদ্বৈতবাদী। আমাদের যেটা চরম লক্ষ্য বা আদর্শ সেটা চোখের

সামনে ধরে রাখলে, সেই লক্ষ্য বা আদর্শে কখনও না কখনও হাজির হতে পারা যাবে। অন্ততঃ তার জন্য একটা চেষ্টাও আসবে। এই হিসাবে অদ্বৈত মত প্রচারের একটা সার্থকতা হয়ত আছে। কিন্তু কোন অনুভূতি নাই অথচ নিজেকে অদ্বৈতবাদী বলে জাহির করে আনন্দে আত্মহারা হওয়ার কোন অর্থ হয় না। উপনিষদ যেমন বলেন—'অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে'।

যতই আমরা জ্ঞানের উচ্চতর শিখরে আরোহণ করি, ততই বিশ্ববৈচিত্র্য আমাদের মন থেকে একে একে মুছে যায় এবং উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে উঠলে যেমন ভূতলের বন্ধুরতা, উঁচু-নীচু প্রভৃতি দৃষ্টিপথে আসে না, সবই একাকার মনে হয়, তেমনি জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি—'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।' এখানে নানা বা দ্বৈত বলে কিছু নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে জিনিসটা বোঝান যেতে পারে। সুবর্ণ নির্মিত হার ও বলয়ের মধ্যে পার্থক্য-বোধ ততক্ষণ থাকে, যতক্ষণ এদের উপাদান করণের প্রতি আমাদের লক্ষ্য পড়ে না, অর্থাৎ দুটো অলঙ্কারই যে সোণা দিয়ে তৈরী এই সত্যটা যতক্ষণ আমাদের উপলব্ধির মধ্যে আসে না। দুটোই সোণার তৈরী বলে যখনই আমরা বুঝতে পারি তখনই দুইএর মধ্যে ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়ে যায় এবং দুই-ই একবস্তু বলে আমাদের ধারণা হয়। আবার সাধারণের কাছে সোনার গহনা আর রূপার গহনার মধ্যে যথেষ্ট ভেদ দৃষ্ট হলেও জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে এই দুই-এ কোন পার্থক্য নাই। কারণ দুইই ধাতু। এইরূপে দৃষ্টি বা জ্ঞানের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বৈচিত্র্য বা নানাত্ব আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং জ্ঞানের উচ্চতম অবস্থায় সকলপ্রকার বিভেদ অন্তর্হিত হয়ে সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন হয়, অর্থাৎ 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ'—এই সত্য আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির পোষকতা বা প্রতিষ্ঠার জন্য কোন প্রকার সম্প্রদায় বা দল গঠন করার প্রয়োজন হয় না। সাধনার বিভিন্ন স্তরে এই সমস্ত বাদ আপনা হতেই হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়।

আমাদের মধ্যে কোনও বাদ বা ism, দল বা সম্প্রদায় নাই। আমরা কোন দলের মধ্যেই নাই। অথবা এমনও বলা যেতে পারে যে, আমরা সব দলের বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আছি। কোন দলের সঙ্গেই মিশতে আমাদের বাধা নাই। গোস্বামী প্রভু বলেছেন—"সেই অন্তবিহীন মহান পুরাণ পুরুষই আমাদের লক্ষ্য, অবিরাম সেইদিকেই আমরা চলব। সর্ব্বত্র আমরা নিমন্ত্রণ খাব, আনন্দ করব, বদ্ধ কোথাও হব না।"

অদ্বৈত তত্ত্বের তাৎপর্য গ্রহণ করা এত দুরূহ যে, এই মতবাদের দোহাই দিয়ে অনেক সময়েই মানুষ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়—সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করতেও কুণ্ঠিত হয় না। এক ব্যভিচারিণীকে তার সখীরা গঞ্জনা দিলে সে অদ্বৈত মতের নজির দেখিয়ে বলেছিল—'পতি এবং উপপতিতে যখন একই ব্রহ্ম বিরাজমান, তখন উভয়ের মধ্যে ভেদজ্ঞান করা নিতান্ত মূঢ়তার কাজ।' একজন গুরু তাঁর শিষ্যকে অদ্বৈত তত্ত্ব বোঝাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা পাগলা হাতী সেদিকে আসতে দেখে গুরু প্রাণভয়ে ছুটে পালালেন। হাতীটা অন্যদিকে চলে গেলে গুরু পুনরায় এসে যখন অদ্বৈত বেদান্তের উপদেশ সুরু করে দিলেন, তখন শিষ্য বিরক্ত হয়ে বললেন, "ঠাকুর! জগতের সবই যদি মিথ্যা, তবে পাগলা হাতীটা আসতে দেখে আপনি কেন পালালেন? হাতীটাও ত মিথ্যা।" কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে গুরু উত্তর করলেন—"বৎস আমার ঐ পালিয়ে যাওয়াটাও মিথ্যা এটাও মোটেই সত্য নয়।"

আমি যা নই, আমার উপর তা আরোপ করতে গিয়ে তোমরা আমাকেও লোকচক্ষে হেয় করবে, আর নিজেরাও একটা দল গঠন করতে গিয়ে নানারকম অনর্থের সৃষ্টি করবে। 'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা'—এর অর্থ জগতে আমরা যে সকল বৈচিত্র্য দেখি, সেইগুলোই মিথ্যা। কারণ সর্ব্বত্র ব্রহ্মই অবস্থিত। তিনি নাম রূপের অসংখ্য ছাপ স্বীয় অঙ্গে ধারণ করে

বিভিন্ন নামে পরিচিত এবং বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয় অথবা শুক্তিতে যেমন রজতভ্রম হয়, তেমনি ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রম হচ্ছে। সর্প-ভ্রম এবং জগৎ-ভ্রম তিরোহিত হলে সর্ব্বত্র ব্রহ্মই দৃষ্ট হন—জগৎ থাকে না। সাধনার কোন্ সুউচ্চ বেদীতে আরোহণ করলে জগদ্দর্শন তিরোহিত হয়, তা ধারণা করাও কঠিন। অথচ তোমরা একটা সম্প্রদায় গড়ে তুলে জগতের অস্তিত্ব বিলোপ করে দিয়ে ব্রহ্মকে তার শূন্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও। এটা যে কত বড় দুঃসাহসিকতা এবং মূঢ়তার কাজ, তা কল্পনা করাও অসম্ভব। জগতের সঙ্গে ব্যবহারিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তার ষোল আনা সুযোগ সুবিধা তোমরা গ্রহণ করবে, আর তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করবে না—তোমাদের এ তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ বা স্বরূপ কী তা বুঝে ওঠা আমার পক্ষে খুব দুরূহ। আমি বলি এক কাজ কর। দ্বৈত ও অদ্বৈত কোন বাদকেই নিরাশ না করে দুটোকেই তোমরা গ্রহণ কর। জগৎ মিথ্যা এ কথা ঠিক, কিন্তু এই মিথ্যা জগৎই সত্য হয়ে দাঁড়ায় যদি এর পশ্চাতে ব্রহ্মকে স্থাপন করা যায়। শূন্য যেমন শূন্য বা মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়—কতকগুলি শূন্য পাশাপাশি সাজালেও যেমন তাদের দ্বারা কোন সংখ্যা সূচিত হয় না, তেমন সমস্ত জগৎ যদি ব্রহ্ম হতে বিচ্যুত অবস্থায় অবস্থান করে, তবে জগৎ প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা হয়েই দাঁড়ায়। কিন্তু কতকগুলি শূন্যের পশ্চাতে যদি একটী 'এক'কে স্থাপন করা যায়, তবে যেমন শূন্যগুলি সব সার্থক হয়, এমন কি তারা একেরও মান বাড়িয়ে তোলে, তেমনি জগতের পশ্চাতে ব্রহ্মকে স্থাপন করলে সেই ব্রহ্মের আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে জগৎ সত্য হয়ে যায়—'তদেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি'। এইটাই তোমাদের পক্ষে সুগম পন্থা এবং এই পথই তোমাদিকে অনুসরণ করতে উপদেশ দি। জাগতিক প্রত্যেক বিষয়বস্তুর পশ্চাতে তোমরা

ভগবানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত কর, তাহলে মিথ্যা হয়েও জগৎ তোমাদের কাছে সত্যরূপে প্রতিফলিত হবে। শুধু তাই নয়। জগৎটা তোমাদের চোখে তখন মনে হবে মঙ্গলের লীলাক্ষেত্র—সৌন্দর্য্যের বিলাস-ভূমি। অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা না হয়ে তখন হবে 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'।

আজ এই পর্য্যন্ত। আশা করি সকলে কুশলে আছ।

(ত্রিহুতের জনৈক সাধুকে লিখিত)

(প্রথম)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ ভুবনেশ্বর

৩।৯'৫২

বাসুদেবেষু—

জ্ঞান ও ভক্তি এই দুইয়ের মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান-মার্গ না ভক্তি-মার্গ, এবং কোনটা তোমার অবলম্বনীয় জিজ্ঞাসা করেছ। আমি বলি দুইই শ্রেষ্ঠ, দুইই গুরু। কেউ নিকৃষ্ট বা লঘু নয়; কাজেই উভয়কেই অবলম্বন করতে হবে, কাউকে ত্যাগ করা চলবে না। আরও ঠিকভাবে বললে বলতে হয়—দুইই এক। আপাতদৃষ্টিতে জ্ঞান আর ভক্তিতে পার্থক্য আছে বলে মনে হলেও, তথাকথিত জ্ঞানী এবং ভক্তের মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ থাকলেও, প্রকৃত জ্ঞানী বা প্রকৃত ভক্তের দৃষ্টিতে এ দুটোর মধ্যে নামের ভেদ ছাড়া আর কোন প্রভেদ নাই। পাখীর দুটী পক্ষের যেমন কোন পার্থক্য নাই—উভয় পক্ষকে আশ্রয় করে

সে গন্তব্য স্থানে উড়ে যায় বলে দুইয়ের মধ্যে কারও গুরুত্ব যেমন কম নয়, তেমনি জ্ঞান আর ভক্তি দুইই এক বস্তু। উভয়কে অবলম্বন করে ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যস্থানে যেতে হবে। জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যে কোন বিরোধ নাই, এটা বুঝতে হলে দুটোরই স্বরূপ-বোধ থাকা প্রয়োজন। আমরা সাধারণতঃ মনে করি, ভগবানের নাম স্মরণ কীর্ত্তন অথবা সেবাপূজা বা নানাপ্রকার ভাব প্রভৃতিকে আশ্রয় করে যারা ভগবানকে লাভ করতে চায় তারাই ভক্ত—আর এ সবগুলোর উপর গুরুত্ব অর্পণ না করে যারা বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে ব্রহ্মলাভের প্রয়াসী হয় তারাই জ্ঞানী। ভক্তেরা যে ভগবানকে পাবার প্রয়াসী তিনি সাকার, সসীম। তাঁরা বলেন, ভগবান অব্যক্ত বা অসীম হলেও ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য সসীম বা সাকার রূপ ধারণ করেন। তাঁরা ভগবানের নানাবিধ মূর্ত্তি গড়ে তাঁর সেবাপূজা করেন এই ধারণায় যে সেই মূর্ত্তির মধ্যে ভগবান আবির্ভূত বা আবিষ্ট হয়ে তাঁদিকে কৃপা করবেন। জ্ঞানীরা কিন্তু ভগবানের সাকার মূর্ত্তিতে বিশ্বাসী নন বলে তাঁরা স্থুলভাবে ভগবানের সেবা পূজা প্রভৃতিতে আস্থাহীন। জ্ঞানী বলেন, জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ; অতএব তাঁরা সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অব্যক্ত বস্তুকে জানতে এবং বুঝতে চান জ্ঞানের আলোকে। আমরা সাধারণতঃ যাকে ভক্তি বলি, ভগবানের জন্য সাধারণতঃ যে সকল ভাব, অশ্রু, নৃত্য, গীত প্রভৃতির ছড়াছড়ি যেখানে সেখানে আমরা দেখতে পাই, সেগুলো মোটেই ভক্তি নয়। ভক্তি জ্ঞানেরই অভিব্যক্তি। ভগবানের স্বরূপ-বোধ যখন আমাদের অন্তরে প্রতিফলিত হয়, তাঁর অনন্ত গুণ, অনন্ত ঐশ্বর্য্য বিষয়ে একটা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি যখন আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়, তখন তাঁর প্রতি ভক্তি আমাদের মধ্যে স্বতঃই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এই ভক্তিটা আতিশয্য বশতঃ যখন বাইরে উপচিত হয়, তখন অশ্রু, পুলক প্রভৃতি বিবিধ ভাবের অভিব্যক্তি ভক্তগণের মধ্যে প্রকাশিত হয়। অন্তঃকরণে যদি হাসি বা কান্নার উদয় না হয়, তবে বাইরে হাসি বা কান্নার

ভাব ফুটিয়ে তোলা যেমন কপটতা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না, তেমনি জ্ঞান বৈরাগ্য ব্যতীত যে ভক্তি সচরাচর আমরা পথে ঘাটে দেখতে পাই, তাও ভক্তি নয়। এই ভক্তির অন্তরালে থাকে ভোগ-বাসনা এবং ভোগের অন্তরায় উপস্থিত হলেই ভক্তিও নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হয়।

অনেকের ধারণা জ্ঞান ভক্তির পরিপন্থী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে হৃদয় ভাবভক্তিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে, কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়ামাত্র সে ভক্তি ব্যাহত হয়ে যায়। যে ভক্তি বা আনন্দের উৎস অন্তঃকরণকে সরস করে তুলেছিল, জ্ঞান-সূর্য্যের প্রখরতায় তা শুকিয়ে যায়। আকাশে রামধনু দর্শন করে অন্তঃকরণে একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। সৃষ্টি যাঁর এত সুন্দর সেই সৃষ্টিকর্ত্তা না জানি আরও কত সুন্দর, এই ভেবে স্বতঃই তাঁর চরণোদ্দেশে মস্তক অবনত হয়। কিন্তু যখন ঐ রামধনুর বিষয়ে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা আমাদের জ্ঞানের দুয়ার খুলে দেওয়া হয়, তখন আর রামধনুর উপর আমাদের আগেকার মত শ্রদ্ধা থাকে না, রামধনুর সৌন্দর্য্য আমাদের মধ্যে যে ভাবভক্তি জাগিয়ে তুলেছিল, তা সহসা অন্তর্হিত হয়ে যায়। কিন্তু এই প্রকার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক এই জন্য যে রামধনুর প্রকৃতি-বিজ্ঞানে বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় তার উৎপত্তি বিষয়ে যে কারণ নির্দ্দেশ করা হয়, সেটা জগৎ-কারণ ভগবানকে বাদ দিয়ে করা হয় বলে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। রামধনুর প্রকৃত ব্যাখ্যা এই যে উহা ভগবানেরই স্বরূপ। স্বয়ং ভগবান ঐ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। রামধনু সম্বন্ধে এই যে জ্ঞান, এইটাই প্রকৃত জ্ঞান। আসল জ্ঞান তাকেই বলে যার দ্বারা সমগ্র বিশ্ব বা বিশ্বের তাবৎ বিষয়বস্তুই ব্রহ্মে অবস্থিত এবং জগতের প্রত্যেক বিষয় বস্তুতে ব্রহ্ম অবস্থিত বা জাগতিক প্রত্যেক বিষয়বস্তুই ভগবান— এই বোধ জন্মে। এই বোধ বা জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থায় ভক্তি স্বতঃই হৃদয়ে একটা আনন্দের প্রস্রবণ জাগিয়ে তোলে এবং তখন জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য নির্দ্দেশ দুরূহ হয়ে ওঠে। দুটোই এক হয়ে যায়।

জ্ঞান ও ভক্তি দুইই আশ্রয় করতে হবে। যারা মনে করে জ্ঞানের ফাঁদে পা না দিয়ে ভক্তির ধ্বজা উড়িয়ে ভবনদী পার হয়ে যাবে, তারা যেমন ভ্রান্ত, যারা ভক্তির ছায়া না মাড়িয়ে জ্ঞানের বাতি জ্বেলেই ব্রহ্মলোকে যাওয়ার আশা করে, তারাও তেমনি ভ্রান্ত। একটা ছাড়া আর একটা পরিপক্কতা লাভ করতেই পারে না। যেখানে একটা আছে দেখবে, সেখানে আর একটাকে থাকতেই হবে। যদি কোথাও দেখতে পাও যে জ্ঞান আছে অথচ ভক্তি নাই, তবে বুঝতে হবে যে সে জ্ঞান জ্ঞানই নয়। আবাব যদি কোথাও জ্ঞানহীন ভক্তি তোমার দৃষ্টিপথে আসে, তবে বুঝতে হবে সে ভক্তিও ভক্তি নয়।

জ্ঞানী চান ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য, বিভূতি প্রভৃতি তত্ত্ব অবগত হয়ে বিস্ময়বিমুগ্ধ এবং তন্ময় হয়ে থাকতে। কিন্তু ভক্ত চান সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁকে উপভোগ করতে। জ্ঞানী আর ভক্তের বিরোধের কারণ সাধারণতঃ এই যে, জ্ঞানী যে অব্যক্ত ভগবানের একটা নিশ্চয়াত্মিকা আস্তিক্য বুদ্ধি হৃদয়ে ফুটিয়ে তুলে, তাতেই বিভোর এবং পরিতৃপ্ত হয়ে থাকেন, ভক্ত সেটাকে মোটেই আমল দেন না। এতে আনন্দ বা রসের অনুভূতি নাই ভেবে এই জ্ঞানের যে একটা বিশেষত্ব আছে তা তাঁরা স্বীকার করতে চান না ; আর ভক্ত ভগবানকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপে উপভোগ করতে পারা যায় বলে যে দাবী করেন, জ্ঞানী সেটা বুজরুকী ছাড়া অন্য কিছু বলে ধারণা করতে পারেন না। জ্ঞানী এবং ভক্ত দুজনেরই দাবী যে সঙ্গত, নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী দুজনেই যে পরম বস্তু লাভ করে ধন্য হন, এইটা না মেনে পরস্পর পরস্পরকে যে আক্রমণ করেন তা'তে ধর্ম্মজগতে নানা প্রকার অনর্থের সৃষ্টি হয়ে থাকে। উভয়কেই পরমত-সহিষ্ণু হতে হবে। একজনকে অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে। কারণ দুটো মতই খুব সারবান, দুটোই খুব উচ্চ, কেউ তুচ্ছ নয়।

এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথাই বলা যেতে পারে। সময় এবং সুযোগ হলে পরে তা বলতে পারি।

আজ এই পর্য্যন্ত। সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

(স্কটল্যাণ্ডে শিক্ষারত জনৈক রাষ্ট্রীয় সেবক-সঙ্ঘের কর্ম্মীকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্‌

কলিকাতা

ইং ৫।১।৫২

বাসুদেবেষু—

তোমার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। কিন্তু পত্র পাওয়ার আগে থেকেই পেটের বেদনায় কাতর থাকায় পত্রের উত্তর দিতে দেরী হ'ল। আজ অনেকটা সুস্থ বোধ করায় প্রথমেই তোমার পত্রের উত্তর দিতে বসেছি।

এখান থেকে পাশ্চাত্ত্য দেশে গিয়ে অধিকাংশ ভারতীয় সেখানকার রীতিনীতি আচার-ব্যবহার খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির সঙ্গে নিজেদিকে অনায়াসে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, কারণ আগে থেকেই, অর্থাৎ এদেশে থাক্‌তেই তারা এখানকার সব কিছুর বিরুদ্ধে তাদের মনকে বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন করে তোলে। এই বিদ্রোহী মন নিয়ে যখন তারা ওদেশে যায়, তখন ওখানকার বহির্ম্মুখী সভ্যতার আলোকে তাদের চোখ ঝলসে যায়—ভালমন্দ বিচার না করে তারা অন্ধভাবে ওখানকার রীতিপদ্ধতিরই অনুকরণ করে চলে। ওখানে যাবার পরও ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে বিলাতী কায়দা মেনে চলা যে তোমার কাছে বিসদৃশ বলে

মনে হয়, তার কারণ এখানকার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বা কৃষ্টির প্রতি তুমি এমন একটা শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেছিলে যা ওখানকার বাহ্য সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাতেও ভেঙ্গে পড়ে নাই। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধেও ততটা বাঁধাবাঁধি সম্ভবপর না হলেও তুমি যে আমাদের নিষিদ্ধ বস্তুগুলো এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছ এটাও দেশ-মাতৃকার প্রতি তোমার একটা শ্রদ্ধারই পরিচয় দেয়। জাগতিক সব জিনিষের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে হয়। কিছুই ঘৃণ্য বা দ্বেষ্য নয়। এ হিসাবে ওদেশের রীতিনীতিকেও অবজ্ঞা করা চলে না। কিন্তু নিজেদের মাতা-পিতা বা আত্মীয়-স্বজনগণের সেবা না করে অন্তরে বিশ্বপ্রেম ফুটিয়ে তুলে অন্যান্য দেশের আচার-ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়ার আত্মঘাতী উদারতার অশোভন উন্মত্ততার মধ্যেও কপটতা বা হুজুগ ছাড়া অন্য কোন-কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। ওদের দেশের ভাল যা আছে, তা আমাদের নিতে কিছু বাধা নাই। দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। কিন্তু ওখান থেকে সব রকমের বীজ আমদানী করে এ দেশের মাটীতে বপন করে সুরম্য উদ্যান রচনার মূঢ় কল্পনা যারা পোষণ করে, তাদের চেষ্টা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ ওদেশের অধিকাংশ বীজই এ মাটীতে গজাবে না। গজালেও তা'তে বিষবৃক্ষই তৈরী হবে, আর বড় একটা কিছু হবে না। এখানকার মাটীতে গজায় জবা আর অপরাজিতার গাছ। তুলসীর বন আর বিল্বকাননের পক্ষেই এ মাটী সমধিক উপযোগী। এ মাটিতে যজ্ঞের বেদী আর দশভুজার পুণ্য প্রতিমা নির্ম্মিত হয়। এখানকার মাটীতে তৈরী হয় সুঠাম মৃদঙ্গ, হরি-সঙ্কীর্ত্তনের তালে তালে যা সুমধুর হয়ে বেজে ওঠে। এখানকার মাটীর উপর গড়ে ওঠে অসংখ্য দেবমন্দির যার মধ্যে ত্রিসন্ধ্যা শঙ্খঘণ্টা নিনাদিত হয়, প্রণব-মন্ত্র ধ্বনিত হয়। তোমার যে-সব বন্ধু ও-দেশের ভাবের বীজ আহরণ করে

এ দেশে এসে ছড়িয়ে দিয়ে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলার নেশায় বিভোর হয়ে আছে, সম্ভব হলে তাদিকে ডাক দিয়ে বলবে—'ওরে চল, তোরা ঘরে ফিরে চল।'

শুনতে পাই দেশ স্বাধীন হয়েছে। এ স্বাধীনতার অর্থ কিন্তু আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। শুধু Political Freedomই যদি এই স্বাধীনতার উদ্দেশ্য হয়, তবে এতে উপর তলার কতকগুলি বাবুর সুখ-সুবিধাই বেড়ে উঠবে—নীচের তলার অন্ধকূপে স্যাঁৎসেতে ঘরে পড়ে অনাহারে, অর্দ্ধাহারে অশ্রুমোচন করছে যারা, তাদের Economic salvation-এ স্বাধীনতা আসবে, তার কোন লক্ষণ এখনও পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। নেতাজী বলেছিলেন—"স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য স্বাধীনতা; শুধু ইহা রাষ্ট্রীয় বন্ধন মুক্তি নহে। ইহাতে প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী অর্থের সমান বিভাগ, জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ ও সাম্প্রদায়িকতা এবং গোঁড়ামী বর্জ্জন বোঝায়।"

জওহরলালজী বলেন—"আমাদের দেশবাসীর জন্য চাই খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আরও অনেক কিছু। জনসাধারণের এই প্রাথমিক প্রয়োজন না মিটিলে মনোজগৎ বা অধ্যাত্ম জীবনের কথা তাহাদের নিকট বলা অর্থহীন।"

সেদিন যাদবপুরে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের মুখে শুনলাম—"Our Governments, Central and the State, will be tested by the economic and industrial achievements. How far have we been able to overcome this crisis of under-production, under-employment, over-population and worsening poverty? How far are we able to give

food, clothing and shelter to 'the hungry, naked and shelterless millions ?"

যদিও ধরে নেওয়া যায় এই স্বাধীনতা আজ না হোক দু'দিন পরেও নীচের তলার লোকদিকে উপর তলায় উঠবার সুযোগ সুবিধা করে দেবে— তারাও উপর-তলার উন্মুক্ত আলো বাতাস উপভোগ করবার অধিকার লাভ করবে, তথাপি যে Cultural conquest দেশের বুকে এখনও জগদ্দল শিলার মত চেপে আছে, তা থেকে মুক্তিলাভ করার কোন চেষ্টাই দেশের নেতাদের তরফ থেকে দেখা যাচ্ছে না। বরং এটাকে কায়েম করে রাখাই দেশের পক্ষে কল্যাণকর বলে তাঁরা ঠিক করে নিয়েছেন। রাজনৈতিক পরাধীনতার চেয়ে এইটাই দেশের পক্ষে অধিকতর অনিষ্টকর এবং বিপজ্জনক বলে আমি মনে করি।

ভারতীয় কৃষ্টি বা সংস্কৃতির মধ্যেই তার প্রাণবস্তু বা আত্মা নিহিত আছে। এই কৃষ্টি বা সংস্কৃতিকে গলা টিপে মেরে ফেলার অর্থই হচ্ছে দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করা। গাছের মূলোৎপাটন করে তা'তে জল ঢাললে যেমন সে বাঁচতে পারে না, তেমনি ভারতীয় কৃষ্টি বা সংস্কৃতির বিনাশ সাধন করে তার প্রাণহীন দেহে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আর বিজাতীয় ভাবধারার জল সেচন করলেও তা বাঁচবে না। তথাপি আমাদের বাবুরা এ সব উপদেশকে বস্তাপচা বলে অবজ্ঞাভরে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেন। তাঁরা পশ্চিম থেকে আমদানী করা টাটকা ফলের সঞ্জীবনী সুধা দিয়ে দেশকে সজীব করে তুলতে চান। কিন্তু পশ্চিমের দেশ-সমূহের মধ্যেই কী চারিদিকে মৃত্যুর বিভীষিকা দিনের পর দিন ভয়াবহভাবে আত্ম-প্রকাশ করছে না? এ সব দেখে শুনেও এখনও যদি বাবুদের চৈতন্য না হয়, তবে তাদিকে নিদারুণ আঘাত খেতে হবে, যাতে তাদের নেশা কেটে স্বপ্ন ভেঙ্গে-চুরে যাবে আর তখন তারা পরিত্রাণের পথ খুঁজে বেড়াবে

পশ্চিমের জড়বাদের মধ্যে নয়—ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ এবং ঐতিহ্যের মধ্যে। তখন যে শুধু দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তিলাভ হবে তা নয়—তখন এমন একটা আলোক আমাদের দেশ থেকে দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হবে যার প্রভায় সমগ্র জগৎ মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। শুধু তখনই জগৎ বাঁচার মত বেঁচে উঠবে, আর এই নবজীবন লাভের মূল উৎস হবে ভারতবর্ষ—সমগ্র জগতের হৃৎপিণ্ড যার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

পাশ্চাত্য ভাবধারার প্লাবন যে শুধু আমাদের অনিষ্ট সাধন করেছে তা নয়, এতে যে দেশের কল্যাণও যথেষ্ট হয়েছে তা অস্বীকার করলে আমাদিকে অপরাধী হতে হবে। যে সমস্ত কুসংস্কার আমাদের জাতির মধ্যে বহুদিন ধরে পুঞ্জীভূত হয়ে তার অস্থিমজ্জাগত হয়েছিল, পশ্চিমের চিন্তাধারা সেগুলোকে অনেক পরিমাণে ভাসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে যে আমাদের ধর্ম্মকেও—যাকে অবলম্বন করে আমরা যুগ-যুগান্তরে ওলট-পালটের মধ্যেও এখনও বেঁচে আছি—ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করেছে, এইটাই আমাদের সমূহ আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্লাবন হতে জাতিকে রক্ষা করবার জন্য ঋষিকল্প অনেক মহাপুরুষ লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে যে সাধনে আত্মনিয়োগ করেছেন—সেই সাধনার দ্বারা আবার সনাতন ধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটবে, এ আশা আমার আছে। গলাবাজী করে নয়, দেশ-বিদেশে movement বা agitation-এর দ্বারা নয়—তাঁদের অধ্যাত্ম শক্তির দ্বারা সমস্ত বিশ্বে একটা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে মানুষের মনের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটবে এবং তার দ্বারাই সত্যধর্ম্মের আলোক আবার জগতে প্রকাশিত হবে।

কোন প্রকার কপটতার আশ্রয় গ্রহণ না করে অন্তরে যা কর্ত্তব্য বলে অনুভব করবে, সেই পথেই চলতে চেষ্টা করবে। কিছু ভেবো না। জগন্নাথ রথে উঠেছেন। এ রথ চলবেই। তার অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করার

অলীক কল্পনা যারা পোষণ করে, তাদের দলে না ভিড়ে রথের রজ্জু আকর্ষণ করে পুণ্য সঞ্চয় কর।

ঠাকুর তোমার আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন, মঙ্গল করুন।

(গলসীর জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ সিউড়ী

৩।৪।৫৫

বাসুদেবেষু—

কলিযুগে নামই যে প্রধান সাধন সকল শাস্ত্রই এ কথা একবাক্যে বলে গেছেন। কলিতে জীবের অন্নগত প্রাণ বলে সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি গভীরতর সাধনার সচরাচর অধিকার জন্মে না। তথাপি নাম-সাধনা যথাসম্ভব আন্তরিক হওয়া চাই অর্থাৎ বাহ্য ব্যাপার হ'লেও এর সঙ্গে অন্তরের সংযোগ চাই। নতুবা নাম-সাধনাতেও তেমন ফল পাওয়া যায় না। তা ছাড়া নাম-মহৌষধ আমাদের ভবব্যাধি দূরীকরণের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হলেও কতকগুলি অনুপান সহযোগে এই ঔষধ সেবন করা দরকার। এই অনুপানগুলি নামের শক্তিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কাজেই এগুলিকে তাচ্ছিল্য করে নাম সাধন করলে বহুল পরিমাণে তা ব্যর্থ হয়।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা—অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়া সদা হরিঃ"—এই ছিল গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আদেশ বা উপদেশ। এই উপদেশের

সারবত্তা ভাষায় প্রকাশ করবার উপায় নাই। যে ঘাসকে সকলে পদদলিত করে যায়, তার মত নীচ আর কিছু নাই, তার চেয়েও নীচ হতে হবে। যে গাছ তার ছেদনকারীকেও ছায়া প্রদান করতে কার্পণ্য করে না—যার মত সহিষ্ণু আর কেউ বা কিছু থাকতে পারে না, তার চেয়েও সহিষ্ণু হতে হবে, আর যে আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা অপমান করেছে তাকে পাল্টা অপমান করা অন্ততঃ তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক হলেও তাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে হবে ; এই প্রকার মনোবৃত্তি বা মনোভাব নিয়ে ভগবানের নাম করতে হবে। এ যে পারে তার নাম-সাধনাই সার্থক। হাজার যোগযাগ বা তপস্যাতেও এর মত ফললাভ করা সম্ভবপর হয় না। কারও কাছে মাথা নীচু করব না, কেউ এক কথা বললে তাকে উল্টে দশ কথা শুনিয়ে দেব, যে আমাকে অপমান করেছে সুযোগ পেলেই দশগুণ অসম্মানের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেব, তাকে পশুর মত অপমান করব—এই প্রকার প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি যাদের, দিবারাত্রি উচ্চ সংকীর্ত্তন করে গলা ফাটালেও অথবা বসে বসে নাম জপ করলেও তাদের পক্ষে নাম সাধনায় বেশীদূর অগ্রসর হওয়া দুরূহ হয়। নৌকাকে নঙ্গর করে রেখে তাকে খেয়া দিলে যেমন সে এগুতে পারে না, এও ঠিক তেমনি।

নাম মহৌষধী সেবনের জন্য যে সব অনুপানের কথা বলছিলাম, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এই শিক্ষাই সেই অনুপান। তিনি যে তিনটী বিষয়ের কথা উল্লেখ করে গেছেন, সেগুলিকে সংক্ষেপ করে এক কথায় বলা যেতে পারে—নাম সাধন করতে হ'লে দীনাতিদীন হতে হবে। একটা দীনতার ভাব হৃদয়ে ফুটিয়ে তুলতে না পারলে, দাম্ভিকতা বা অভিমান শূন্য হতে না পারলে ধর্ম্মলাভের সকল আশা সুদূরপরাহত হয়ে ওঠে। গোসাঁইজী বলতেন, ধর্ম্মের রাস্তা সকলের পায়ের তলা দিয়ে। বলা বাহুল্য, গোসাঁইজীর এই উক্তি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপদেশেরই প্রতিধ্বনি। 'সেবা বন্দনা আউর অধীনতা

সহজে মিলাওয়ে গোসাঁই'—কবীরজীর এই ভজনের মধ্যেও ঐ একই সুর ধ্বনিত হচ্ছে। একটা দীনতার ভাব নিয়ে যে ধর্ম্ম-সাধন বা নাম-সাধন করতে হবে, কাঙ্গাল না হতে পারলে যে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশের অধিকার নাই—এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই—থাকতেও পারে না।

একটা সুমহান আদর্শ যদি সদাসর্ব্বদা অন্তরে জাগরূক রাখা যায়, তবে দীনতার ভাব না এসেই পারে না। আদর্শ যার খুব উচ্চ—অনন্ত বা ভূমাই যার লক্ষ্য, সে সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য বিধিমত প্রয়াস করে, অন্য কোনদিকে তার লক্ষ্য থাকে না। লক্ষ্য বস্তুর উদ্দেশ্যে তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। 'তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে'—বলে সে তার ইষ্টদেবতার সেই ভূমা-বস্তুর চরণে লুটিয়ে পড়তে চায়। কাজেই তাঁর তুলনায় তাকে অতি তুচ্ছ বলেই মনে হয়। তিনি যেন সিন্ধু আর সে যেন বিন্দু—এই ভাবটাই তার মধ্যে প্রকট হয়, আর একটা দীনভাব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কিন্তু আদর্শ যার খুব নীচু তার, আর তার সেই আদর্শের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান আছে বলে সে মনে করতে পারে না। কাজেই সে নিজেকে তেমন ক্ষুদ্র বা অপূর্ণ বলেও ধারণা করতে পারে না। এই কারণে দীনতার পরিবর্ত্তে তার মধ্যে একটা অহমিকার ভাবই ফুটে উঠতে দেখা যায়।

একটা খুব ক্ষুদ্র আদর্শকে সম্মুখে ধরে রেখে তিনদিন না যেতেই সেই আদর্শে পৌঁছে অথবা তার কাছাকাছি গিয়ে একটা দাম্ভিকসর্ব্বস্ব জীবে পরিণত হয়ে কোন লাভ নাই। যেখানেই অভিমান, বা দাম্ভিকতা মানুষের মধ্যে প্রকট হয়ে একটা আত্মপ্রসাদ জাগিয়ে তোলে, বুঝবে অন্তর তার অতি দীন, অল্পে সে সুখী—সে যা পেয়েছে বা লাভ করেছে—তার কল্পনা তার চেয়ে খুব বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না বলেই সে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। অপরপক্ষে কল্পনা যার অভ্রভেদী—'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি'—ভেবে জাগতিক ভোগ সুখকে সে তুচ্ছ বলে মনে করে—ঐশ্বর্য্যের মধ্যে

থেকেও সে নিজেকে অতি দীন বলে ধারণা করে। কিন্তু বাস্তবতঃ দীন হলেও অন্তরে সে ধনী, কারণ যে পরম ঐশ্বর্য্য বা পরম ধন লাভের আকাঙ্ক্ষায় সে ছুটছে, তার তুলনায় পার্থিব ঐশ্বর্য্য তার কাছে তুচ্ছ। আর এ ঐশ্বর্য্য সে তুচ্ছ করতে পেরেছে তার কারণ, পরম ধন লাভে সে অক্ষম হলেও অন্তরে তার আভাস সে পেয়েছে।

ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে কত কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মানুষ কতটুকু? এই বিষয়টা একবার ধীরভাবে চিন্তা করলে মানুষের অহঙ্কার করার কিছু থাকে না। তা ছাড়া মানুষের মধ্যেও আমাদের চেয়ে সর্ব্ববিষয়ে গরীয়ান কত মানুষ এই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করছে তারই বা সংখ্যা কে করে? এ অবস্থায় মানুষ—তা সে যত বড়ই হোক—যে অতি দীন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে কি? যারা কূপমণ্ডুক, ব্রহ্মাণ্ডের বিশালত্ব যাদের অনুভবের মধ্যে আসে না, তারাই তাদের মহত্ত্বের অলীক-কল্পনা মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, আর এক একটী মূর্ত্তিমান অহঙ্কাররূপে সদর্পে জগতের বুকে চলা-ফেরা করতে যায়। কিন্তু এদের অহঙ্কার চূর্ণ করবার জন্য ভগবানের শাসন-দণ্ড সর্ব্বদাই উদ্যত হয়ে আছে। বিশেষতঃ ধর্ম্মের অভিমান তিনি মোটেই সহ্য করতে পারেন না। দাম্ভিকতার কাঠামো খাড়া রেখে কেউ তার উপর ধর্ম্মের ধ্বজা তুলে ধরবে—ভগবান তা মোটেই বরদাস্ত করেন না। আঘাতের পর আঘাত করে তিনি তার কাঠামো চূর্ণ করে দেন, তার ধর্ম্মের ধ্বজাও ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

নাম জপের সার্থকতা কি? নামের দ্বারা নামীকে আকর্ষণ করবার জন্যই নাম জপের বিধি। নামকারীর যদি একটা দীনতার ভাব না থাকে, তবে সে আকর্ষণে একটা জোর পায় না—নিজেকে সে যত ক্ষুদ্র বা কাঙ্গাল বলে মনে করবে, ততই অভীষ্ট লাভের জন্য তার প্রাণে একটা ব্যাকুলতা

জেগে উঠবে ; আর এই ব্যাকুলতাই তার নাম-সাধনাকে শক্তিশালী করে তুলবে। কিন্তু নিজেকে যে দীন বলে ভাবতে পারে না, ব্রহ্মবস্তুর অভাব-বোধ যে তার প্রাণে জাগে নাই এটা স্বতঃসিদ্ধ। তার পক্ষে নাম-সাধনা অনেকটা সখের বস্তু। কাজেই এ সাধনায় একটা ব্যাকুলতার ভাব জাগরিত হওয়া সম্ভবপর নয়। এই কারণে নাম-সাধনায় সে তেমন জোর বা উপকার পায় না।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপরোক্ত শিক্ষা ঠাকুর শ্রীশ্রীকুলদানন্দজীর জীবনে এমন নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হ'তে দেখেছি, যা ভাবলে আজও শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। এত দীনতা, এত সহিষ্ণুতা এ জীবনে আর কারও মধ্যে কখনও দেখি নাই। তাঁর অপমানকারীদিকে অকুণ্ঠচিত্তে সম্মান প্রদর্শন করার তেমন অভাবনীয় দৃষ্টান্তও আর কখনও চোখে পড়ে নাই। কিন্তু সে সব কথার পরিচয় দেওয়ার স্থান এখানে হওয়া সম্ভবপর নয়। সুযোগমত তাঁর পাবন-লীলাকাহিনী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের চেষ্টা করে জীবন ধন্য করব। নতুবা হয়ত তার পুণ্য স্মৃতি অন্তরে ধারণ করেই এ জীবন শেষ করতে হবে।

ঠাকুর কল্যাণ করুন।

(হাবড়ার জনৈক দেশকর্ম্মী শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ সদ্‌গুরু নিবাস

(প্রথম) ভুবনেশ্বর

৫।১১।৫৫

বাসুদেবেষু—

অযাচিতভাবে একটা নিরাশ্রয় পরিবারের ভার গ্রহণ করে এবং আপাততঃ তাকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচিয়ে তুমি যে একটি মহান আদর্শ স্থাপন করেছ,

সে বিষয়ে সন্দেহ কি? জগতে কিছুই স্থির নয়। কাজেই পরিবারটিকে যে অবস্থায় তুমি এনে তুলেছ তা কতদিন স্থায়ী হবে তা বলা খুব কঠিন। তথাপি ভগবৎ প্রেরিত হয়েই তুমি যেন ঐ পরিবারটির উদ্ধারকল্পে এসেছিলে এবং তোমার সমগ্র সাধন-শক্তি তার পরিত্রাণের জন্য নিয়োগ করেছিলে। নতুবা অধঃপতনের সুগভীর গহ্বর থেকে সে যে আজ গৌরবের উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, তা কোনক্রমেই সম্ভবপর হ'ত না। সমস্ত বিষয়টা গভীরভাবে চিন্তা করলে একে ভোজবাজী ছাড়া অপর কোন আখ্যা দেওয়া চলে না।

তথাপি এর মধ্যে একটা 'কিন্তু' আছে। এই ব্যাপারে তুমি ঐ পরিবারের সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়েছ যে অপরের পরিত্রাণের পথ প্রস্তুত করলেও তোমার নিজের পক্ষে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাওয়া অতঃপর কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কথায় বলে 'পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।' ব্রহ্ম তাঁর নিজের হাতে গড়া প্রকৃতির সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত হয়ে পড়েন যে, তাঁর নিজের পক্ষেই নিষ্কৃতি পাওয়া সুদূরপরাহত হয়ে ওঠে। মানুষ ত দূরের কথা। যে পরিবারটির ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে যাবার সমূহ আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, সেটির সম্বন্ধে যদিও কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া চলে, তবুও আমাকে তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিত করে তুলেছে। এ কথা তোমাকে জানিয়ে দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করছি বলেই এই পত্রের অবতারণা।

এই চিঠিখানার দ্বারা তোমার আত্মপ্রসাদ ব্যাহত হতে পারে জেনেও কর্ত্তব্যবোধে কয়েকটা সত্য তোমার কাছে প্রকাশ করতে হচ্ছে। একটা পরিবারকে বাঁচিয়ে দিয়ে সাধারণের নিকট তুমি বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছ। আমার কাছেও তুমি এজন্য সমধিক প্রশংসার পাত্র। কিন্তু এই বাঁচিয়ে দেওয়াটাই কতখানি সত্য, এ বিষয়ে নানা কারণে কিছুদিন যাবৎ আমার মনে একটা সংশয় জেগেছে। সৃষ্টির মধ্যেই যেমন ধ্বংসের

বীজ লুকায়িত থাকে তেমনি আমার আশঙ্কা হয় তোমার এই বিস্ময়কর সাফল্যের মধ্যেই একটা বিফলতার গ্লানি, আজ না হোক অদূর ভবিষ্যতে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করবে, যখন তোমার সৃষ্টির মোহ ছুটে যাবে; যখন তুমি স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে এতকাল তুমি ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করেছ। শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশ যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল তা তোমার অজানা নাই। শ্রীরামচন্দ্রের লীলাবসানের সঙ্গে সঙ্গে রামরাজ্যের রাজধানী অযোধ্যা নগরীর যে দুর্দ্দশা হয়েছিল, তার কথা চিন্তা করলে আজও আমাদের হৃদয় শোকদুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কাজেই তুমি সঞ্জীবনী সুধার দ্বারা যে পরিবারটিকে পুনরুজ্জীবিত করেছ, সেটির সম্বন্ধে বেশী আশা পোষণ করতে না পারলে সেটা খুব যে অপরাধের কাজ হবে বলে মনে করি না।

ঐ সংসারের উদ্ধারকল্পে তোমার যে অনন্যসাধারণ শক্তি ব্যয়িত হয়েছে, সে কথা গণনার মধ্যে না এনে, তার কোন মর্য্যাদা না দিয়ে—সংসারের সকলে না হোক, অন্ততঃ দু' একজন সেটাকে উল্টে তোমার দুর্ব্বলতা বলেই মনে করবে। তাদের প্রতি তোমার স্নেহ মমতার সুযো[illegible] নিয়ে তারা এমন অটল ভাবে তোমার স্কন্ধে তাদের আসন কায়েম কর[illegible] চেষ্টা করবে যে তোমার মেরুদণ্ড চূর্ণ হ'বার উপক্রম হ'বে। তুমি স্থির ক[illegible] রেখেছ যে তাদিকে একটা নিরাপদ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে তু[illegible] সরে পড়বে এবং নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করবে। ঠাকুরের চেয়ে নিরাপ[illegible] ভূমি বা অবলম্বন আর কিছু হতে পারে না। তাঁরই উপর ঐ পরিবারটি[illegible] ভার ন্যস্ত করে তোমাকে দূরে থাকতে হবে। নতুবা তুমি যে সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করছ, তা হয়ত কোনকালেই পাবে না। কারণ যাদিকে তুমি মানুষ করে তুলেছ বা তুলবে বলে ঠিক করে রেখেছ, সবিস্ময়ে দেখবে তারা তোমার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে, তোমার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা পর্য্যুদস্ত করে বিপথগামী হয়ে পড়ছে। একটির পর একটি পাথর গেঁথে তুমি যে সুরম্য

হর্ম্য নির্ম্মাণ করে তুলেছ, তা সমাপ্ত করার পরিবর্তে তারা নিদারুণ আঘাতে তাকে ভেঙ্গে ফেলছে, আর সে আঘাত তোমারই প্রাণে সবচেয়ে বেশী লাগবে। তোমার সাজান সংসার তথা তোমার হৃদয় এই আঘাতে ভূমিসাৎ হয়ে যাবে, এ যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আর এই জন্যই এখান থেকে আমি সাবধান বাণী উচ্চারণ করছি। আর অধিকদূর অগ্রসর না হয়ে এবার সরে পড়। যদিও এই প্রকারে অনাসক্তভাবে অবস্থান করলেও তোমার একটা কর্ত্তব্য থেকে যাবে।

ভগবান মাঝে মাঝে সশরীরে সংসারে মানব সমাজের মধ্যে আবির্ভূত হন। মানুষকে কর্ম্মে প্রেরণা প্রদান করবার জন্য, সংসারে শান্তির মলয়ানিল প্রবাহিত করবার জন্য। সর্ব্বোপরি জগতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি তাঁর লীলা প্রকট করেন। কিন্তু সফলতার গৌরবের সঙ্গে বিফলতার গ্লানিও তাঁকে অনেকখানি বরণ করে নিতে হয়। অবশেষে সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি দুইয়েরই পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লী বেঁধে ধরাধাম হতে তাঁকে বিদায় গ্রহণ করতে য়। তবু তাঁর হাতে গড়া সংসারকে তিনি ভুলতে পারেন না। সংসারেরই ানাচে কানাচে অলক্ষ্যভাবে তিনি বেড়ান, নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে, প্রতিটি বিষয়বস্তুতে। প্রকটাবস্থায় তাঁর প্রীতি ভালবাসা এবং স্নেহ মমতার সুযোগ গ্রহণ করে যারা সংসারে যথেচ্ছাচারিতার প্লাবন নিয়ে আসে, তাঁর অপ্রকট কালে তারা তাঁকে না পেয়ে নিজেদের সংস্কার ও বুদ্ধিমত চলতে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খায়। এই অবস্থায় নিজেকে অপ্রকাশ রেখেও তিনি তাদিকে কখনও রক্ষা করেন, কখনও বা ধ্বংস করেন। কিন্তু এই যে ধ্বংস এটা রক্ষা বা সৃষ্টিরই পূর্ব্বরূপ। ধ্বংসের মধ্যেই তিনি নূতন সৃষ্টির বীজ বপন করেন।

তোমাকেও এইভাবে ঐ পরিবারটি থেকে সরে পড়ে দূরে থাকতে বলছি। যাকে এতদিন রক্ষণাবেক্ষণ করে তুমি পুষ্ট করে তুলেছ, তার

মূলোচ্ছেদ করবার জন্য নয়, তার অধিকতর পুষ্টি সাধনের জন্য। প্রত্যক্ষভাবে জলসেচনের পরিবর্তে এবার অলক্ষ্যে থেকে পরোক্ষভাবে একে সাহায্য প্রদানের প্রয়োজন হয়েছে এটির কল্যাণ সাধনেরই জন্য। সংসারকে রক্ষা করার জন্য ভগবান যে পন্থা অবলম্বন করেন, ঐ পরিবারটিকে রক্ষা করবার জন্য ঠিক সেই পন্থাই তোমাকে অবলম্বন করতে হবে। তোমাকে গা' ঢাকা দিতে হ'বে। অন্ততঃ পরিবারটির সঙ্গে তোমার সমস্ত বাহ্য সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছ, এই প্রকার ভান করে দূরে অবস্থান করে সেখান থেকেই এটিকে পরিচালনা করতে হবে। এ কার্য্যে তুমি নিজেকে অক্ষম ব'লে মনে করতে পার, কিন্তু আমি তা মনে করি না। যদিও ঐ পরিবার তোমার রক্ত শোষণ করে তোমাকে অনেকখানি শক্তিহীন করে তুলেছে, তথাপি এখনও তোমার যে শক্তি অবশিষ্ট রয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি, তা'তে ওটিকে এইভাবে রক্ষা করা হয়ত তোমার পক্ষে দুরূহ হবে না। আমার উপদেশ গ্রহণ করবে কি না জানি না। কিন্তু এই পন্থাই এখন থেকে শুধু তোমার কল্যাণের জন্য নয়, ঐ পরিবারটির কল্যাণের জন্যও তোমার অবলম্বনীয় বলে আমি মনে করি।

বেশী বাড়াবাড়ি কোন কাজে ভাল নয়। তোমার কতকগুলি কাজ বাকি ছিল বলেই ঠাকুর তোমাকে দিয়ে এই কাজ করিয়ে নিলেন। কিন্তু এতে তোমাকে চিরকাল আবদ্ধ করে রাখবেন, বা তুমি আজীবন ঐ সংসারটির সঙ্গে বাঁধা পড়ে থাকবে, এ তাঁর ইচ্ছা নয়—হ'তেও পারে না। এতদিন যিনি মায়াজাল বিস্তার করে তোমাকে সংসারে আটকে রেখেছিলেন, এখন তিনিই আবার মুক্তির বাঁশী বাজাচ্ছেন—কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলেই শুনতে পাবে। অতএব এবার বেরিয়ে পড়ার আয়োজন কর।

আমি একই ভাবে আছি। তোমাদের মঙ্গল কামনা করি।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্‌ সদ্‌গুরু নিবাস

(দ্বিতীয়) ভুবনেশ্বর

১৭।১।৫৬

বাসুদেবেষু—

আমার আগেকার পত্রখানায় তোমার এবং তোমার আশ্রিত পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করেছিলাম, ইতিমধ্যেই তার সূচনার আভাস পেতে সুরু করেছ এবং আমার চিঠিখানা তোমাকে সজাগ করে তুলেছে জেনে সুখী হওয়ার সঙ্গে একটা গভীর দুঃখও আমাকে বিচলিত করে তুলেছে। সংসারের রীতিই ত এই। এখানে উপকারীকে তার কৃত উপকারের প্রতিদানের কোন প্রশ্ন নাই। কৃতজ্ঞতার কোন বালাই এখানে নাই। বরং তৎপরিবর্ত্তে আছে একটা হৃদয়হীন কৃতঘ্নতা। যাকে আশ্রয় করে কেউ উঠেছে, সেই আশ্রয়বৃক্ষের মূলোচ্ছেদই তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, যদিও এতে শুধু আশ্রয়-বৃক্ষ নয়, তার নিজেরও অধঃপতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। যাই হোক, এ বিষয়ে অনুশোচনা করে লাভ নাই। তোমার অন্তর থেকে এবং আমার চিঠিখানায় যে আলোক তুমি পেয়েছ, তার সাহায্যে তুমি তোমার পথ ঠিক করে নাও এবং এখন থেকে সেই পথই অবলম্বন কর। সংসারে কিছুই বিনা প্রয়োজনে সংঘটিত হয় না। এতদিন তুমি যে ঐ সংসারে আসক্ত হয়ে পড়েছিলে, তারও প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট। এতে তোমার কর্ম্ম বহুল পরিমাণে ক্ষয় হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিবারও অন্ততঃ সাময়িকভাবে বেঁচে গেল। এখন যদি তারা নিজেদের ভাগ্যদোষে আপনাদেরই সর্ব্বনাশ সাধন করতে প্রবৃত্ত হয়, তবে আর উপায় কি? অপরাধী তার দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করবে,

এ তো ভগবানেরই বিধান। সে বিধান তোমার বা আমার দ্বারা পাল্টে যাবে, তা সম্ভবপর নয় এবং ভগবানের উদ্দেশ্যও তা নয়।

প্রসঙ্গতঃ ভগবানের জগতে আবির্ভূত হওয়া সম্বন্ধে আমি যা লিখেছিলাম, তা'তে সন্দেহ প্রকাশ করেছ এবং তিনি লোকশিক্ষা বা ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য সশরীরে জগতে জন্মগ্রহণ করেন, এ কথা আমি সত্যই বিশ্বাস করি কিনা, জিজ্ঞাসা করেছ। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কোন প্রশ্ন এখানে ওঠে না। জগদ্‌বরেণ্য অনেক মহাপুরুষই ভগবানের ভূতলে আবির্ভাবের কথা বিশ্বাস করেছেন। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ গীতাও তাঁর অবতার গ্রহণের কথা স্বীকার করেন, যদিও জ্ঞানবাদীরা নিজেদের প্রয়োজনে গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ঐ ক'টি শ্লোককে মোচড় দিয়ে অন্য প্রকার ভাষ্য রচনা করেন। তাঁরা বলেন, যখনই পৃথিবীতে স্বাভাবিক ধর্ম্মের হানি এবং অস্বাভাবিকতার আবির্ভাব হয়, তখনই ভগবান তাঁর অঘটন-ঘটন পটীয়সী শক্তির দ্বারা প্রাকৃতিক ক্রিয়ার প্রবর্ত্তন করেন। সাধুদের রক্ষা, দুষ্টগণের দমন এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য সর্ব্বদাই তিনি প্রকাশিত আছেন।

অবতারবাদে যাঁরা অবিশ্বাসী তাঁরা বলেন, ভগবান স্থূল দেহ ধারণ না করেও স্বীয় ঈপ্সিত কর্ম্ম অনায়াসে সম্পন্ন করতে পারেন, এজন্য তাঁর মর্ত্ত্যলীলার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই প্রকার মতবাদীরা ভুলে যান যে তাঁর কাছে প্রয়োজন অপ্রয়োজনের কোন প্রশ্ন নাই—তিনি তাঁদের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করে তাদের বুদ্ধিমত চলেন না, চলতে বাধ্য নন। যে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত জ্ঞানবাদীদের প্রধান উপজীব্য, তারই একটা সূত্র হচ্ছে—"লোকবর্ত্তু লীলাকৈবল্যম্"—শিশু যেমন বিনা প্রয়োজনে খেলা করে, ব্রহ্মও তেমনি কোন প্রয়োজন না থাকলেও সংসারে লীলা প্রকট করেন। মানুষের মধ্যে এসে নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে তাদের সঙ্গে

তিনি মিশে যান। মানুষেরই মত অপূর্ণতা এবং দুর্ব্বলতা তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায়। এ সব কথা অনেকের কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি মানুষের ভূমিকা গ্রহণ করে অভিনয় করতে এসেছেন বলে তারই মত আচরণ করবেন। এটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নাই, বরং এটাই স্বাভাবিক। সেই বহুরূপীর গল্প স্মরণ কর।

একজন লোক বহুরূপী সেজে নিত্য নূতন সাজে জমিদার বাড়ীতে অভিনয় দেখাতে যেত। একদিন সাধুর বেশ ধারণ করে সে এমন সুন্দর এবং নিখুঁত অভিনয় করেছিল যে জমিদারবাবু তার অভিনয়নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে একটা মোটা রকমের পুরস্কার দিতে গেলেন। কিন্তু সাধু-বেশধারী ঐ লোকটা অবজ্ঞাভরে সেই পুরস্কার দূরে ফেলে দিয়ে চলে গেল। জমিদারবাবু এতে যথেষ্ট অপমান বোধ করলেন। কিন্তু লোকটিকে কিছু বললেন না। ঐ লোকটি যে সব অভিনয় দেখিয়েছিল তার জন্য বকশিশ প্রার্থী হয়ে পরদিন জমিদার বাবুর কাছে এসে হাজির হ'ল। সক্রোধে তিনি বললেন—"কাল তোমাকে পুরস্কার দিতে গেলাম, তুমি আমায় অপমান করে তা ফেলে দিয়ে চলে গেলে; আজ আবার কোন্ মুখে তুমি বকশিশ চাইতে এসেছো?" এই বলে জমিদারবাবু তাকে বাড়ীর বাইরে তাড়িয়ে দিতে হুকুম দিলেন। সবিনয়ে লোকটি বললে—"রাগ করবেন না বাবু, একটা কথা বিবেচনা করুন। সাধুদের টাকা-পয়সা বা অন্যান্য আর্থিক ঐশ্বর্য্যের প্রতি একটা অনাসক্তির ভাব বা বৈরাগ্য থাকবেই। এ সব তাঁরা অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ করেন। আমি সাধুর অভিনয় করেছিলাম। কাজেই কোন প্রকার পুরস্কারে প্রলুব্ধ হওয়া সে সময়ে আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এই কারণে আপনার পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে আমি সাধুর মত আচরণই করেছিলাম। আমার অবস্থা বুঝে আমাকে ক্ষমা করুন।" জমিদার পুঙ্গব তার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে প্রচুর পুরস্কার দিয়ে বিদায় দিলেন।

কাজেই ভগবান নরলীলা করতে এসে যে সর্ব্বপ্রকারে সাধারণ মানুষের মতই আচরণ করবেন, এতে বিস্মিত হ'বার কিছু নাই। তাঁকে যাদের সঙ্গে চলাফেরা করতে হবে, নিজেকে তাদের চেয়ে একটা উচ্চতর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে বা কতকগুলো অলৌকিক কাজ করে তাদিকে আলাদা করে রাখার উদ্দেশ্যে তিনি তাদের মধ্যে অবতরণ করেন না। তাদেরই পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে তাদের সঙ্গে এমন বেমালুম ভাবে তিনি মিশে যান যে তারা তাঁকে ভগবান বলে ভাবতে পারে না। এই রকমভাবে অবাধে তাদের সঙ্গে মিলে মিশে ভিতরে ভিতরে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করেন। তাদের মনের মধ্যে এমন একটা পরিবর্ত্তন এনে তাদিকে পাল্টে দেন যে তারা তাদের এই পরিবর্ত্তনের কথা অনেক সময় টেরও পায় না। অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে, খেলাধূলা, হাসি, বিদ্রূপ এবং দৈনন্দিন সাধারণ কার্য্যকলাপের মধ্যে কতকগুলি নরনারীর আবেষ্টনের মধ্যে থেকে তিনি এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করেন, যদ্দ্বারা তিনি যুগের ধারা পর্যন্ত ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভগবান নিজে আবির্ভূত না হয়ে তাঁর অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদনের জন্য তাঁরই ভাবে অনুভাবিত মহাপুরুষদিকে জগতে পাঠান। ভগবল্লীলার অনুকরণে তাঁরা অধঃপতিত সংসারী নরনারীর মধ্যে থেকে তাদেরই একজন হয়ে যান এবং তাদেরই মত দুঃখ দুর্দ্দশা, অভাব অশান্তি, রোগ শোক ইত্যাদি ভোগ করে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। অথচ এই সবেরই মাঝখানে তাঁরা এমন একটি উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে যান, যার আলোকে একটা সমগ্র জাতি তাদের মুক্তিপথ খুঁজে পায়। বর্ত্তমান যুগে যে সব মহাপুরুষ এদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের অনেকেই ঠিক এই ভাবেই সমাজ এবং জাতি গঠন কার্যে সহায়তা করে গেছেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীকুলদানন্দ এই শ্রেণীর মহাপুরুষদের অন্যতম ছিলেন। যাদের মধ্যে তিনি চলাফেরা করেছেন, তাদেরই মধ্যে তাঁর আসল সত্তা ডুবিয়ে দিয়ে

তিনি নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের উন্নয়ন কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদিকেও এ বিষয়ে কিছুই বুঝতে দেন নাই। কিন্তু এ সব কথা এখানে নয়।

আশা করি কুশলে আছ। কিছু ভেবো না, ঠাকুর তোমাকে ঠিক পথে চালিত করবেন।

(বাঙ্গালোরের জনৈক ভক্তকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

"পরিশেষ"
দার্জিলিং
২১।৫।৫৫

বাস্তুদেবেষু,

একটা গল্প বলি শোন। একে গল্প বলাও ঠিক হবে না। কারণ ঘটনাটি সত্য বলেই আমি অবগত আছি। বীরভূম জেলার কোন গ্রামে একটি বৈষ্ণব কায়স্থ পরিবারে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেবা প্রতিষ্ঠিত আছে। বাড়ীর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি অচলা ভক্তি, এমন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবার বড় একটা দেখা যায় না। অতিথি সৎকার ও বৈষ্ণব সেবা প্রভৃতির জন্য এরা ও-অঞ্চলে সুপরিচিত।

সে আজ অনেক দিনের কথা। একদিন রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হওয়ার পর অনেকগুলি বৈষ্ণব ঐ বাড়িতে অতিথিরূপে এসে উপস্থিত হলেন। বাড়ীতে চাল-ডালের অভাব ছিল না, কিন্তু তরকারী মোটেই নাই, এতগুলি বৈষ্ণবের সেবা কেমন ক'রে হবে? ঘর শুদ্ধ লোক খুব ভাবনায় পড়ে গেলেন। অবশেষে গৃহস্বামীর কানে একথা উঠল। এত রাত্রে তরকারী সংগ্রহের

কোন উপায়ই ছিল না জেনে তিনি শুধু ভাত ডালই রান্না করতে বললেন। মহাপ্রভুর মন্দিরে ঢুকে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তিনি বললেন—"তুমিই যা হয় কর ঠাকুর, আমাদের দ্বারা কিছু হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।" বাড়ীর অন্যান্য লোকজন কেউ রান্নার কাজে, কেউবা বৈষ্ণব সেবায় নিযুক্ত রইল। কিছুক্ষণ পরে অকস্মাৎ দেখা গেল যে বারান্দায় একটা বড় ঝুড়িতে এক ঝুড়ি বেগুন আর মুলো। এ সব কে কোথা হতে নিয়ে এল, কেউই তা জানে না। গৃহস্বামী বললেন—"যেখান থেকে যেমন ভাবেই আসুক মহাপ্রভুই সঙ্কট মোচন করেছেন। ভাত ডাল রান্না হলে তরকারি চড়িয়ে দাও।"

গ্রামের সুদূর প্রান্তে একটী মুলো-বেগুনের ক্ষেত—তার চারিদিকে কাঁটার বেড়া। খুব ভোরে ক্ষেতের মালিক জমির পাশ দিয়ে যেতে সবিস্ময়ে দেখলেন যে কাঁটার বেড়াতে একখানা চাদর আটকে আছে। সন্দেহ হওয়াতে তিনি ক্ষেতের ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। আগের দিনে ক্ষেতে জলসেচন করা হয়েছে। ভোরের অস্পষ্ট আলোকে ক্ষেতের যেখানে সেখানে কাদার উপর পদচিহ্ন দেখে তার সন্দেহের লেশমাত্র রইল না যে রাত্রে বেগুন চুরি হয়েছে। বেগুন যে চুরি করেছে চাদর নিশ্চয়ই তার—তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে সেখানা কাঁটায় লেগে গেছে, টের পায় নাই। চাদরের সূত্র ধরে চোরের সন্ধান মিলতে পারে ভেবে তিনি চাদরখানা কাঁটা হতে ছাড়িয়ে নিলেন। কিন্তু এ কি? এ চাদর যে তার সুপরিচিত! বাড়ীর মহাপ্রভুর চাদর বলে সেটাকে সনাক্ত করা তাঁর পক্ষে সহজ। সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর কাছে ধোঁয়াটে ও রহস্য-জনক বলে মনে হল। চাদর নিয়ে সেই ভোরেই তিনি গৌরাঙ্গ মন্দিরে উপস্থিত হলেন এবং গৃহকর্ত্তাকে চাদরখানা দেখিয়ে সব কথা পরিচয় দিলেন। চাদরখানা দেখে এবং ভুস্বামীর কথা শুনে তিনি আঁতকে উঠলেন। তখন ঠাকুর ঘরের দরজা খোলা হয় নাই। তাড়াতাড়ি ঠাকুর ঘর খুলে সবিস্ময়ে তিনি দেখলেন, ঠাকুরের গায়ে চাদর নাই। আরও নিকটবর্ত্তী হয়ে যখন তিনি দেখলেন যে

ঠাকুরের পায়ে এক হাঁটু কাদা লেগে আছে, তখন সংজ্ঞাহীন হয়ে আছাড় খেয়ে তিনি সেই ঘরেই পড়ে গেলেন। ততক্ষণে বাড়ীর সকলে ঠাকুর ঘরের দরজার কাছে এসে পড়েছিল। সমস্ত ব্যাপার মুহূর্ত্তের মধ্যে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তারা কান্নার রোল তুলে দিলে—পাড়ার লোক চারিদিক থেকে ছুটে এল। যে সব অতিথি গতরাত্রে বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, কান্না শুনে তাঁরা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন—তাঁদের উপস্থিতিতে না জানি বাড়ীতে কি অঘটন ঘটল।

কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে গৃহস্বামী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন এবং ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে যেতে লাগল। অকস্মাৎ উন্মাদের মত ঘর থেকে ভিড় ঠেলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন, বললেন—"ওরে আয়, আজ এই বেগুনের ক্ষেতে উৎসব হবে, তোরা ছুটে আয়।" এই বলেই তিনি বেগুন ক্ষেতের দিকে দৌড় দিলেন। বিহ্বল নরনারীর দল তাঁর অনুসরণ করল।

বেগুনের ক্ষেতে গিয়ে গৃহস্বামী মহাপ্রভুর পদচিহ্নের উপর কাদায় লুটাপুটি খেতে লাগলেন। তাঁর দেখাদেখি বাড়ীর আবালবৃদ্ধবণিতা সকলে সেখানে লুটিয়ে পড়ল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। লজ্জা নাই, ভয় নাই, কোন লৌকিক বাধাই তারা মানে না। এইভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হওয়ার পর গৃহস্বামী উঠে দাঁড়ালেন—কর্দ্দমাক্ত দেহে আবার তিনি ছুট দিলেন। যেমন উন্মত্তের মত এসেছিলেন, তেমনি উন্মত্তের মতই বাড়ী ফিরে গিয়ে ঠাকুর ঘরে উঠলেন। তখনও তাঁর চোখ দিয়ে ফোয়ারার মত অশ্রু নির্গত হচ্ছিল। ঠাকুরের চরণতলে বসে তাঁর রাঙ্গা পা দুখানি চোখের জলে তিনি ধোয়াতে লাগলেন। তারপর—

তারপর আর কি লিখি। লিখতে গিয়ে চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে আসে—ভাষা মূক হয়ে যায়—ভাবের ধারা রুদ্ধ হয়ে যায়—লেখনী অচল হয়ে আসে।

একটা আঁতের কথা বলি—শুনবে কি? এই ঘটনাটী এবং এই প্রকারের অন্যান্য ঘটনা—যে গুলিকে আঁকড়ে ধরে ভক্তেরা পরমানন্দে তাদের অভীপ্সিত পথে হেঁটে যায়, সেগুলিকে তোমরা সচরাচর যেরূপ অবজ্ঞা করে থাক—তাদের অগোচরে যত খুসী তা করতে পার, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে কতকগুলো কটুকাটব্য করে, নির্ম্মমভাবে তাদিকে আঘাত দিয়ে তাদের ভাবের ঘর ভেঙ্গে দিয়ো না। এ সব জিনিসকে স্বপ্ন বিলাস মনে করে, এদের কোন মর্য্যাদা না দিয়ে তোমরা পাশ কাটিয়ে চলে যাও তাতে ক্ষতি নাই কিন্তু দোহাই তোমাদের—যাকে তোমরা বাস্তব বলে বড়াই কর, তার লগুড়াঘাতে তাদের অন্তরের স্বর্ণ-প্রতিমাকে চুরমার করে দেওয়ার চেষ্টা করো না। তোমাদের বাস্তবতাই যে প্রকৃত পথ তা বোঝাবার জন্য তোমরা হাজার রকমের প্রমাণ উপস্থাপিত করবে, কিন্তু এই সব ভক্তের প্রাণের মধ্যে যে আনন্দের ঢেউ খেলে যায় তার সন্ধান তোমাদিকে কেমন করে তারা দেবে? তাদের রাস্তায় না দাঁড়িয়ে, তাদের অবস্থায় না এসে, তোমরা কেমন করে ত। বুঝবে, তারাই বা কেমন করে বোঝাবে?

একটি ছোট মেয়ে, তার দিদিকে ছেড়ে সে থাকতে পারত না, তার কাছে নইলে তার ঘুম হত না। দেখতে দেখতে দিদি পূর্ণযৌবনা হয়ে উঠল, তার বিয়ে হল। মেয়েটি তখনও নিতান্ত বালিকা। দিদি শ্বশুরবাড়ী যায় বালিকাটী অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করে, তার মোটে ঘুম হয় না। কোথাকার অপরিচিত একটা লোক এসে তার দিদিকে পর করে দিলে। তার দিদির বর শ্বশুরবাড়ী আসে, মেয়েটিকে কত আদর করতে যায়, কিন্তু মেয়েটী যেন তাকে দেখলেই আঁতকে ওঠে, সে যেন তার শত্রু। সেই ত রাত্রে তার দিদির কাছে শোবে, তার ত সেখানে স্থান হবে না। কেন এই পরিবর্তন? মেয়েটি কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারে না। একদিন সে মুখ ফুটে তার দিদিকে জিজ্ঞাসা করে—"ঐ অচেনা লোকটার কাছে সমস্ত রাত থেকে তুই কি আনন্দ

পাস, দিদি?" দিদি তাকে কি বোঝাবে, আর মেয়েটিই বা কি বুঝবে! বোঝবার মত বয়স ত তার তখনও হয় নাই। দিদি হেসে উত্তর দেয়— "ওরে ক্ষ্যাপা বোনটী আমার, তুই যখন আমার মত বড় হবি আর তোর যখন বর আসবে তখনই বুঝবি বরের কাছে শুয়ে কি আনন্দ।"

ছোট বোনটীকে দিদির তার আনন্দের কথা বোঝাবার ক্ষমতা নাই বলে তার বরের কাছে শোবার আনন্দটা যেমন মিথ্যে নয়, তেমনি ভক্তেরা তাদের অবস্থা বা আনন্দের কথা তোমাদিকে বলতে বা বোঝাতে সক্ষম না হলেও সেগুলি মিথ্যা হয়ে যায় না। তাদের প্রতি তোমরা অবিচার করো না, এই আমার অনুরোধ। আশা করি কল্যাণে আছো।

(ত্রিহুতের জনৈক সাধুকে লিখিত)

(দ্বিতীয়)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

ফুলতলা আশ্রম
খুলনা
২০।১০।৫২

বাসুদেবেষু—

স্থূল বিশ্বপ্রকৃতির সর্ব্বত্র চৈতন্য অধ্যস্ত হয়ে আছেন। আমাদের মধ্যে যে সব গুণের প্রকাশ পেলে সত্যবোধ জন্মে তারই নাম জ্ঞান, একথা তোমাকে আগে একবার লিখেছি। এই জ্ঞানকে গীতা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। এই বোধ বা জ্ঞান বিকাশ না হলে ভক্তির উদয় হয় না। অপরপক্ষে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যদি সম্যক জ্ঞান আমাদের

মধ্যে প্রকাশিত হয়, তবে ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ বা চৈতন্যের প্রতি একটা অচলাভক্তির উদয় হয়। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে ঠিক ঠিক জ্ঞানের উদয় হওয়ামাত্র ভক্তিও যে অবশ্যম্ভাবীরূপে আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবে শুধু তাই নয়, আমাদের যেটা চরম লক্ষ্য (অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি) তাও আমাদের পক্ষে সুলভ হবে। অতএব জ্ঞান আর ভক্তিতে যে বিশেষ পার্থক্য নাই এটা স্বতঃসিদ্ধ। তথাপি জ্ঞানী ও ভক্তের ঝগড়ার অবসান হয় না এইজন্য যে, জ্ঞানী ব্রহ্মের ভাবপ্রাপ্ত হতে বা তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতে চান, আর ভক্ত নিজের পৃথক সত্বা বজায় রেখে ভগবানকে সম্ভোগ করতে চান। জ্ঞানী বলেন—ব্রহ্ম হয়ে আমি তাঁরই মত পূর্ণ, তাঁরই মত আপ্তকাম হব ; চিরতরে আমার সমস্ত অভাব, সমস্ত দুঃখ দৈন্যের অবসান হবে। ভক্ত বলেন—আমি তাঁকে উপভোগ করব, রসের সাগরে আমি সাঁতার দেব। জলে যেমন জল মিশে যায় তেমন ভাবে তাঁর সঙ্গে আমি মিশে যেতে চাই না। ঊর্মিমালার মত আমি তাঁরই বুকে, তাঁরই কোলে নৃত্য এবং খেলা করব। চিনি হয়ে কি লাভ ? চিনি খেতেই আমি ভালবাসি।

আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী জ্ঞানী এবং ভক্ত বিভিন্ন আদর্শ তাঁদের সম্মুখে ধরে রেখেছেন। তাদের বিরোধের মীমাংসার জন্য কোনটা ভাল কোনটা মন্দ বিচার করবার জন্য বিচারকের আসনে বসার ধৃষ্টতা আমার নাই এবং তা নিরাপদ বলেও আমি মনে করি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলে রাখতে পারি যে দুজনেরই আদর্শ খুব উচু। কোনটাকে তুচ্ছ ভেবে অবজ্ঞা করা মোটেই সমীচীন নয়। প্রকৃতি অনুযায়ী যে আদর্শ যার কাছে ভাল বলে মনে হবে, সেইটাকেই সম্মুখে ধরে রেখে সেখানে পৌঁছুবার জন্য যেটা সুগম পন্থা সেইটাই বেছে নিতে হবে।

ভক্ত ভগবানকে সম্ভোগ করতে চান। তার সে অভীষ্ট কেমন করে সিদ্ধ হবে ? রসের সাগরে সাতার দেওয়া—ঊর্মিমালার মত তাঁর বুকে নৃত্য

করা—এসব কথা শুনতে খুব ভাল। কিন্তু এসব কি সম্ভবপর? জ্ঞানীরা এই প্রকার সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। যে ব্রহ্ম অব্যক্তভাবে জগতের সঙ্গে মিশে আছেন, তিনি অতীন্দ্রিয় বস্তু বলে তাঁকে দেখা বা পাওয়া কোন কালেই সম্ভব নয়। কাজেই ব্রহ্ম সম্ভোগের আশাও দুরাশা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। যিনি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ন'ন তাঁর ভাবে গদগদ হয়ে যাওয়া, তাঁর নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন মাত্র ভক্তির আতিশয্যে হাঁসা কাঁদা বা নাচা, এসব বুজ্‌রুকী ছাড়া কিছু নয় বলেই জ্ঞানীরা মনে করেন। ভগবানকে দেখতে পেলে তাঁর প্রতি ভাব ও ভক্তির উদয় হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়, বরং এইটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁকে দেখার যখন কোন উপায় নাই, কোন ইন্দ্রিয়েরই যখন তিনি বিষয়ীভূত নন, তখন তাঁর নামে নানাপ্রকার ভাবের অভিব্যক্তি অসরলতা বা কপটতা নয় কি?

এর প্রথম উত্তর এই যে, ভগবানকে না দেখলেও তাঁর প্রতি ভক্তির উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অন্ধ সন্তানের পক্ষে তার মা বাবার প্রতি ভক্তিপরায়ণ বা ভাববিহ্বল হওয়া যেমন অসম্ভব নয়। দ্বিতীয় উত্তর এই যে ব্রহ্ম অব্যক্ত হলেও ভক্তির আতিশয্যে তিনি ব্যক্ত হন। তখন তিনি ভক্তের ইন্দ্রিয়গোচর হন এবং তাঁর সংস্কার মত তাঁকে সম্ভোগ করে কৃতার্থ হন। জলীয় বাষ্প সর্ব্বত্রই বাতাসের সঙ্গে অব্যক্তভাবে মিশে থাকলেও তা যেমন সময়ে সময়ে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, শীতকালের প্রত্যূষে জলাশয়ের উপর ধোঁয়ার আকারে এবং অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে জলীয় বাষ্প যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি, তেমনি ব্রহ্ম অব্যক্ত হ'লেও সময়ে সময়ে ব্যক্ত হ'য়ে তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হন। জলীয় বাষ্প দর্শনের ইচ্ছা করলেও যেমন আমরা অনায়াসে একটা হাঁড়িতে জল ফুটিয়ে নিলেই হাঁড়ির উপর তার নৃত্য দেখতে পাই, তেমনি ভক্তও তাঁর সেবা পূজার দ্বারা অব্যক্ত ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ববিধানে সমর্থ হন এবং তাঁর দর্শন লাভ করেন। জলীয় বাষ্প সর্ব্বত্র সূক্ষ্মরূপে অবস্থান

করছে এই ভেবে, অথবা জলরূপ জলীয় বাষ্পের স্থূলরূপ দর্শন করে জলীয় বাষ্প দর্শন হ'ল বলে কেউ পরিতৃপ্ত হতে পারে না। দুটোর মধ্যে কোনটাতেই জলীয় বাষ্প দর্শন করার আনন্দ উপভোগ করা যায় না। জলীয় বাষ্প দর্শন করার সাধ তখনই মেটে, যখন অনন্ত বায়ুস্তরের সর্ব্বত্র অবস্থিত অব্যয় জলীয় বাষ্প ও জলরূপ স্থূল জলীয় বাষ্পের মাঝামাঝি অবস্থায় অর্থাৎ ধোঁয়াটে জলীয় বাষ্পের দর্শন ঘটে। তেমনি অব্যক্ত ব্রহ্ম সর্ব্বত্র অবস্থান করছেন জেনে ভগবানের অস্তিত্বমাত্র ধ্যানে পরিতুষ্ট অথবা ভাব গদগদ হতে অনেকেই চান না, বা পারেন না। আবার জাগতিক বস্তুসমূহ বা তাঁর স্থূল বিশ্বমূর্ত্তি দেখে আনন্দ-বিহ্বল হতেও অনেকেই সক্ষম হন না। প্রকৃতির কৃপায় যেমন অনেক সময় ধূম্রাকার জলীয় বাষ্প দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি ভগবানের ইচ্ছায় কখনও কখনও কোন কোন্ ভাগ্যবানের আত্মদর্শন বা আত্মানুভূতি ঘটে; যেমন কোন মূর্ত্তি কারও সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হয় এবং তাকে কোনও একটা প্রত্যাদেশ দিয়ে আবার নিমেষ মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে যায়। কিন্তু এই প্রকার ক্বচিৎ বা অনিশ্চিত দর্শনের আশায় না থেকে যদি আমরা ইচ্ছামত তাঁকে দেখতে যাই, তবে জলকে ফুটিয়ে যেমন জলীয় বাষ্প দর্শন করা যায়, তেমনি বিধিমত ভগবানের সেবা পূজা প্রভৃতির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে তা সম্ভবপর হতে পারে। ভগবানকে এইভাবে দেখা যায়। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী, তাদিকে প্রত্যক্ষ করান দুরূহ। কারণ তাঁকে দেখা এ চোখে হয় না, দিব্যদৃষ্টি চাই। এই দিব্যদৃষ্টি যার না খুলেছে তার পক্ষে ব্রহ্ম বা আত্মদর্শন সম্ভব নয়। কাজেই সে অবিশ্বাসের হাসি হেসে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। যদি কোন মহাপুরুষ আত্মশক্তি প্রভাবে কাউকে দিব্যদৃষ্টি জ্ঞান করতে সক্ষম হন এবং তাকে ভগবানের সাকার রূপ প্রত্যক্ষ করাতে পারেন, তবুও হয়ত সে বলবে, ব্রহ্ম ত অনন্ত—তিনি কি এতটুকু নাকি? অনন্ত বায়ুস্তরের অন্তর্গত জলীয় বাষ্প

কি ফুটন্ত হাঁড়ির মুখে সীমাবদ্ধ এ ধোঁয়ার মত বস্তুটুকু নাকি? এরূপ প্রশ্ন যেমন অর্থহীন, এও তেমনি। মূঢ় বোঝে না যে গঙ্গার সামান্যমাত্র অংশ দর্শন বা স্পর্শের দ্বারা যেমন গঙ্গাদর্শন এবং স্পর্শের ফল পাওয়া যায়, গঙ্গোত্রী হতে গঙ্গা পর্য্যন্ত গঙ্গার সমস্তটাই যেমন দেখা স্পর্শ করার প্রয়োজন হয় না, তেমনি অনন্ত ব্রহ্মের সামান্যমাত্র অংশ সাকার রূপ ধারণ ক'রে ভক্তের দৃষ্টিগোচর হ'লে তার ব্রহ্মদর্শনের ফল লাভ হয়। পূর্ণের অংশও যে পূর্ণ!

এ সব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা যেতে পারে। কিন্তু তার কোন প্রয়োজন বুঝছি না। তাই আপাততঃ এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলাম।

আমার শরীর মন্দের ভাল। তোমরা কুশলে আছ আশা করি।

(প্রয়াগের জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ মজঃফরপুর
১৮।১২।৪৯

বাসুদেবেষু—

ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু লিখতে বলেছ। যদি তাঁর জীবনের কোনও অলৌকিক ঘটনার কথা জানতে চাও, অর্থাৎ তাঁর ঐশ্বর্য্য প্রকাশের দিকটা জানবার জন্য যদি তোমাদের মধ্যে একটা কৌতূহল জেগে থাকে, তবে আমার দ্বারা তোমাদের সে কৌতূহল চরিতার্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ ঠাকুর কোনও অলৌকিক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে কাউকে বিমোহিত করতে

কখনও চেষ্টা করেন নাই। স্বাভাবিক ভাবে নানা ঐশ্বর্য্য তাঁর শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হতে আমরা দেখেছি। তিনি ছিলেন মাধুর্য্যের বিগ্রহ। তাঁর ঐশ্বর্য্যের দিকটাকে মাথা তুলতে না দিয়ে এই মাধুর্য্য সব সময় তাঁকে ঘিরে থাকত, আর তাঁর ভক্তেরা সাধ মিটিয়ে তাই আস্বাদন করত। তাঁর মধ্যে বহুক্ষেত্রে স্বতঃস্ফুর্ত্তভাবে অলৌকিকতা প্রকাশ পেলেও সেদিকে মনোযোগ দেবার অবকাশ বা আগ্রহ কোনটাই তাদের থাকত না। যে প্রেম বা সহানুভূতি দিয়ে তিনি সহস্র সহস্র ভক্তকে একান্তভাবে তাঁর আত্মীয় করে তুলেছিলেন, সেটা ছিল একটা বিরাট বিস্ময়ের বস্তু এবং তার মধ্যে যদি অলৌকিক কিছু ছিল বলতে হয়, তবে এইটাই হ'ল তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক! ভক্তদের প্রতি তাঁর কিরূপ দরদ ছিল, তার পরিচয় দেওয়ার জন্য তাঁর জীবনের অতি ক্ষুদ্র একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করব। ঘটনাটা তোমরা কী ভাবে গ্রহণ করবে জানি না, কিন্তু আমার কাছে চিরদিনই এটী একটী অমূল্য সম্পদ বলে পরিগণিত হবে।

শিষ্য এবং ভক্তবৃন্দসমভিব্যাহারে ঠাকুর একবার বাঁকুড়া থেকে বিষ্ণুপুরে তাঁর একজন অনুরক্তের বাড়ী গিয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরের দই ছিল খুব বিখ্যাত। দই খেয়ে ঠাকুর খুব প্রশংসা করায় তারা উৎসাহিত হয়ে ঠাকুরের প্রত্যাগমন কালে একটা বড় দইয়ের হাঁড়ি তাঁর গাড়ীতে তুলে দিয়েছিলেন। অনেকখানি দই দিয়েছেন বলে ভক্তেরা গাড়ীতে আসার সময় খুব আনন্দ প্রকাশ করছিলেন; কিন্তু আমাদের প্রখ্যাত গুরুভ্রাতা যোগেশ ব্রহ্মচারীজী এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে বলে ফেললেন, "ও দই এমন বেশী আর কি, এ ত আমি একলাই অনায়াসে খেয়ে ফেলতে পারি!" মুখ ফসকে তিনি যা বলেছিলেন সেটার উপর গুরুত্ব অর্পণ করা বা তা নিয়ে একটা হৈ চৈ করা মোটেই উচিত ছিল না। কিন্তু গুরুভাইরা ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। তারা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠলেন, "এ কখনও হতে পারে না। যা পঞ্চাশ জনে খেয়ে

শেষ করতে পারে না, তা তাঁর একার পক্ষে খাওয়া অসম্ভব।" গুরু-ভাইদের দৃঢ়তা দেখে যোগেশদাদারও একটা জিদ চেপে গেল। কথাটা ফিরিয়ে নিলেই সব গোল মিটে যেত। কিন্তু তা না করে তিনি তাঁর বাক্যে অটল রইলেন এবং সমস্ত দইটা একাই খেয়ে চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিয়ে দেবেন বললেন। শেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হ'ল যে আশ্রমে পৌঁছেই প্রথম কাজ হবে যোগেশদার দই খাওয়া। ঠাকুরের গাড়ী কিছুদূরে আগে আগে যাচ্ছিল। তিনি এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও টের পেলেন না। বাইরে যাই বলুন, অতখানি দই খাওয়া যে যোগেশদাদার পক্ষে মোটেই সম্ভবপর ছিল না, তা তিনি ভালভাবেই জানতেন। কাজেই এই সঙ্কট থেকে ত্রাণ পাবার জন্য তিনি ব্যাকুল অন্তঃকরণে শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করছিলেন। গভীর উদ্বেগে ও অধীর আগ্রহে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঠাকুরকে তিনি খুঁজলেন। কিন্তু ঠাকুরের গাড়ী তাঁর দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। বাইরে ঠাকুরকে না পেয়ে তিনি অন্তর্মুখী হয়ে তাঁকে অন্বেষণ করতে লাগলেন এবং সঙ্কট মোচনের জন্য অনুক্ষণ প্রার্থনা জানাতে লাগলেন।

যথাসময়ে সকলে গিয়ে গন্তব্যস্থানে উঠলেন। ঠাকুর একটু আগেই পৌঁছে ঘরে প্রবেশ করেছেন। নীচের বারান্দায় সমবেত হয়ে গুরুভ্রাতারা কোলাহল সুরু করে দিলেন এবং যোগেশদাদাকে দই খাওয়ার জন্য আহ্বান করলেন। যোগেশদাদা তখনও অটল। তাঁর সত্য রক্ষা করবার জন্য, অসম্ভব সম্ভব করে তোলবার জন্য ঠাকুরকে স্মরণ করে তিনি অগ্রসর হলেন, যদিও তাঁর অন্তর অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল।

নীচের গোলমাল শুনে ঠাকুর একটু বিস্মিত হ'লেন। আশ্রমে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের মধ্যে গোলমাল উঠল কেন জানবার জন্য ত্রাস্তপদে নীচে নেমে এলেন এবং কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। গুরুভাইরা খুব উৎসাহের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপার ঠাকুরকে জানালেন। ঠাকুর শুনে হাসতে

লাগলেন। গুরুভাইরাও সে হাসিতে যোগ দিয়ে সেখানে একটা হাসির তুফান তুলে দিলেন। তখনকার সে আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

হাস্যরসের তরঙ্গ একটু মন্দীভূত হয়ে এলে ঠাকুর বললেন, "যোগেশ ত একটু পরেই সব দইটা খেয়ে ফেলবে, এ দই আস্বাদন করার সুযোগ ত আর ঘটবে না। আমাকে একটু দাও খেয়ে দেখি।" এই বলে ঠাকুর হাত বাড়ালেন। একজন ভক্ত তখন তাড়াতাড়ি একটুখানি দই ঠাকুরের হাতে দিলেন, আর ঠাকুর পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে তা খেতে লাগলেন।

এই সময়ে অকস্মাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল। দইয়ের অগ্রভাগ ঠাকুর গ্রহণ করলেন বলে অবশিষ্ট দইটা তাঁর প্রসাদ হয়ে পড়ায় ঐ প্রসাদ পাওয়ার জন্য সেখানে একটা হুড়াহুড়ি পড়ে গেল। সকলে ব্যস্ততার সঙ্গে হাঁড়ি থেকে প্রসাদ নিতে লাগল। এই কাড়াকাড়ির ফলে এক হাঁড়ি দই নিমেষের মধ্যে যেন কোন যাদুমন্ত্রের প্রভাবে নিঃশেষ হয়ে গেল।

যোগেশদাদা নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রসাদ পাওয়ার জন্য তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। স্থূল প্রসাদ নয়—ঠাকুরের সূক্ষ্ম মহাপ্রসাদে তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে অশ্রুধারারূপে উপস্থিত হচ্ছিল এবং গণ্ডদেশ প্লাবিত করছিল। লজ্জানিবারণ হরি—শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন ; কিছুক্ষণ পরে তাঁর পায়ে আছাড় খেয়ে তিনি প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। ঠাকুর আস্তে আস্তে তাঁকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সবিস্ময়ে দেখলেন, ঠাকুরের চোখেও জলধারা! একটু পরেই ঠাকুর তাঁর ভক্তকে আলিঙ্গন-মুক্ত করলেন। সকলে নিস্তব্ধ, নিশ্চল। সকলেরই মধ্যে একটা ভাবের তরঙ্গ খেলে গেল। কিন্তু সে ছবি সম্যকভাবে ফুটিয়ে তোলার সুপটু চিত্রকর আমি নই। তেমন নিপুণ তুলিকাও আমার নাই।

এমনি প্রেম, এমনি সহানুভূতি, এমনি দরদ দিয়েই ঠাকুর তাঁর সহস্র সহস্র ভক্তকে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। সে এক অপূর্ব্ব ইতিহাস। সে যদি

কোনদিন রচিত হয়, তবে তাঁর গুরুজীবনের প্রাণ-মন-রসায়ন-মাধুর্য্যে জগতকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করে তুলবে।

এইখানেই শেষ করলাম। আশা করি কুশলে আছ। আমার স্বাস্থ্যের গতি একটানা ভাবেই চলছে, কোন নূতনত্ব নাই।

(মতিহারীর জনৈকা শিষ্যাকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

নির্ম্মলী
ভাগলপুর
২১।১২।৪৯

বাসুদেবেষু—

একটা গল্প বলি শোন। গল্পটা আগে শুনে থাকতে পার, তবু আর একবার শুনতে ক্ষতি কি? দেবর্ষি নারদ একদিন গোলকে যাচ্ছিলেন শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। পথিপার্শ্বে একটা লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। তার আশ্চর্য্য রকমের বেশভূষা আর চালচলন দেখে নারদ বিস্মিত হয়ে গেলেন। কিন্তু ততোধিক বিস্ময়কর ছিল তার অশিষ্ট ব্যবহার। নারদকে সম্বোধন করে অবজ্ঞাভরে সে বললে—"কি ঠাকুর, কোথায় যাচ্ছ?" নারদ সভয়ে উত্তর করলেন—"আমি গোলকে ভগবান বিষ্ণুর কাছে যাচ্ছি।" লোকটা হো হো করে হেসে বললে—"তা বেশ, আমার একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। সেই জোচ্চোরকে জিজ্ঞাসা করবে আমার উদ্ধারের আর দেরী কত? যে সংসারে সে আমাকে বেঁধে রেখেছে, তা থেকে আমাকে মুক্তি

দেবে কবে? আমি তোমার জন্য এখানেই অপেক্ষা করব, তিনি কি উত্তর করেন ফিরে যাবার সময় আমাকে বলে যাবে।" নারদ মনে বুঝলেন লোকটা পাগল। মুখে বললেন—"নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করব এবং কি বলেন না বলেন ফিরবার পথে তোমাকে বলে যাব।" তিনি তাঁর গন্তব্য পথে চলে গেলেন।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তিনি রাস্তার ধারে একজন তপঃক্লিষ্ট যোগীকে দেখতে পেলেন। বিনয়নম্র স্বরে তিনি নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় যাবেন ঠাকুর?" নারদ উত্তর করলেন, তিনি বিষ্ণুর কাছে যাচ্ছেন। শুনে তপস্বী বললেন—"দয়া করে আমার কথা তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করবেন, তাঁর প্রতীক্ষায় এমন করে জীর্ণ দেহভার নিয়ে কতদিন বসে থাকতে হবে? আমার প্রতি তাঁর দয়া হবে কবে?" লোকটাকে দেখে সহানুভূতিতে নারদের চিত্ত ভরে গেল। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, তাঁর কথা তিনি বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করবেন এবং কি বলেন তাঁকে বলে যাবেন।

যথাসময়ে নারদ শ্রীবিষ্ণু চরণে উপনীত হ'লেন। প্রাথমিক আলাপ আলোচনা ইত্যাদির পর নারদ সেই পাগল ও তপস্বীর কথা বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করলেন। সমস্ত শুনে বিষ্ণু বললেন—"সেই পাগলাকে বলো তার উদ্ধারের আর দেরী নেই, আমি শীঘ্রই তাকে মুক্তি দেব। কিন্তু তুমি যে তপস্বীর কথা বলছ, সে যে কে আমি বুঝতে পারছি না। তার সম্বন্ধে কিছুই যখন জানি না, তখন তার কথার জবাব কেমন করে দেব?" বিষ্ণুর কথা শুনে নারদ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জোচ্চোর বলে যে তাঁর মর্য্যাদা প্রকাশ করলে, সে তাঁর কৃপার পাত্র হ'ল, আর সুদীর্ঘকাল কৃচ্ছ্রসাধন করে যিনি দেহ কঙ্কালসার করলেন তাঁকে কৃপা করা দূরে থাকুক, তাঁর সম্বন্ধে তিনি মোটে কিছুই জানেন না, এটা তাঁর কাছে একটা প্রহেলিকা বলে মনে হ'ল। তাঁর বিস্ময়ের

কথা বিষ্ণুকে জানালে তিনি বললেন—"নারদ, তুমি এক কাজ করবে। আমি দুজনের সম্বন্ধে যা বলেছি, সে কথা গোপন করে তাদিকে বলবে যে তোমাদের কথা তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তিনি খুব ব্যস্ত। একটা স্থচের ছিদ্রপথে হাতী প্রবেশ করাবেন বলে তিনি গলদঘর্ম হচ্ছেন। আমার কথা তাঁর কাণেও ঢুকলো না। এই কথা শুনে কে কি মন্তব্য করে তা হতেই তুমি বুঝতে পারবে কেন এ পাগলের মুক্তি আসন্ন আর তোমার কথিত তপস্বী কেন আমার অজ্ঞাত।"

নারদ বিদায় গ্রহণ করলেন। প্রথমেই তপস্বীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। বিষ্ণুর উপদেশ মত প্রকৃত কথা গোপন করে তিনি স্থচের ছিদ্রপথে হাতী ঢোকাবার জন্য তাঁর ব্যস্ততার কথা বললেন। তপস্বী বললেন—"আমি জানি ঠাকুর, আমার প্রতি দয়া হবে না। তাই আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার জন্যই তাঁর এই কৌশল। নতুবা স্থচের ছিদ্রপথে হাতী প্রবেশ করানো যে অসম্ভব, এই সোজা কথাটা তাঁর না বোঝার কারণ কি?"

নারদ চলে গেলেন। একটু পরেই পাগলের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল এবং তাকে ঐ একই কথা বল্লেন। সমস্ত শুনে পাগল হেসে উঠল। বল্লে, "দেখলে ঠাকুর তার ভণ্ডামী? সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—যার ইচ্ছামাত্র সংঘটিত হতে পারে, যার ইচ্ছায় স্থচের ছিদ্র নিমেষ মধ্যে বিরাট আকার ধারণ করতে পারে, আবার হাতীও স্থক্ষ্মাতিস্থক্ষ্মরূপ পরিগ্রহ করতে পারে, তাঁর কাছে এটা ত' একটা তুচ্ছ কাজ। আচ্ছা তুমি যাও। তাঁর দৌড় কতদূর তাই আমায় দেখতে হবে।"

সেখান থেকে প্রস্থান করে দুজনেরই উত্তর গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করে নারদ বুঝলেন—তপস্বীর সাধনা যতই কঠোর হোক না কেন, তার যিনি লক্ষ্য তিনি যে করুণাময়, তাঁর করুণা থেকে তিনি যে কাউকে বঞ্চিত করেন না তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান, তাঁর কাছে যে অসম্ভব বলে কিছু থাকতে পারে না,

এতদিনের তপস্যা সত্ত্বেও এই জ্ঞান বা বিশ্বাস তার মধ্যে জাগরিত হয় নাই। কিন্তু ঐ পাগলের সাধন-ভজন কিছু থাকুক বা না থাকুক, ভগবানের অসাধ্য যে কিছু নাই, থাকতে পারে না, এ জ্ঞানটা যেন তার কাছে স্বভাবসিদ্ধ। তা ছাড়া তাঁর কৃপার উপর তার যে একটা দাবী আছে, আজ হোক, দুদিন পরে হোক, ভগবান যে তাকে কৃপা করবেন, এই সত্যবোধটা তার মধ্যে জাগরিত হয়েছে। নারদের কাছে সমস্ত বিষয়টা স্বচ্ছ হয়ে গেল। ভগবানের সুবিচার সম্বন্ধে তাঁর মনে যে সন্দেহ জেগেছিল, এখন তার নিরসন হ'ল।

আমরা তাঁকে চাই, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যদি আমাদের কোন ধারণা না থাকে, তিনি কোথায় থাকেন, কী তাঁর স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে যদি কোন বোধের অধিকারী আমরা না হই, তবে আমাদের চাওয়া, চাওয়া মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, পাওয়ার সার্থকতা আমাদের কাছে সুদূরপরাহত হয়ে ওঠে। আমাদের সাধনার উদ্দেশ্য সাধ্য বস্তুকে আকর্ষণ করা। আমাদের আকর্ষণ অনুভব করলে তাঁর আসন টলে যায়, আমাদের সাধনার সিদ্ধি প্রদান করতে তিনি ছুটে আসেন। কিন্তু আমরা যদি গতানুগতিকভাবে সাধনার অনুষ্ঠান করে যাই এবং আমরা যাঁকে চাই তাঁর সম্বন্ধে আমাদের একটা সঠিক ধারণা না থাকে তবে আমাদের তাঁকে আকর্ষণ করা বা তাঁর পক্ষে আমাদের আকর্ষণ অনুভব করা সম্ভবপর হয় না। এই কারণেই ভগবান তপস্বীকে মোটেই চেনেন না বলেছিলেন। ভগবান সর্ব্বজ্ঞ। জাগতিক কোন বিষয়বস্তুই তাঁর জ্ঞানের বহির্ভূত হ'বার কথা নয়। এ হিসাবে তপস্বীকে তাঁর না জানা সম্ভবপর নয়। তবে যে তিনি তাঁকে জানেন না বলেছিলেন, এ না-জানার অর্থ তাঁর সম্বন্ধে ভগবানের কোন দায়িত্ব বা কর্ত্তৃত্ব না থাকা। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' একদিকে আমরা তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হতে চাই তাঁর কৃপায় আমাদের দুঃখ মোচন করতে চাই, অথচ তিনি যে শক্তিশালী বা

করুণাসিন্ধু একথা বিশ্বাস করি না। কাজেই বাঞ্ছিত ফললাভে অসমর্থ হই। ভগবান কল্পতরু। তাঁর কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের প্রার্থনা যে অপূর্ণ থাকে, তার কারণ আমাদের চাওয়ার মধ্যে একটা গলদ থেকে যায়। মুখে তাঁর কাছে যদি ঐশ্বর্য্যের জন্য প্রার্থনা করি, আর অন্তরে তাঁকে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী বলে যদি আমাদের বিশ্বাস না থাকে, তবে সে প্রার্থনায় আন্তরিকতা বা একটা জোর থাকতে পারে না। কাজেই প্রার্থনা পূর্ণ হয় না। অতএব প্রথমেই ভগবানের স্বরূপবোধ অন্তরে দৃঢ়ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয়। তবেই সাধনে অনুরাগ থাকে এবং সিদ্ধিলাভ অনেকটা সহজসাধ্য হয়ে আসে। নতুবা ঐ তপস্বীর মত বিড়ম্বনা ভোগ করতে হবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বেশী লিখে লাভ নাই। অন্ধভাবে সাধনার অনুষ্ঠান করলে চলবে না—লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে সুদৃঢ় ধারণা মনের মধ্যে জাগরূক থাকা চাই। জ্ঞান বিচারের আলো জেলে না চললে পদে পদে হোঁচট খেতে হবে। কঠোর সাধন-ভজন, জপতপ, যোগযাগ সবই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। শঙ্করাচার্য্যের ভাষায়—'জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন মুক্তির্ণভবতি জন্মশতেন।'

ভাল আছি, ভাল চাই।

(শান্তিনিকেতনের জনৈক ছাত্র শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

কলিকাতা

১৮।১২।৫৬

বাসুদেবেষু—

আমার উপদেশ সমূহে মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা অনেক সময় তোমাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়ে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমি

স্ববিরোধী মত প্রকাশ করে ফেলি, এই প্রকার অভিযোগ তোমাদের মধ্যে অনেককেই করতে শুনেছি। এই পত্রখানায় এরই একটা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব।

কোন প্রকার মতের প্রতি আমার বিশেষ কোন আকর্ষণ বা পক্ষপাতিত্ব নাই, অর্থাৎ কোন প্রকার মতের বালাই আমার নাই। এ বিষয়ে তোমরা নিঃসন্দেহ হতে পার। এ কথার অর্থ এই নয় যে সকল প্রকার মতবাদই আমার নিকট উপেক্ষার বস্তু। এ কথার অর্থ এই যে ধর্ম্ম বিষয়ক সমস্ত মতকেই আমি সমান চোখে দেখি। আমি সকল প্রকার মতবাদের বা দলাদলির বাইরে। সকল প্রকার মতবাদের সঙ্গেই আমার অল্পবিস্তর পরিচয় আছে এবং এই পরিচিতি আমার মধ্যে এই ধারণাটাই বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে বিবিধ প্রকারের মত একটা পথের সন্ধান প্রদান করে। এই সকল মত বা পথ অনেক সময়েই পরস্পর বিরোধী কাজেই বিরুদ্ধপ্রকৃতির লোককে তাদের প্রয়োজন অনুসারে বিরুদ্ধ মতবাদের উপদেশ প্রদান করে থাকতে পারি, এটা কিছু বিচিত্র নয়। প্রত্যেক মতের মধ্যেই কিছু সত্য নিহিত থাকতে পারে। অতএব কোনটাকেই তাচ্ছিল্য করা চলে না, বরং সকলকেই সাদরে গ্রহণ করতে হয়। কারও পক্ষে বিরুদ্ধভাবাপন্ন মতবাদগুলো হজম করার শক্তি যদি না থাকে, তবে সকলগুলোকেই গ্রহণ না করে যেটা তার পেটে সয়, অর্থাৎ যেটা তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য সেইটা নিয়ে অন্যান্য মতগুলোকে পরিত্যাগ করাই ত সুগম পন্থা।

বিভিন্ন এমন কি বিপরীতগামী পথসমূহ শেষ পর্য্যন্ত একই লক্ষ্যস্থানে গিয়ে পৌঁছতে পারে, এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছুই নাই। তেমনি পরস্পর বিরুদ্ধবাদী মনে হলেও অধিকাংশ মতবাদই সত্যস্বরূপ ভগবানের চরণে গিয়ে ঠেকেছে বলে সেই সব মত সত্য হয়ে গেছে। অথবা এমনও বলা যায় যে, অধিকাংশ মতই ভগবানের চরণ থেকে নির্গত হয়ে বিভিন্ন দেশ কাল পাত্রের

মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। অতএব তাদিকে উপেক্ষা করবে না। আরও একটা জিনিস উপলব্ধি করতে হবে। যে, যে পথে হাঁটার উপযুক্ত সে সেই পথেই হাঁটবে। পথিকের শক্তি, প্রকৃতি ইত্যাদি ভেদে তার চলার পথও বিভিন্ন হবে, অর্থাৎ সে নিজের মনোমত পথ বেছে নেবে। কিন্তু এই সহজ সত্যটা গণনার মধ্যে না এনে ভিন্নজাতীয় ও বিভিন্নধর্মী মানব সবাই একই রাস্তা ধরে যদি একটা গড্ডালিকা-প্রবাহের সৃষ্টি ক'রে তাদের লক্ষ্যস্থানে পৌঁছুতে চায়, তবে তাদের প্রয়াস শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবে। বিভিন্ন উৎস হতে নির্গত হয়ে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যদিয়ে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে, বিচিত্র গতি, বিচিত্র ভঙ্গী এবং বিচিত্র জীবন-প্রবাহ নিয়ে স্রোতস্বতী সাগর-সঙ্গমে ধাবিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বভাব-ধর্মের প্রলয় ঘটিয়ে সব ধারাগুলোকে একত্র করে একটা প্রবল সংহতি সৃষ্টি করার অপচেষ্টা শুধু ব্যর্থতা তা নয়, এতে জগতের অকল্যাণও হবে যথেষ্ট। তেমনি একটা সাধারণ মতবাদের সূত্রে অথবা কতকগুলো সাধারণ নিয়মের বাঁধনে সকলকে বাঁধবার চেষ্টা কোন দিনই ফলবতী হবে না; হলেও সুফল কিছু হবে না, বরং অনর্থেরই সৃষ্টি হবে।

বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের শিক্ষা বিভিন্ন, এমন কি অধিকাংশ সময়ে বিপরীতমুখী হওয়া উচিত। শুধু তাই নয়। অবস্থা এবং কালভেদে একই জনের শিক্ষার মধ্যেও বৈচিত্র্য থাকবে এবং থাকা প্রয়োজন। আমরা প্রত্যেকেই এক একটী বহুরূপী। আমাদের বহিঃপ্রকৃতিতে ক্রমাগত যে রূপান্তর ঘটছে সাধারণের নিকট তা তেমন প্রকট না হলেও এটা, অর্থাৎ আমাদের বাহ্য স্বরূপের পরিবর্ত্তনটাও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সব সময়েই ধরা পড়ে। তা ছাড়া আমাদের মানসিক প্রকৃতি যে ক্রমাগত রূপান্তর প্রাপ্ত হচ্ছে, একটু অন্তর্লক্ষ্য থাকলে আমরা নিজেরাই তা অনুভব করতে পারি। কাজেই এক হয়েও আমরা বহু, একটু আগে আমি যে

মানুষটী ছিলাম, এখন হয়ত ঠিক তেমনটি নাই। আবার এখন যা আছি, ক্ষণকাল পরে হয়ত তা থাকব না। কারণ মন প্রতিনিয়ত আমাদিকে ইচ্ছামত তার অসংখ্য প্রকারের কল্পনার ছাঁচে ঢেলে আমাদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাচ্ছে। আমাদের মধ্যে এই যে রূপান্তর ঘটছে, এগুলোর প্রতি লক্ষ্য না রেখে বরাবর একঘেয়ে শিক্ষা দিলে তা'তে যে কোন সুফল পাওয়া যাবে না এটা সুনিশ্চিত। চিকিৎসক যেমন রুগীর লক্ষণের পরিবর্ত্তন দেখে সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ এবং পথ্যের বিভিন্ন ব্যবস্থা করেন, গুরুকেও তেমনি শিষ্যের চরিত্র পরিবর্ত্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে উপদেশের তারতম্য করবার প্রয়োজন হয়। এটা যারা না করে বা না পারে, যারা শিষ্যের সর্ব্ব অবস্থাতেই তাকে একই রকমের আদেশ বা উপদেশ মেনে চলতে শিক্ষা দেয়, তাদের শিক্ষা যে ব্যর্থ হবে—অপ্রিয় হলেও, একথা বলতে আমার কোন সঙ্কোচ নাই।

এই কারণে আমি যে শুধু বিভিন্ন ব্যক্তিকেই বিভিন্ন প্রকারের উপদেশ দিয়ে থাকি তা নয়, একই ব্যক্তিকেও বিভিন্ন সময়ে তার প্রয়োজন বুঝে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রদান করি এবং এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও আমি একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলি, যদিও তোমাদের অনেকের চোখে এগুলো অসামঞ্জস্যরূপেই প্রতিফলিত হয়। দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতার জন্য আমরা অনেক সময়েই সামঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষ্য করি, শৃঙ্খলাকে বিশৃঙ্খলা বলে ভুল করি, সাম্যের মধ্যে বৈষম্যই আমাদের নিকট প্রকট হয়ে ওঠে। তোমাদের দৃষ্টির প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে আমার উপদেশসমূহের মধ্যে এবং অন্যান্য বিষয়েও সামঞ্জস্য লক্ষিত হবে। তখন আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অভিযোগই থাকবে না, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

কোন বিষয়ে ভালমন্দ কোনপ্রকার মত প্রকাশের আগে তার সব দিক পর্য্যালোচনা করে তবে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হয়। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যেও কত বিশৃঙ্খলা, কত বৈষম্য, কত অসামঞ্জস্য আছে বলে

তোমরা অনুযোগ করে থাক। তোমাদের সমালোচনার কশাঘাত থেকে তাঁকে তোমরা রেহাই দাও না, মানুষ ত দূরের কথা। কিন্তু উদার দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষেরা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য এবং সাম্য প্রতিষ্ঠিত দেখে অবাক বিস্ময়ে তাঁর প্রতি ভাবভক্তিতে আপ্লুত হন। সাধারণতঃ মানুষ যেসব ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষপাতিত্ব, নির্ম্মমতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি দর্শন করে তাঁর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ওঠে, ঋষিকল্প মহাত্মারা সেই সব ক্ষেত্রেই তাঁর অপক্ষপাতিত্ব, করুণা ও সহৃদয়তার পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হন। এর কারণ, এঁরা যে দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখেন, সে দৃষ্টি সাধারণের নাই। তাদের একদেশ-দর্শিতার দ্বারা যতটুকু সম্ভব ততটুকু তারা বিচার করে, তার বেশী আর এগুতে পারে না। অন্ধের হস্তী দর্শনের গল্প জান ত? কয়েক জন অন্ধের হাতি দেখার সাধ হ'ল। দৃষ্টিশক্তিহীন বলে তাদের দর্শনের কাজ স্পর্শের দ্বারা সারতে হবে এবং এতেই হাতীর সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিতে হবে। একজন পায়ে হাত দিয়ে ভাল করে নেড়ে চেড়ে বললে—হাতী একটা গাছের গুঁড়ির মত। আর একজন ল্যাজটা ভাল করে পরীক্ষা করে বললে—গুঁড়ির মত হতে যাবে কেন? বরং ছড়ির মত। কেউ কাণে হাত দিয়ে বললে—হাতী একটা কুলার মত। আবার কেউ দাঁতে হাত বুলিয়ে বললে—কুলো নয়, হাতী ঠিক বোম্বাই মূলার মত ইত্যাদি। ভগবান বা মহাত্মাদের সম্বন্ধে আমরা যে বিচার করে থাকি, তা অন্ধের হাতী দেখার মত।

ঋষি প্রণীত শাস্ত্রসমূহের মধ্যে অনেক সময়েই উপদেশের তারতম্য লক্ষিত হয়। একখানা গ্রন্থেই একস্থানে একরকম উপদেশ এবং অন্যস্থানে ঠিক তার বিপরীত উপদেশ দেখা যায়। মহাপুরুষেরাও অনেক সময় পরস্পর বিরুদ্ধ কথা বলে থাকেন। গোসাঁইজীর উপদেশসমূহের মধ্যেও বাহ্যতঃ অনেক

অসামঞ্জস্য দেখা যায়। মানব প্রকৃতির মধ্যে বৈচিত্র্য আছে বলে উপদেশ-সমূহের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে এবং থাকাও দরকার। এ কথা না বুঝে অনর্থক গোলমাল করলে আর উপায় কি?

তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

(ইন্দ্রনগরের জনৈক শিষ্যকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ কলিকাতা

৭।১।৫৭

বাসুদেবেষু—

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হ'লাম। মানুষ নিজ নিজ কর্ম্মের ফল ভোগ করে, তার কর্ম্ম বা কর্ম্মফলের জন্য ভগবানের কোন দায়িত্ব নাই—এক শ্রেণীর লোকে এই প্রকার মত প্রকাশ করে থাকেন। আবার মানুষ যে-সব কর্ম্ম করে, তার কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব সবই ভগবানের—বিরুদ্ধপক্ষীয়গণ এরূপ মতবাদও পোষণ করে থাকেন। এই দ্বন্দ্ব-স্থলে কোন্ মতটা ভ্রান্ত, আর কোন্‌টা অভ্রান্ত, এ বিষয়ে শুধু তোমার নয়, পণ্ডিতদেরও বুদ্ধিভ্রংশ হয়—'কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।'

আমি বলি দুই মতের মধ্যেই সত্য নিহিত আছে। কাউকে অবজ্ঞা করা চলে না। আমাদের কর্ত্তৃত্ব-সংস্কার যতদিন থাকে, ততদিন আমাদের দ্বারা যে সকল ইন্দ্রিয়কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, সে সব আমাদেরই কাজ। অতএব সে সব কাজের ফলাফলের ভোগ আমাদেরই উপর বর্ত্তে। কিন্তু যখন আমাদের কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি থাকে না, অর্থাৎ আমরা যখন 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার জ্ঞানশূন্য

হতে পারি বা যোগাবস্থা লাভ করি, তখন কর্ম সম্পাদন করেও আমরা অকর্তা। তখন "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্ব্বশঃ"—প্রাকৃতিক গুণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয়। অতএব এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের কর্মফল ভোগেরও কোন প্রশ্ন ওঠে না। কোন দেহধারী নিঃশেষে কর্মত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু প্রাকৃতিক গুণে কর্ম করতে বাধ্য হ'লেও মানুষ যদি কর্মফলত্যাগী হয়, অর্থাৎ অহংবুদ্ধি, আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্তব্যজ্ঞানে কর্মানুষ্ঠান করে, তবে এই যোগাবস্থায় তার সিদ্ধি বা অসিদ্ধি কিছুই থাকে না এবং তাকে কর্মফলভাগীও হতে হয় না। গীতোক্ত উপদেশের এইটাই হচ্ছে সংক্ষিপ্তসার।

আরও একবার ভাল করে শোন। আমিত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে যিনি প্রকৃতি বা দৈব বা ভগবানে সকল কর্মের কর্তৃত্ব আরোপ করেন, বাহ্যতঃ কর্ম করলেও তাঁর নিজের কোন কর্ম থাকে না। অতএব কৃতকর্মের জন্য তাঁকে ভাল বা মন্দ কোন প্রকার ফলভোগ করতে হয় না। কিন্তু আমাদের অহংবুদ্ধি ভগবানকে কর্মকর্তারূপে প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্ত্তে নিজেদিকেই কর্তৃত্বের সিংহাসন দাবী করতে প্ররোচিত করে, তারা তাদের কাজের জন্য দায়ী হয় এবং ফলভোগ করতেও বাধ্য হয়। মানুষকে কর্মফলভোগী হতে হয় কি না, তা ঠিক করতে হলে কর্মের উৎসের সন্ধান করতে হবে। সেই উৎস-মূলে কর্তৃত্ববুদ্ধি থাকলে কর্ম এবং কর্মফল দুইই তার। কিন্তু সেখানে সে যদি দৈব বা ভগবানকেই দেখতে পায়, আপনাকে খুঁজে না পায়, তবে কর্ম বা কর্মফল কোনটাই তার নয়। যেহেতু সাধারণ দৃষ্টিতে কাজ করলেও সে অকর্ত্তা।

জগৎটা চিন্ময়ের লীলাবিলাস, একথা যাদের উপলব্ধির মধ্যে আসে না, একে অন্ধশক্তির খেলা ছাড়া আর কিছু বলে যারা ভাবতে পারে না, অর্থাৎ এক কথায় যারা জড়বাদী, তারাও জগতের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে বলে স্বীকার করে। এ শৃঙ্খলা কার্য্যকারণের শৃঙ্খলা। এর পশ্চাতে ভগবানের

কোন স্থান নাই। কাজেই তাদের কাছে কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলভোগ দুই-ই মানুষের, এর সঙ্গে ভগবানের কোন সম্বন্ধ নাই। আবার এমন অনেকে আছেন যাঁরা ভগবানকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলে স্বীকার করেও জীবজগতের সঙ্গে, তথা কর্ম্ম বা কর্ম্মফলের সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ আছে বলে মানেন না। ঘড়িওয়ালা যেমন ঘড়ি তৈরী করে বাজারে ছেড়ে দেয়, ঘড়ির সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক থাকে না, ঘড়ি ঠিকভাবে চলা না চলার দায়িত্ব যেমন ঘড়ির মালিকের, ঘড়িওয়ালার নয়, তেমনি ভগবান জীবজগৎ সৃষ্টি করে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করছেন। তাঁর এ সবের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ নাই, কাজেই কর্ম্ম বা কর্ম্মফলের কোন দায়িত্বও তাঁর নাই, এই শ্রেণীর লোক এইরূপ মতবাদের পোষণ করে থাকেন। বলা বাহুল্য, এ মত ভ্রান্ত। জীবজগৎ সৃষ্টি করে তিনি প্রত্যেক বিষয়-বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন। কাজেই কর্ম্ম বা কর্ম্মফল কিছুই তিনি ছাড়া নয়। দুয়ের মধ্যে তিনিই অধিষ্ঠিত। কিন্তু তা' হলেও এসব বিষয়ে তাঁর কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করলে অযাচিতভাবে তিনি কর্ম্ম বা কর্ম্মফলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না।

মীমাংসা দর্শনের মতে মানুষ নিজ কর্ম্মানুসারেই ফলভোগ করে। তা'তে ভগবানের কোন সম্পর্ক নাই; অর্থাৎ জীবের কর্ম্ম আপনাআপনি ফল প্রসব করে, তা'তে ঈশ্বরের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। বলা বাহুল্য, নিরীশ্বরবাদী মীমাংসকদের এ মত শ্রুতিসিদ্ধ নয়, অতএব ভ্রান্ত। উপনিষদের মতে তিনি ধর্ম্মাবহ এবং পাপনুদ ভগবান—ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশম্।' ভগবানই অন্তর্য্যামীরূপে জীবকে প্রেরণা দান করেন। শ্রুতি বলেন 'এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ ঐ ব্রচৈনম্ অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে!' অর্থাৎ যে জীবকে তিনি এসব লোক থেকে উর্দ্ধে নিয়ে যেতে চান তাকে দিয়ে তিনি সাধু-কর্ম্ম করান, আর যাকে অধে নিয়ে যেতে চান তাকে দিয়ে অসাধু কর্ম্ম করান!

অতএব শ্রুতির মতে (এবং এই মতটাই যে অভ্রান্ত তা বলাই বাহুল্য) ভগবানই সর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা, মানুষ শুধু নিমিত্ত মাত্র। তাঁর ইচ্ছাই সব, আর কিছুই কিছু নয়। আমরা যেমন ভাবেই চলি না কেন, পাপ বা পুণ্য, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যাই কিছু করি না কেন, সর্ব্ব বিষয়ে তাঁরই আদেশ প্রতিপালন করি, তাঁরই ইঙ্গিতে আমরা পরিচালিত হই। তাঁর অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার দ্বারা কলে চাপিয়ে তিনি আমাদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ান—ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'—আমাদের কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য বা কর্ত্তৃত্ব নাই। কিন্তু তা না থাকা সত্ত্বেও দুর্বুদ্ধিবশতঃ তাঁর কর্ত্তৃত্ব আমরা আত্মসাৎ করে বসি বলে আমাদিকেই পাপপুণ্যের ভাগী হতে হয় এবং তার ফলস্বরূপ আমরা স্বর্গ বা নরক ভোগ করি—উত্তমা বা অধোগতি প্রাপ্ত হই।

সকল কর্ম্মে, সকল বস্তুতে এবং সকল বিষয়ে ভগবানের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমরা যে তাঁরই হাতে যন্ত্র বা পুতুল—তিনি যেমন ভাবে চালান তেমনি ভাবে চলি, যেমন নাচান তেমনি নাচি, এই সত্যটা অস্থিমজ্জায় উপলব্ধি করতে হবে। জগৎ-সঙ্গীতের বীণা তাঁর হাতে—এই বীণায় তিনি ঝঙ্কার তোলেন আর জীব-জগৎ তাদের বিষয়বস্তুর সীমাহীন বৈচিত্র্য নিয়ে ফুটে ওঠে—অসংখ্য রাগ-রাগিণী, সুর, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি তাঁর বীণায় ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। আমরা এবং আমাদের যা কিছু, অর্থাৎ আমাদের কর্ম্ম, কর্ম্মফল, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি প্রভৃতি এই ঝঙ্কার ছাড়া আর কিছু নয়। এই ব্যাপারটী উপলব্ধি করার জন্যই সাধন ভজন। এই উপলব্ধিটা যে পরিমাণে প্রাণের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারবে, সেই পরিমাণে তোমার সাধন ভজন অগ্রসর হয় বলে স্থির নিশ্চয় হতে পারবে। এই কষ্টি-পাথরে যাচাই করেই তোমরা তোমাদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতির মান নির্ণয় করতে সমর্থ হবে।

বেশী জেনে লাভ কি? যে সব তত্ত্ব জানা বা বোঝার জন্য তোমাদের মধ্যে এমন কৌতূহল জাগছে, তার চেয়েও অনেক গভীর তত্ত্বের স্ফুরণ তোমাদের

সাধনার দ্বারা তোমাদের অন্তরে আপনা হতেই হবে। যে সব তত্ত্ব প্রকাশে আমার ভাষা মূক হয়ে যায়, এমন দিন আসতে পারে যে দিন সে সব তত্ত্ব, সে সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধান, তোমরা নিজেদের মধ্যেই পাবে।

আমি যথা পূর্ব্বং তথা পরম্। আশা করি কুশলে আছ।

(বেলুড় কলেজের জনৈক ছাত্রকে লিখিত)

[প্রথম]

কলিকাতা
৩২।২।৫৭

বাসুদেবেষু—

তোমার পত্র পেয়েছি। শারীরিক কারণে এখন সাধন দেওয়া বন্ধ করতে হয়েছে বলে বর্তমানে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখছি না। পরে এ বিষয়ে খোঁজ খবর করতে পার। কলেজের ছাত্র হলেও শুধু লেখা-পড়ায় নয়—চরিত্র গঠনেও তুমি যে বিশেষভাবে মনোযোগী তা জেনে খুব সুখী হয়েছি। জীবন বা চরিত্র গঠনই আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ, এ বিষয়ে সাফল্য অর্জ্জন করতে হলে কি ভাবে চেষ্টা করতে হবে মোটামুটি তা বলছি।

চরিত্র গঠন করতে হলে আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলির যাতে সম্যক স্ফূর্তি হয় তার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতে হবে। শরীরের সঙ্গে মনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলে চরিত্র গঠনের সঙ্গে শরীর গঠনের চেষ্টাও করতে হবে—অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির বিধিমত চালনার দ্বারা শরীর যাতে সবল এবং সুস্থ থাকে সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। শরীর গঠনের পক্ষে প্রাণায়ামও বিশেষ উপযোগী। কিন্তু উপযুক্ত গুরুর কাছে ছাড়া এসব শিখতে গেলে বিপদ হতে পারে। প্রাণায়ামের দ্বারা মানসিক গঠনও সুষ্ঠুভাবে সাধিত

হয়। উচ্চনীচ ভেদে আমাদের মানসিকবৃত্তিগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সত্য, দয়া, ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তিগুলি অল্পবিস্তর সকল মানুষের মধ্যেই আছে। এগুলির যাতে পুষ্টি সাধিত হয় তার জন্য এগুলির সম্যক অনুশীলন হওয়া চাই, অর্থাৎ চেষ্টা বা অধ্যবসায়ের দ্বারা আমাদের মধ্যে এই বৃত্তিগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। বিচার এই অধ্যবসায়কে অনেকটা শক্তিশালী করে তোলে। সদ্‌গুণসমূহের সম্যক বিকাশের অভাবে আমাদের পক্ষে জীবন গঠন বা মনুষ্যত্ব অর্জ্জন যে সম্ভবপর হয় না, আমাদিকে পশুত্বের ভূমিতে নেমে যেতে হবে, এই প্রকার বিচারের ফলে আমাদের মধ্যে স্বতঃই এ বিষয়ে একটা প্রেরণা জেগে ওঠে এবং অদম্য পুরুষকার সহযোগে আমরা আমাদের ঈপ্সিত কাজে অগ্রসর হতে পারি।

একসঙ্গে সব সদ্‌গুণগুলিই বিকশিত করতে চেষ্টা না করে প্রথমতঃ দু'একটিকে বেছে নিয়ে তাদেরই সম্যক অনুশীলন করা ভাল। তারপর এই প্রকার সাধনায় কিছুদূর অগ্রসর হলে পরে একসঙ্গে অনেকগুলিকে ধরা যেতে পারে। তখন এগুলি আয়ত্ত করা অনেকটা সহজসাধ্য এবং স্বাভাবিক হয়ে আসে। যে সব সদ্‌গুণ তুমি একবার অর্জ্জন করেছ, কোন কারণেই যাতে সেগুলির কোনটির মধ্যে গলদ বা ফাঁক না পড়ে, সে বিষয়ে খুব দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে। নতুবা এই ছিদ্রপথ দিয়ে তোমার সমস্ত সদ্‌গুণরাশি নিমেষ মধ্যে বহির্গত হয়ে যেতে পারে। তারপর এই সমস্ত সদ্‌গুণ তোমার মধ্যে যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, তখন আর বিশেষ কোন চেষ্টার প্রয়োজন হবে না। নাচের দিকে মন না থাকলেও যে ভাল নাচতে পারে তার পা যেমন কখনও বেতালে পড়ে না, তেমনি জীবন একবার সুগঠিত হয়ে গেলে আর এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার তেমন প্রয়োজন হয় না।

ব্রহ্মচর্য্য শরীর এবং মনের পুষ্টি সাধনের কাজে বিশেষ ভাবে অবলম্বনীয়। ব্রহ্মচর্য্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর যদি জীবনকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা যায়,

তবে এ চেষ্টা সহজেই ফলবতী হয়। গুরুর সঙ্গে নিয়ত অবস্থান করে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করতে হয় এবং প্রাচীন কালে আর্য্য ঋষিদের মধ্যে এই প্রকার ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখানকার বিদ্যালয়সমূহে এরূপ শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই নাই? তা না থাকলেও নিজের চেষ্টা থাকলে এ বিষয়ে কতকটা সাফল্য লাভ করা যায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বীর্য্যধারণই ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান সাধন। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যাতে বীর্য্যক্ষয় না হয় সে বিষয়ে একটা দৃঢ়তা থাকে, তবে জীবনের ভিত্তি পাকা হয়ে যায় এবং চেষ্টার দ্বারা জীবনকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলা যায়।

মোটের উপর কথা এই যে বিধিমত পুরুষকারের দ্বারা জীবন গঠনের কাজে লেগে যেতে হবে। কিন্তু এর সঙ্গে দৈবেরও সংযোগ হওয়া দরকার। ভগবানের আরাধনার দ্বারা দৈব সুপ্রসন্ন হয়। অতএব জীবন গঠনের জন্য চেষ্টা আর দৈব বা ভগবানের আরাধনা পাশাপাশি চলা চাই। নিজের অধ্যবসায় বা পুরুষকার থাকলে স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের সাহায্য পাওয়া যায় সত্য, তথাপি তাঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিয়ে জীবন গঠনের কাজে অগ্রসর হওয়া চাই এইজন্য যে, তাঁর সঙ্গে একটা সংযোগ রক্ষা করে চললে তাঁর কৃপা সহজেই উপলব্ধি হয় এবং ক্রমশঃ তাঁর উপর একটা নির্ভরতার ভাব আসে। এই নির্ভরতার ফলে কোন কারণে স্বীয় পুরুষকারে অক্ষমতা, ঔদাসীন্য বা শিথিলতা এলেও তাঁর কৃপায় অপূর্ব্ব উপায়ে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং এ অবস্থা লাভ করলে আমাদের কর্ত্তব্য বা করণীয় বলতে কিছু থাকে না। বাহ্য দৃষ্টিতে আমরা কাজ করলেও তাঁরই দ্বারা তা সম্পাদিত হয়—কিছু না করলেও তার জন্য আমাদিকে প্রত্যবায়ভাগী হতে হয় না।

আর একটা কথা। সুষ্ঠুভাবে বাগান তৈরী করতে হ'লে তা'তে শুধু সব রকম প্রয়োজনীয় গাছপালাই রাখতে হবে তা নয়, গাছগুলির যাতে বিধিমত পুষ্টি সাধিত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। নিকৃষ্ট ফল হ'লেও

তেঁতুল জিনিসটা দরকারী বলে বাগানে তেঁতুল গাছও এক আধটা থাকা চাই। কিন্তু ঐ তেঁতুল গাছকে যথেচ্ছভাবে বাড়তে দিলে ওর আওতায় অন্যান্য গাছপালা (যেমন সব্জী, ফুল প্রভৃতির চারা) শুকিয়ে যেতে পারে বলে এর শাখা-প্রশাখাগুলো মাঝে মাঝে কেটে ফেলতে হবে; কিন্তু উৎকৃষ্ট ফল ফসল ইত্যাদির গাছ খুব বেড়ে গেলেও ক্ষতি নাই, বরং বাগানের উৎকর্ষতার জন্য এদের সমধিক বৃদ্ধিই বিশেষ প্রয়োজন। বিধিমত পুষ্টি কথাটার অর্থ এমন নয় যে সব রকম গাছকেই যতদূর সম্ভব বাড়তে দিতে হবে। এর অর্থ এই যে সমস্ত গাছের পুষ্টির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকবে। যার যতটা বৃদ্ধির প্রয়োজন তাকে ততটা বাড়বার সুযোগ দিতে হবে। মানুষের মধ্যে যে সব সৎ বা অসৎ মানসিক বৃত্তি আছে, জীবন গঠনের জন্য সেগুলির বিধিমত পুষ্টি সাধিত হওয়া চাই। আমাদের সৎ প্রবৃত্তিগুলির সাময়িক পুষ্টিসাধন ত চাই-ই, কিন্তু এ সব ছাড়া যে সব অসৎ প্রবৃত্তি আছে, সেগুলিরও বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। কিন্তু এদের বৃদ্ধির প্রবণতা এত বেশী যে এর জন্য বিশেষ কোন আয়াস দরকার হয় না—বাগানের নিকৃষ্ট শ্রেণীর গাছের মত বিনা আয়াসেই বেড়ে ওঠে। এগুলোকে যথেচ্ছভাবে বাড়তে না দিয়ে এগুলোকে সংযত বা দমন করবার জন্য চেষ্টিত হ'তে হবে, তবেই জীবনের শৃঙ্খলা রক্ষিত হবে। অসৎ প্রবৃত্তিগুলোর ক্ষেত্রে এইটাই হচ্ছে বিধিমত পুষ্টিসাধনের প্রকৃত অর্থ।

এই সব অসৎ প্রকৃতির দমন কেমন করে করতে হবে, এ সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা চাই। পর পত্রে সে বিষয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

শ্রীভগবান কল্যাণ করুন।

(দ্বিতীয়)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্‌ কলিকাতা

১৯।৩।৫৭

বাসুদেবেষু—

আমাদের মধ্যে যে সমস্ত অসৎ প্রবৃত্তি আছে সেগুলো আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন ক'রে বলে শাস্ত্রে তাদিকে রিপু আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এইগুলোর মধ্যে কাম ক্রোধ প্রভৃতি ষড় রিপুই প্রধান, এদের মধ্যে আবার কামই প্রবলতম রিপু। কামের থেকে ক্রোধের উৎপত্তি। এই দুই রিপুকে, বিশেষতঃ কামকে জয় করতে পারলে অপরগুলো আপনা হতেই দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। যিনি কাম এবং ক্রোধের বেগ সহ্য করতে পারেন, তিনিই যোগী এবং তিনিই সুখী—এ কথা গীতায় আছে।

বহিঃশত্রুকে যেমন যুদ্ধের দ্বারা জয় করতে হয়, কামাদি রিপু সকলকে জয় করার জন্যও তেমনি সাধন-সমরের প্রয়োজন। এই সমরের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করেন গুরু এবং অস্ত্রচালনার কৌশলও তিনিই শিক্ষা দেন। গুরুর সাহায্য ব্যতীত নিজের চেষ্টাতেও হয়ত রিপুজয় হতে পারে, কিন্তু এরূপ শক্তিমান্‌ ও ভাগ্যবানের সংখ্যা অতি অল্প। তা সত্ত্বেও যারা গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, তারা নিজের চেষ্টাতেও যে এ বিষয়ে অনেকটা সাফল্য লাভ করতে পারবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যদিও এর দ্বারা শেষ রক্ষা হওয়া খুব দুরূহ হয়ে পড়ে। কাম দমন করার জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের বিধিনিষেধগুলি মেনে চলতে হয়। 'সদ্‌গুরুসঙ্গ' গ্রন্থে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোক-সম্পাত করা হয়েছে—শুধু কাম দমন নয়, জীবন এবং চরিত্র গঠনের জন্য এই গ্রন্থখানিতে যে সমস্ত সঙ্কেত ও নির্দ্দেশ

আছে, সেগুলি পালন করবার চেষ্টা করলে তুমি বিশেষ লাভবান হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গুরুর আশ্রয় যতদিন না পাও ততদিন গ্রন্থখানিকে তোমার পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করতে উপদেশ দি।

গীতায় যে অভ্যাস যোগের কথা উল্লেখ আছে, সেই অভ্যাস যোগই সাধন-সমর। গুরু প্রদত্ত সাধন অভ্যাসের দ্বারা কাম রিপু তথা অন্যান্য রিপু জর্জ্জরিত হয়ে পড়ে, তাদের মাথা তোলবার বা আমাদিকে অভিভূত করে ফেলার শক্তি থাকে না। তুমি যখন গুরুদীক্ষা লাভ কর নাই তখন তোমার পক্ষে ভগবানের যে কোন একটী নাম (যা তোমার নিকট প্রিয় বলে মনে হবে) বেছে নিয়ে তাই অধিকাংশ সময় মনে মনে জপ করতে পার। কামচিন্তা যখনই আসবে তখনই অভ্যাস যোগের দ্বারা মনকে তার থেকে ফিরিয়ে নিতে হবে এবং সর্ব্বদা সচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করতে হবে। তুমি এখন ছাত্র, পড়াশোনাকেই যদি ধ্যান জ্ঞান করতে পার (এবং বর্ত্তমানে এইটাই তোমার কর্ত্তব্য) তা হলে অন্য চিন্তা তোমার ত্রিসীমানার মধ্যে আসবার সুযোগ পাবে না। অবসরকালে মনকে উর্দ্ধে স্থাপন করতে অর্থাৎ যে সব সৎচিন্তা আমাদের মনুষ্যত্ব লাভের সহায়ক সেই সমস্ত চিন্তা নিয়ে থাকতে চেষ্টা করবে।

রিপু জয় করার জন্য যুদ্ধ ছাড়া আর একটা উপায় আছে—সেটা হচ্ছে প্রেম। যুদ্ধের দ্বারা যেমন শত্রুকে জয় করা যায়, প্রেম বা ভালবাসার দ্বারাও তেমনি শত্রুকে বশীভূত করা যায়। যে তোমার অনিষ্ট সাধন করে, তাকে যদি অন্তরের সহিত ভালবাসতে পার, তবে একদিন না একদিন তার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হবেই, তোমার শত্রুতা-সাধনের পরিবর্ত্তে সে তোমার একান্ত অনুগত হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এক গালে চড় খেয়ে আর একটা গাল পেতে দেওয়া, কলসীর কাণা দ্বারা আহত হয়েও প্রেম বিতরণ করা, রিপু জয়ের এই ব্যতিরেকী পন্থা (Indirect method) যে কেউ অবলম্বন

করলেই যে ফললাভে সমর্থ হবে তার সম্ভাবনা খুব অল্প। যাদের মধ্যে সত্যই বিশ্বপ্রেম জন্মেছে এরূপ উত্তমাধিকারী ছাড়া এ পন্থা সহজে কার্য্যকরী হয় না। এ কথা উপলব্ধি না করে অনেক অনধিকারী প্রেমের দ্বারা শত্রুর হৃদয় জয় করার চেষ্টা করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা ভোগ করে।

অন্তরের রিপুসমূহ উচ্চতর বৃত্তিগুলোর ক্রমবিকাশ প্রচেষ্টাকে প্রথমে সন্দেহের চোখে দেখে—তাদের এই প্রয়াস তাদিকে অর্থাৎ কামাদি রিপুকে সংহার করার একটা ষড়যন্ত্র বা গোপন অভিসন্ধি বলে তারা মনে করে; এইজন্য প্রথম প্রথম তাদের হিংস্র প্রবৃত্তিটা অধিকতর মাত্রায় প্রকট হয়ে উঠে আর তারা উচ্চতর বৃত্তিগুলোর বিরুদ্ধে আরও প্রবল ভাবে অভিযান সুরু করে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যদি তাদের মধ্যে কোন রকম বিদ্বেষ ভাবের সন্ধান না পায়, প্রেম ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব খুঁজে না পায়, তবে তারা শেষ পর্য্যন্ত তাদের বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। সৎ প্রবৃত্তিসমূহের সান্নিধ্য লাভ করে তখন তাদেরও রূপান্তর হয়, কাম প্রেমে পরিণত হয়, ক্রোধ তেজে রূপান্তরিত হয় ইত্যাদি।

'মদন দহন' আর 'মদন মোহন' এই দুটো কথার অর্থ এবং তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে হবে। শিব ছিলেন মহাযোগী, কঠোর তপস্যার প্রভাবে তিনি রিপুজয় বা রিপু সংহার বা মদন ভস্ম করেছিলেন—এজন্য তাঁর নাম মদন-দহন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে কামজয় বা রিপু দমনের জন্য মদনকে ভস্ম বা দহন করার প্রয়োজন হয় নাই; তাঁর শরীর, মন ছিল এত সৌষ্ঠব-সম্পন্ন, চিত্তবৃত্তি ছিল এত সুন্দর যে তিনি ছিলেন মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, প্রেমের অবতার। এই কারণে কামকল্পনা কোনদিন তাঁর হৃদয়কে বিচলিত করে নাই—কামদেব বা মদন কখনও তাঁকে অভিভূত করতে সাহসী হয় নাই—

অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে তাঁর বিশ্ব-বিমোহন মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে থাকত। তাই শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মদন-মোহন।

একটা কথা বিশেষভাবে ধারণা করতে চেষ্টা করবে। শুধু জগতের স্থূল বস্তুসমূহ ভগবানের মূর্ত্তি নয়—আমাদের প্রত্যেকটী বাক্য, প্রাণের প্রতিটি স্পন্দন, প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাস, চিত্তের যাবতীয় বৃত্তি, সবই ব্রহ্মের স্বরূপ। অতএব আমাদের চিত্তবৃত্তি, এমন কি কামাদি রিপুসমূহকেও ভগবানের মূর্ত্তি বলে চিন্তা করতে হবে। যখনই কোন রিপু—মনে কর কাম—তোমাকে অভিভূত করবার প্রয়াস করবে, তখন তাকে তোমার শত্রু না ভেবে ভগবান ঐ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে তোমার নিকটে এসেছেন ভেবে তাকে নমস্কার করবে। যে কামরিপু তোমাকে পীড়ন করছে, বিশ্বাস কর কামের ছদ্মবেশ ধারণ করে ভগবানই তোমার কাছে এসেছেন—সন্ত্রস্ত না হয়ে তোমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়। বারবার এইরূপ করতে করতে যাকে তুমি শত্রু ভেবেছিলে, তার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে ধন্য হবে—বুঝবে এ কামের দেবতা (কামদেব বা মদন) নয়—প্রেমের ঠাকুর।

কিন্তু কামপীড়িত অবস্থায় এমন একটা মোহ আমাদিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে যে অনেক সময় ঠাকুরের কথা মনেই থাকে না, তাঁর ছদ্মবেশ আমাদের মধ্যে কলুষিত ভাবটাকেই জাগিয়ে তোলে—তাঁকে নমস্কার বা পূজা করবার কথা মনেই আসে না। অনাহূত এবং অবজ্ঞাত হয়ে যখন তিনি তোমার হৃদয়-দুয়ার থেকে ফিরে যাবেন—তোমার কামের নেশা যখন ছুটে যাবে, তখন তোমারই অনবধানতাবশতঃ একটা সুবর্ণ-সুযোগ তুমি হারিয়ে ফেলেছ ভেবে তাঁর পশ্চাদ্দেশ থেকেই তাঁকে নমস্কার করে সকাতরে বলবে—"হে ভগবান, আমার দুর্ভাগ্য তোমাকে তোমার সম্মুখ দিক থেকে চিনতে দেয় নাই, তোমার পশ্চাদ্দেশ থেকে তোমাকে প্রণাম করি, আমার প্রণাম তুমি কৃপা করে গ্রহণ কর।" এই প্রকার কিছুদিন করতে করতে যথেষ্ট সুফল

পাবে। তাঁর অগ্রপশ্চাৎ বলে কিছু নাই, তাঁর সকল দিকেই নমস্কার করা চলে এবং করতেও হয়। গীতার সেই শ্লোকাংশ স্মরণ কর—"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে—নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।"

অনেক কথাই বলা হল না—তথাপি পত্রের দীর্ঘতার কারণ এইখানেই শেষ করতে হল। ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন।

(ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণাকারী জনৈক দার্শনিক শিষ্যকে লিখিত)

(প্রথম)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ ভুবনেশ্বর

১৬।২ ৫৬

বাসুদেবেষু—

আমাদের মধ্যে যে সব পূজা উৎসব প্রভৃতি প্রচলিত আছে সেগুলির প্রত্যেকটীরই এক একটা নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। সাধারণের কাছে যদিও সে সব ধরা পড়ে না, যদিও এই সকল অনুষ্ঠান তাদের দ্বারা অন্ধ এবং গতানুগতিক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি এগুলো যে অন্তরঙ্গ সাধনা এবং সিদ্ধির বহিঃ প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়, জ্ঞানযোগে আরূঢ় ধর্ম্মাত্মাগণ তার সাক্ষ্য প্রদান করেন। এই সব পূজা উৎসব কোথাও অনুষ্ঠিত হতে দেখলে এদের সঙ্গে তাঁদের একটা অন্তরের যোগ সাধিত হয় আর তারা ভাববিহ্বল, এমন কি অনেক সময় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েন। ভদ্র সমাজের মধ্যে যে সব প্রতিমা পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয় শুধু সেগুলোর মধ্যে নয়, সাধারণ

লোকের মধ্যেও যে সব উৎসব প্রচলিত আছে তাদের মধ্যেও এমন অনেক যৌগিক রহস্য নিহিত আছে যা ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়।

আমি একবার নিমন্ত্রিত হয়ে একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। চৈত্র মাসের শেষে শিবের গাজন বা উৎসব হবে বলে তখন সেখানে উদ্যোগ আয়োজন চলছিল। যদিও গাজন আরম্ভ হওয়ার কয়েকদিন আগেই আমি সে স্থান পরিত্যাগ করেছিলাম, তথাপি এই গাজনে যে সব অনুষ্ঠান হয় তার মোটামুটী একটা পরিচয় আমি পেয়েছিলাম। কামাখ্যা বা 'কামালতোলা' বলে এই গাজনের অন্তর্গত একটা পর্ব্বের কথা এখানে বলছি। একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে রাত্রি আড়াই প্রহরের পর এই পর্ব্বের অনুষ্ঠান হয়। শিবের পুরোহিত, তন্ত্র-ধারক, পাটভক্ত ও সন্ন্যাসীগণ শিবের মন্দির হতে কিছু দূরে গ্রামের প্রান্তভাগে অবস্থিত একটী পুকুর থেকে কামাখ্যাদেবীর পূর্ণ ঘট আনবার জন্য গমন করেন। সেখানে বিধিমত পূজা অর্চ্চনা বলি প্রভৃতির পর বলির রক্তে রঞ্জিত ঘটটীর মুখ পুকুরের জলের প্রান্তভাগে একটু আড়াআড়ি ভাবে ধরা হয়, আর অমনি অলৌকিকভাবে পুকুরের জলের সাড়ে তিনটী ঢেউ এসে নাকি ঘটটী জলপূর্ণ করে দেয়। তখন পাটভক্ত তার মাথার উপর কুণ্ডলী পাকান একটী গামছার উপর সুকৌশলে ঘটটী উল্টাভাবে স্থাপন করেন—ঘটের সম্মুখে রক্তরঞ্জিত তরবারী এবং সন্ন্যাসীগণের ব্যবহৃত বেতের ছড়ি আড়াআড়ি ভাবে রক্ষিত হয়। ঘট মাথায় করামাত্র পাটভক্তের একটা মত্ততার ভাব এসে পড়ে। পুরোহিত সোল্লাসে মহাদেবের জয়ধ্বনি করে ওঠেন। এই ধ্বনি শোনামাত্র সন্ন্যাসীর দল, বাদ্যকর প্রভৃতি যারা এ যাবৎ একটু দূরে অবস্থান করছিল, তারাও জয়ধ্বনি করে ছুটে আসে। গভীর নিনাদে জয়ঢাক বেজে ওঠে। দুজন সন্ন্যাসী দুপাশ থেকে পাটভক্তকে ধরে ফেলে—তার সম্মুখে দুজন সন্ন্যাসী ধুনচীর আগুনে ধূপ ধুনা সংযোগ করে পাটভক্তের

মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কামাখ্যাদেবীর আরাতি করতে করতে পিছু হাঁটতে থকে, দুদিক থেকে আরও দুজন সন্ন্যাসী কামাখ্যাদেবীকে তথা পাটভক্তকে ব্যজন করতে থাকে। বহু সংখ্যক মশাল এই সময়ে জ্বলে ওঠে। ঢাকের বাদ্য এবং মহাদেবের জয়ধ্বনি শুনে গ্রাম এবং গ্রামান্তর থেকে শত সহস্র নর নারী ছুটে এসে ক্রমশঃ সেখানে সমবেত হয়। সমস্ত মিলে এমন একটা গুরুগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়, যা দেখে সকলের হৃদয়ে একটা ভয় ও ভক্তির উদয় হয়।

শিবমন্দির অভিমুখে চলতে চলতে পাটভক্ত কখনও কখনও থমকে দাঁড়িয়ে যায়—কখনও বা পিছু হাঁটতে সুরু করে—স্বেচ্ছায় নয়, তার পাদুটো কে যেন টেনে নিয়ে আসে এইভাবে কখনও অগ্রসর হয়ে, কখনও বা পিছু হেঁটে, কখনও বা কিছুক্ষণ করে একটা স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে সে ক্রমশঃ মন্দিরের কতকটা কাছাকাছি একটা স্থানে এসে সে এমনভাবে আটকে যায় যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মোটেই আর এগুতে চায় না। বেগতিক দেখে নূতন সুরে শিবের জয়ধ্বনি করা হয়, নূতন ছন্দে বাদ্য আরম্ভ করা হয়, কিন্তু কিছুতেই যখন কোন ফল হয় না, তখন এ সব বন্ধ করে শক্তির প্রীতির জন্য কোন ভক্তকে গান গাইবার জন্য আহ্বান করা হয়। গান শুনতে শুনতে পাটভক্তের মত্ততা যেন বেড়ে ওঠে—একটা অপূর্ব্ব ভাবভক্তির প্রকাশ সমবেত জনতার চোখে মুখে ফুটে উঠতে দেখা যায়। কিছুক্ষণ সঙ্গীতের পর পাটভক্ত হঠাৎ আবার নাচতে নাচতে অগ্রসর হয়, আবার ঢক্কানিনাদ আর জয়ধ্বনি চারিদিক মুখরিত করে তোলে. সমগ্র জনতার মধ্যদিয়ে একটা পূত আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয়ে যায়। দুর্ব্বার গতিতে অগ্রসর হয়ে কামাখ্যাদেবী (পাটভক্ত) এবার একেবারে মন্দিরে উপস্থিত হন। পাটভক্তের মাথা থেকে ঘট নামিয়ে নেওয়া হয় আর সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে।

এই পর্ব্বের কথা আমাকে যাঁরা বলেছিলেন তাঁরা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বের কথা হয়ত কিছু জানেন না। আমার কিন্তু ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত শুনতে

শুনতেই মনে হয়েছিল যে এর মধ্যে যোগ-বিজ্ঞানের একটা নিগূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে। আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যে যে সুষুম্না নাড়ী আছে, তাকে অবলম্বন করে মূলাধার বা লিঙ্গমূল থেকে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান) ছয়টী চক্র আছে—এ ছাড়া সর্ব্বোপরি সহস্রারে পরমপুরুষ মহাদেব বা শিব অধিষ্ঠিত আছেন। মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি স্বয়ম্ভূ লিঙ্গকে সাড়ে তিন পাক বেষ্টন করে অচৈতন্য অবস্থায় অবস্থান করেন। আমাদের পূজা অর্চ্চনা যোগ সাধনা প্রভৃতির দ্বারা এই নিদ্রিত কুণ্ডলিনী শক্তি বা কামাখ্যাদেবীকে জাগিয়ে তুলে তাকে সুষুম্নার পথে সহস্রারে চালিত করে মহাদেবের সঙ্গে মিলন ঘটাতে হবে। এই শিব-শক্তির মিলন হলেই আমাদের পরমার্থ সিদ্ধি হয়, এই সংযোগই যোগীর চরম লক্ষ্য। এই কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হয়ে সহস্রারের দিকে অগ্রসর হন বটে, কিন্তু একভাবে চলেন না—কখনও কখনও একটা চক্রে বা দুটো চক্রের মধ্য পথে গিয়ে আটকে যান, আর উঠতে চান না। কখনও বা কতকটা নীচে নেমে আসেন। তাঁর গতিও ঠিক একরূপ হয় না। কখনও শম্বুকের মত মন্থর গতি, কখনও সাপের মত সর্পিল গতি। কখনও তাঁর গতি হয় ভেকের মত, লাফ দিয়ে চলেন, আবার কখনও কখনও তিনি মর্কট বা বানরের মত এক লাফে হয়ত একটা চক্র হতে আর একটা চক্রে চলে যান। এইরূপে অগ্রসর হয়ে কখনও পিছু হটে আর কখনও বিশ্রাম করে কুণ্ডলিনী শক্তি মোটের উপর সহস্রার অভিমুখে উঠতে থাকেন। মূলাধার ছাড়া আর চারটে চক্র (স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ) অতিক্রম করে যখন তিনি আজ্ঞাচক্রে গিয়ে পৌঁছান, তখন এখান থেকে সহস্রারের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ তাঁর নয়নগোচর হয়। এখানে তিনি একটু দীর্ঘকাল আবদ্ধ হয়ে পড়েন। তারপর আর পিছু না হেঁটে দ্রুতগতিতে সহস্রারে গিয়ে উপস্থিত হন। এইটাই সমাধির অবস্থা। সাধকের তখন বাহ্য চৈতন্য এককালে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

সাততলা বাড়ীর একেবারে নীচের তলায় অন্ধকূপে যে শক্তি নির্ব্বাসিত হয়ে আছেন, উপর তলায় মণিকোঠায় অবস্থিত মহাদেবের সঙ্গে মিলনের জন্য সুষুম্নার সিঁড়ি-পথ দিয়ে তার এই যে অপূর্ব্ব অভিসার, এইটাই রূপায়িত হয়েছে উক্ত 'কামাখ্যা তোলা' পর্ব্বের মধ্যে। আজ্ঞাচক্রে পৌঁছে শক্তি তাঁর স্বামীর ঐশ্বর্য্য দেখেই হয়ত থমকে কিয়ৎকাল যাবৎ এখানেই থেকে যান। স্বামী যার রাজরাজেশ্বর তাঁকে এতদিন কাঙ্গালিনী সেজে থাকতে হয়েছে ভেবে অভিমানে যেন তিনি আর অগ্রসর হতে চান না। তারপর পাগলা ভোলা বা বুড়ো শিবের যখন শক্তির প্রতি দৃষ্টি পড়ে তখন তিনি আর উদাসীন থাকতে না পেরে তাঁকে সাদর আহ্বান জানান। সে আহ্বান শক্তির কানে সঙ্গীত-ধ্বনির মত বেজে ওঠে, আর অমনি অভিমান ভুলে ত্বরিত গতিতে তিনি সাততলায় (সহস্রারে) গিয়ে শিবের সহিত মিলিত হন। জনসাধারণ বাইরের ব্যাপার নিয়েই মাতামাতি করে, কিন্তু এই অনুষ্ঠানটী যোগী-হৃদয়ে একটি অপূর্ব্ব পুলক এবং শিহরণ জাগিয়ে তুলবে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

আমার শরীর তদবস্থ ভাবেই আছে। কুশল কামনা করি।

(দ্বিতীয়)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ সদ্‌গুরুনিবাস

ভুবনেশ্বর

৪।৪।৫৬

বাসুদেবেষু—

কামাখ্যাদেবীর শিবমন্দিরে যাত্রা (যার কথা পূর্ব্বে একখানা পত্রে তোমাকে লিখেছি) এবং কুণ্ডলিনী শক্তির সুষুম্নার পথে সহস্রারে গমনের

সঙ্গে সাধকের সিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। সাধক সব সময়ে একটানা ভাবে সাধন পথে অগ্রসর হতে পারে না। কখনও সে মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়, কখনও তার উন্নতি দ্রুততর হয়, আবার কখনও বা তার অগ্রগতি এককালে ব্যাহত হয়, এমন কি সে ভয়াবহভাবে পিছিয়ে পড়ে বলে মনে হয়। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সে মোটের উপর অগ্রসর হতে থাকে। বাইরে থেকে আমরা যেটা তার অবনতি বলে মনে করি, সেটাও তার উন্নতির পূর্ব্বরূপ। কোন স্থান লাফিয়ে পার হ'তে হ'লে যেমন কতকটা পিছিয়ে এসে তারপর ছুটে গিয়ে লাফ দিলে একটা বেশী রকম জোর পাওয়া যায়, তেমনি সাধককে সাধনপথে যেতে যেতে মাঝে মাঝে যে পিছিয়ে পড়তে দেখা যায়, তা'তে অধিকাংশ সময়ে তার গতিবেগ বৃদ্ধিরই সহায়তা করে, এতে তার ইষ্টই সাধিত হয়। অনিষ্ট কিছুই হয় না। কিন্তু সাধক এ কথাটা অনেক সময় উপলব্ধি করতে না পেরে তার সাধনা তাকে পিছুদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভেবে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং কিছুটা গভীর উদ্বেগ ভোগ করে। এই সঙ্কট অবস্থায় অনেক সময় গুরু বা সাধন ভজনের প্রতি তার এমন একটা অশ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে যে, এ সবের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে সে কালাপাহাড় সেজে বসে।

সাধনভজন বা গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করলে সংসারের যাত্রাপথে নির্বিঘ্নে যাওয়া যায়, পার্থিব সকল বিষয়ে সুখ সুবিধা ভোগ করা যায়, এই প্রকার ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করেও অনেকে বিড়ম্বনা ভোগ করে। সদ্‌গুরু প্রদর্শিত সাধন-পথ অবলম্বন করলে তার সাংসারিক সকল বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি হবে ভেবে নিশ্চিন্ত মনে চলতে গিয়ে যখনই সে হোঁচট্ খায়, যখনই দুঃখ দুর্দ্দশা, অভাব অশান্তির মধ্যে পড়ে সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে তখনই গুরু এবং তাঁর প্রদত্ত সাধনের প্রতি সে বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। অতএব গুরুর কাছ থেকে সাধন নেওয়ার আগে তাঁর কাছে কি পাওয়া যেতে পারে বা

তিনি কি দিতে পারেন, এ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা থাকা উচিত। গুরু যে পার্থিব ঐশ্বর্য্য নিয়ে কারবার করেন না, তিনি পরমার্থ লাভের পথ নির্দ্দেশ করে দেন এবং নানাপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তির মধ্য দিয়ে যে এই পথ অতিক্রম করতে হয় এই কথাটা উপলব্ধি না করার জন্য অনেকের সাধন-তরী এমনভাবে চড়ায় আটকে যায় যে তার পুনরুদ্ধার সাধন করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

গুরুর বাহ্য আকার বা তাঁর চলা ফেরার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য থাকবে, সাধারণের চেয়ে সকল বিষয়েই তাঁর একটা অভিনবত্ব থাকবে, ইত্যাকার কল্পনাও অনেক সময় গুরুর সম্বন্ধে শিষ্যের মনে একটা সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। যাদের জীবন গুরুকে গড়ে তুলতে হবে, তাদের সঙ্গে অবাধে না মিশে নিজেকে উচ্চতর বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত করলে ভাবের আদান প্রদান ঠিকভাবে হতে পারে না এবং তাদিকে উপযুক্তভাবে শিক্ষা বা উপদেশ দেওয়াও সম্ভবপর হয় না; কাজেই গুরুকে শিষ্যদের ভূমিতে নেমে এসে ঠিক তাদেরই একজন হয়ে তাদিকে পরিচালিত করতে হয়। এই কথাটা ঠিকভাবে ধারণা করতে না পারার জন্যও অনেক ক্ষেত্রে শিষ্যকে বিড়ম্বিত হতে হয়।

সাধনভজনে উপযুক্ত অবস্থা লাভ না করে কোন কোন ক্ষেত্রে শিষ্য পঞ্চরস অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের মধ্যে তার প্রকৃতি অনুযায়ী কোন একটী অবলম্বনে গুরুর সঙ্গে অস্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতা দেখিয়ে থাকে এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাবে অগ্রসর হতে গিয়ে আত্মপ্রতারণা করে। কোন শিষ্য প্রচুর অর্থাদির, কেউ বা বৈষয়িক অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার, কেউ বা রূপযৌবনের, কেউ বা পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার জৌলুস দেখিয়ে গুরুকে মোহিত করতে চায় এবং নিজেদের গোষ্ঠীতে প্রাধান্য ও প্রভুত্ব স্থাপন করে আত্মপ্রসাদ লাভে সচেষ্ট হয়। অসামর্থ গুরু এ সব ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে নিজের ও শিষ্যের সর্ব্বনাশ সাধন করে বসেন। সামর্থী গুরু নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে শিষ্যের ভাবে মিশে প্রথমে নানাভাবে সাবধান করে দিয়ে

তাকে সংশোধনের সুযোগ দেন বা পরিণামে নানা পরীক্ষার মধ্যে ফেলে তার আত্মমর্য্যাদাবোধ উদ্বুদ্ধ করে তার নিজ প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তাকে সচেতন করেন। এমত অবস্থায় অপ্রস্তুত ও ক্ষুব্ধ হয়ে কোন কোন শিষ্য গুরুদ্রোহী হয়ে যায়, কেউ কেউ বা গুরুসঙ্গ ত্যাগ করে, সাধন নিষ্ঠা হারিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ জটিল ও অন্ধকার করে তোলে।

শিষ্যের চোখে গুরু হলেও গুরু অনেক ক্ষেত্রে শিষ্যকে তাঁর সমকক্ষ মনে করেন, এমন কি তাকেই গুরুর আসন প্রদান করতেও কুণ্ঠিত হন না। গুরু, তিনি যত বড়ই সিদ্ধ মহাপুরুষ হোন না কেন, শিষ্যকে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও শিক্ষা লাভ করেন। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার দ্বারা অধ্যাপক যেমন স্বীয় জ্ঞানের পুষ্টি সাধন করেন, তেমনি একদিকে যেমন গুরু তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার শিষ্যের কাছে উন্মুক্ত করে দেন, অপর দিকে তেমনি ভগবানের অনন্ত জ্ঞান তাঁর নিকট ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। শিষ্যের হৃদয়ে তিনি গুরুর আসন প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর পূজার জন্য এবং এই হিসাবে শিষ্যই তাঁর গুরু। যে সব উপচার দিয়ে শিষ্য গুরু-পূজা করে গুরু সে সব নিজে গ্রহণ করেন না, শিষ্য-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত তাঁর শ্রীগুরু-চরণে নিবেদন করেন। শিষ্য প্রত্যক্ষভাবে যেটাকে গুরুপূজা বলে মনে করে, পরোক্ষভাবে সেটা তার আত্মপূজা। গুরু তাঁর শিষ্যের বাহ্যপূজার মুখ ফিরিয়ে দিয়ে তাকে তার অজ্ঞাতসারে অন্তর্মুখী করে দেন। বলা বাহুল্য, এতে গুরু ও শিষ্য উভয়ে লাভবান হন।

গুরু কখনও কখনও নিজেকে শিষ্যবর্গের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত মনে করে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমবেতভাবে ব্রহ্মসাধন বা আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। আত্মা বা পরমাত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র পুরুষ আর যা কিছু সবই প্রকৃতি; এই হিসাবে গুরু শিষ্যে কোন পার্থক্য নাই বলে তিনি মনে করেন। সেই পরম পুরুষের সঙ্গে শিষ্যদের তথা নিজের সংযোগ সাধনের একটা উৎকণ্ঠা

শিষ্যদিকে নিয়ে গোসাঁইজীর সাধন-বৈঠক অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। ঠাকুর শ্রীশ্রীকুলদানন্দ শুধু এই প্রকার বৈঠকের সাহায্যে নয়, তাঁর প্রবর্ত্তিত মহাহোমের মধ্যদিয়েও শিষ্যগণের সঙ্গে একত্রে মিলিত হয়ে আত্মানুষ্ঠানের পথ আরও প্রশস্ত করতে চেয়েছিলেন। ধর্ম্মসাধন ব্যাপারটা অনেকটা ব্যক্তিগত হলেও এই প্রকার সমবেত সাধনের একটা সার্থকতা আছে এইজন্য যে এতে গুরু এবং শিষ্য পরস্পরের ধর্ম্মভাব মন্দীভূত হতে না দিয়ে প্রবলতর করে তোলে।

রাসপূর্ণিমায় প্রধানা নায়িকা শ্রীরাধার তাঁর সখীবৃন্দের সহিত মিলিত হয়ে বনমধ্যে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণের যে অপূর্ব্ব চিত্র শ্রীমদ্ভাগবতকার অঙ্কিত করেছেন তা'তেও এই তত্ত্বটাই ফুটে উঠেছে। কিন্তু এস্থলে আরও একটা বিষয় উপলব্ধি করা প্রয়োজন। শ্রীরাধা তাঁর সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেও এবং এই হিসাবে তাদের সঙ্গে নিজেকে এক পর্য্যায়ভুক্ত ভাবলেও মাঝে মাঝে কৃষ্ণভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা গ্রহণ করে তাঁরই মত আচরণ এবং অভিনয় করেছিলেন। গুরু তেমনি ব্রহ্মানুসন্ধান ব্যাপারে অনেক সময় নিজেকে শিষ্যবর্গের সঙ্গে সমভূমিতে অবস্থিত বলে মনে করলেও নিজের অজ্ঞাতসারে কখনও কখনও ভগবদ্ভাবে ভাবিত হয়ে তাঁর ভূমিকা গ্রহণ করেন অর্থাৎ তাঁর মধ্যে ভগবানের আবেশ হয়। ভাগ্যবান শিষ্যেরা গুরুকে এইভাবে এই অবস্থায় দর্শন করে তাঁর প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং অনেক সময় তাঁকে ভগবানের অবতার বলে প্রচার করতে গিয়ে সাধারণের কাছে উপহাসাস্পদ হন। কিন্তু তা হলেও গুরুর এই প্রকার ভাবাবেশ দর্শনমাত্র শিষ্য যে আধ্যাত্মিকতার পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে পড়ে তা'তে কোন সন্দেহ নাই।

মোটের উপর কথা এই যে সাধারণ সাধকের সিদ্ধি ও সাধনার মধ্যে একটা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ থাকলেও সদ্‌গুরুর অনুগত শিষ্যদের সাধনমার্গে

অগ্রগতি বা অধোগতি কোন নিয়ম মেনে চলে না। কখনও কখনও কঠোর সাধন ভজন সত্ত্বেও বাহ্যতঃ তাদিকে অধঃপতিত বলে মনে হয়, আবার সাধনহীন হয়েও সদ্‌গুরুর আশ্রিত শিষ্য আকস্মিকভাবে একটা উচ্চ অবস্থায় উন্নীত হয়েছে, এমনও অনেক সময় দেখা যায়! অতএব তাদের সম্বন্ধে কোন বিচারই চলে না। সদগুরুও অনেক ক্ষেত্রে তাঁর শিষ্যদেরও শিষ্য হয়ে চলতে চান বলে তাঁকে নানা প্রকার দীনতা এবং হীনতার আবরণ দিয়ে চলতে হয়, কিন্তু স্বভাব-উজ্জ্বল সুবর্ণে মালিন্য স্পর্শের আশঙ্কা কোথায়! এই কারণে তাঁদের সম্বন্ধে সাধারণতঃ যেসব বিরুদ্ধ আলোচনা করা হয় সেগুলো মোটেই বিচারসহ নয়। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"নরলীলায় অবতারকেও ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়, তাই চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, কখনো বা ভয়, ঠিক মানুষের মত। পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।"

আজ এই পর্য্যন্ত। আশা করি কুশলে আছ।

(বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈকা ছাত্রীকে লিখিত)

(প্রথম)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ দক্ষিণেশ্বর

৩।১।৫৩

কল্যাণীয়াসু—

Communismএর মোহ এমন নিবিড়ভাবে তোমাদিগকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে দেখে শুনে তোমাদের সম্বন্ধে আমি অতিমাত্রায় আতঙ্কিত হয়ে

উঠেছি। এই যে ভূতটী আমাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে এদেশে এসে সদর্পে বিচরণ করছে, তাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা না করে যেভাবে তোমরা তাকে উৎসাহিত এবং পুষ্ট করে তুলছ, তাতে ভারতীয় যে কৃষ্টি পশ্চিমের ভাবধারার প্লাবন থেকে কোনরূপে আত্মরক্ষা করে আজও বেঁচে আছে তা হয়ত অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

আমার ঠাকুর এবং গোসাঁইজীর তথা আর্য্যঋষিদের গৌরব তোমাদের দ্বারা রক্ষিত হবে ভেবে তোমাদিগকে পেয়ে কত আশাই আমি মনে মনে পোষণ করেছিলাম। ঋষিরা দেশ-বিদেশে ভারতীয় ভাবধারার যে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়েছিলেন এবং আজ যা ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ার সমূহ আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তাঁদের অভীপ্সিত পন্থা অবলম্বন করে তাকে তুলে না ধরে তোমরা যে মরণ পথের যাত্রী হয়েছ, তা দেখে আমার গুরু এবং পরমগুরু পরলোক থেকে আমার উপর অভিসম্পাত করবেন—ভারতীয় কৃষ্টি রক্ষার যে সামান্য ভার আমার মত অযোগ্য ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত হয়েছে ভেবে একটা সুগভীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করবেন। তোমরা বাইরে হয়ত তাঁদের দেওয়া মন্ত্র আউড়ে যাচ্ছ, তাঁদের নির্দ্দেশ মত কতকগুলি বাহ্য আচারও অনুষ্ঠান করছ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তোমরা তাঁদের প্রাণবস্তুর বিরুদ্ধে একটা বিরাট অভিযান সুরু করে দিয়েছ—এর চেয়ে কপটতা আর কিছু হতে পারে বলে আমি মনে করতে পারি না।

যেরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে Communismএর স্বপক্ষে সেদিন তর্ক জুড়ে দিয়েছিলে তা দেখে বিস্ময়ে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। সাম্যবাদ তোমাদের কাছে অভিনব বস্তু বলে মনে হলেও প্রাচীনযুগে আমাদের দেশে রাজারা সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য নীতি হিসাবে অন্য আকারে শুধু একে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তা নয়—সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই নীতি চতুষ্টয়ের মধ্যে সামকেই তাঁরা প্রথম এবং প্রধান স্থান প্রদান করেছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে আছে 'সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য'—সমতা অবলম্বন করা আর ভগবানের আরাধনা করা, এ দুই-এ কোন তফাৎ নাই। গীতাতেও ত পড়েছ—'সমত্বং যোগমুচ্যতে।' তা ছাড়া—"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনী—শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"—এ ত গীতারই কথা। সাম্যবাদ আমাদের প্রাচীনগণের নিকট সমধিক আদরের বস্তু ছিল এবং তাঁদের প্রচারিত সাম্যবাদই ছিল খাঁটী জিনিষ। তাকে ঠেলে ফেলে বিদেশী ঝুটা সাম্যবাদের আমদানী করে একটা হৈ চৈ করার অর্থ কি তা আমি ভাল বুঝি না। যে দেশে ঋষিরা 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' ইত্যাদি মহাবাক্য তারস্বরে ঘোষণা করেছিলেন—সে দেশে সাম্যবাদের উপদেশ দেওয়ার জন্য অপরের দ্বারস্থ হয়ে Marxism সম্বন্ধে রাশি রাশি সাহিত্যের প্রচার করে সুফল লাভের আশা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি হতে পারে? ঋষিরা যে সাম্যবাদের প্রচার ও আচরণ করেছিলেন তা ব্রহ্মের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু তোমরা যে সাম্যবাদের আলোকবর্ত্তিকা হাতে নিয়ে সারা দেশে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দিয়েছ তা ব্রহ্মের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ত নয়ই—বরং সাম্যের দোহাই দিয়ে সে বেদীকে ভেঙ্গে ফেলে বিশ্বটাকে সমভূমিতে পরিণত করাই তোমাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমাদের সাম্যবাদ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যার কতকটা সমাধান হয়ত করতে পারে, কিন্তু জীবনের দাবী শুধু রাজনীতি বা অর্থনীতিই নয়, জীবনের আর পাঁচটা দাবীকে বঞ্চিত করে তার দু'একটামাত্র দাবী পূর্ণ করলেই জীবন সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়ে যায় না। দেহ আর প্রাণ এ দুটো নিয়েই জীবন নয়—আমাদের ষট্‌কৌষিকী দেহে এ দুটি কোষ ছাড়াও যে আরও কোষ আছে, এ দুটোর অভাব ছাড়াও যে অন্যগুলোর অভাব নিবৃত্তির প্রয়োজন হতে পারে, তোমাদের Marxismএর সংকীর্ণ দৃষ্টি সে কথা গণনার মধ্যেও আনে নাই—তাই কোন রকমে গোঁজামিল দিয়ে এমন একটা

আপাতঃমনোরম মতবাদ লোকের সামনে ধরে দিয়েছে যেটা বর্ত্তমান যুগের অন্নগতপ্রাণ জীবের কাছে সমর্থন লাভ করছে সহজে।

বাহ্যতঃ সকল মানুষের কাঠামো অনেকটা একরকম হলেও অন্তরে অন্তরে মানুষে মানুষে বৈষম্য রয়েছে। এই বৈষম্যের কথা বিবেচনা না করে বাইরে সবারই জন্য একই রকমের গ্রাসাচ্ছাদন ইত্যাদির ব্যবস্থা করে তাদিকে সমানাধিকার প্রদান করলেই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে না, বরং বৈষম্যের প্রশ্রয় দেওয়া হবে। দুই আর তিন অসমান বস্তু। প্রত্যেককেই যদি পাঁচ দেওয়া যায় তবে তারা অসমানই থেকে গেল—তাদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলো না। কিন্তু প্রথমটিকে যদি পাঁচ আর দ্বিতীয়টাকে চার দেওয়া যায়, তবে দুটোই সাত হয়ে যায় অর্থাৎ সমান হয়। তেমনি মানুষের চিত্তবৃত্তি সমূহের মধ্যে পার্থক্য আছে বলে তাদের মধ্যে সাম্য আনতে হলে সবাইকে এক গোয়ালে পুরে তাদের জন্য একরকম ব্যবস্থা করলে চলবে না।

খাওয়া, পরা এবং থাকার মধ্যে একটা আড়ম্বর থাকলেই বাঁচার মত বাঁচা হল, জীবনের পূর্ণতা লাভ হল—এই উদ্ভট মনোবৃত্তি তোমাদের মধ্যে গভীরভাবে শিকড় চালিয়েছে দেখে আমার বিস্ময়ের অবধি নাই। ফলমূলভোজী হয়ে এবং জীর্ণ চীর এবং পর্ণ কুটীরমাত্র সম্বল করে আগেকার আর্য্যঋষিরা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে গেছেন এবং এই দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও তাঁরা মহাশক্তির উৎস ছিলেন—তাঁদের শিক্ষা এবং জীবনাদর্শ সমগ্র মানবজাতিকে কল্যাণের পথ দেখিয়েছে। তোমাদের মার্ক্সবাদ যে দেহাত্মবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেটা যে মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, এই উপদেশই তাঁরা জগতকে দিয়ে গেছেন, আর তাঁদের উপদেশ যারা গ্রহণ করবে তারাই বাঁচবে, তারাই অমৃতত্ব লাভ করবে বারংবার ঘোষণা করে গেছেন। যে মার্ক্সবাদের আলোকচ্ছটায় তোমাদের

চোখ ঝলসে গেছে সে জিনিষ জগতে নূতন নয়—কত আসুরী প্রকৃতির মানুষ এই প্রকার মতবাদের প্লাবনে জগৎকে প্লাবিত করবার হাস্যকর প্রচেষ্টায় তাদের মতবাদের সঙ্গে নিজেরাও ভেসে গেছে তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আর্য্যঋষিরা আজও বেঁচে আছেন তাঁদের বেদ-বেদান্ত উপনিষদ দর্শনাদির মধ্যে এবং চিরদিন থাকবেন—অন্ধকারাচ্ছন্ন জগৎকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করবার জন্য। তোমাদের সাম্যবাদ, আজ যা জগৎ গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে, তাও ভেসে যাবে—তবে এ জিনিষ এখনও প্রসার লাভ করছে কারণ বর্ত্তমান যুগে এর একটা সাময়িক প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কৌলিন্যের গর্ব্বে গর্ব্বিত উচ্চশ্রেণীকে সংযত করবার জন্য—তারা যে ভ্রান্ত পথে চলেছে এইটা তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য এ আন্দোলনের একটা সার্থকতা থাকলেও, লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে চলবে না। 'নাসতে বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'—সত্যের কখনও অপলাপ হয় না, আর মিথ্যা কখনও টেকে না। সব রকম মতবাদের অগ্নিপরীক্ষা আমাদের দেশে হয়ে গেছে; কিন্তু যেগুলো সত্য সেইগুলোই বেঁচে আছে আর যেগুলো বাজে জিনিষ সেগুলো এক একবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও জলবিম্বের মত কিছুকাল নৃত্য করে অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাহু যেমন সূর্য্যচন্দ্রকে গ্রাস করে সাময়িকভাবে জগৎকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয়, সাম্যবাদও তেমনি জগৎকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে; কিন্তু কাল পূর্ণ হলেই এ উদ্দামতা থেমে যাবে—আমার কাছে এ বিষয়টা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে।

ঠাকুর তোমাদের মধ্যে সুবুদ্ধি জাগ্রত করুন।

(দ্বিতীয়)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ যাদবপুর

১৬।১০।৫৬

বান্ধবেষু—

পুরাণাদি গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই আমাদের দেশে অনেকবার দৈত্য অসুর রাক্ষস প্রভৃতির অভ্যুদয় (Communismএর নামান্তর বলা যেতে পারে) হয়েছে, কিন্তু কিছুদিনের জন্য ত্রিলোকে আধিপত্য বিস্তার করে তারা বিলয় প্রাপ্ত হয়েছে। বংশানুক্রমে যারা অশিক্ষিত বা দরিদ্র বা নীচ, এক কথায় যাদের আভিজাত্যের গর্ব্ব করবার মত কিছুই নাই তাদের ওপর উচ্চ শ্রেণীর লোকের অনেক সময় একটা তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। অধিকাংশ সময়ে নিজেদিকে অধঃপতিত ভেবে এই তাচ্ছিল্য তাদের পাওনা মনে করে তারা হজম করে নিয়েছে; কিন্তু এমনও অনেক সময় হয়েছে যে এই অনুন্নত এবং অবজ্ঞাত শ্রেণীর মধ্যে দুএকজন শক্তিশালী পুরুষ আবির্ভূত হয়ে অভিজাত শ্রেণীর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে এবং স্বজাতীয়গণকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলে তাদের মধ্যে আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ করেছে। দেবতা প্রভৃতি অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন এবং বিদ্রোহের সৃষ্টি করে অনেকবার তারা তাদের অধিকার হরণ করে নিয়েছে এবং শুধু যারা তাদের সমকক্ষ নয় তাদিকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেছে। এই সকল অসুর প্রকৃতির লোক ধর্ম্মকে ব্যবহার করেছে বাহ্য সম্পদ লাভের উপায় রূপে—ভগবানের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নয়। ভগবানকে বাদ দিয়েই তারা মনগড়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেছে, কারণ তাদের দাম্ভিকতা তাদের চেয়ে উচ্চ বলে আর কাউকে স্বীকার করতে চায় নাই। বরলাভ করবার জন্য বা নিজেদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তারা শিব, শক্তি, ব্রহ্মা প্রভৃতির আরাধনা

করত ; কিন্তু এ আরাধনার অর্থ ছিল অন্যরূপ। আজকালকার জড়বাদীরা এক একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করে নিজেদিকে তথা জাতিকে সমৃদ্ধিশালী করবার জন্য যে ভাবে প্রকৃতিপাঠে অভিনিবিষ্ট হয় বা তাতে তন্ময় হয়ে যায়, তাদের তপস্যাও ছিল ঠিক সেই প্রকার। প্রকৃতির দানে সমৃদ্ধিশালী হয়ে আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা এমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে যে তাদের আবিষ্কারের মোহ মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে ক্রমশঃ বিশ্ব-প্রকৃতির উপর আধিপত্য এমন কি তাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। আগেকার দৈত্য প্রভৃতিও তেমনি দেবতার বরে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে স্বর্গরাজ্য বিধ্বস্ত করে দেবতাদেরই উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। দৈত্য এবং রাক্ষসগণ কর্তৃক দেবতাদিগকে বন্দী করা এবং তাদিকে অতি হীন কার্যে নিয়োগ করার আখ্যায়িকা পুরাণাদির বহু স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

দৈত্য প্রভৃতির অভ্যুদয় বিনা কারণে বা বিনা প্রয়োজনে হয় নাই। অভিজাত সম্প্রদায় যতদিন অনুন্নত শ্রেণীর প্রতি একটা দরদ ও সহানুভূতির ভাব নিয়ে তাদিকে ক্রমোন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, ততদিন তারা তাদিকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখে এবং তাদের প্রাধান্য স্বীকার করে নিজেদের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু কাল-প্রভাবে যখন উচ্চশ্রেণীর লোকেরা নিম্নশ্রেণীর প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে, ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার গর্ব্বে যখন তারা নিম্নশ্রেণীর উপর অবাধে অত্যাচার উৎপীড়ন সুরু করে দেয়, তখন তাদের মধ্যে চাপা একটা প্রতিহিংসার ভাব জাগ্রত হয়ে ধূমায়িত হতে থাকে। তারপর যখনই একজন শক্তিশালী পুরুষ এদের মধ্যে আবির্ভূত হয় তখন তাকে কেন্দ্র করে তারা একটা প্রবল সংহতি গড়ে তোলে বরং অনুকূল অবস্থা বুঝে প্রচণ্ড বিদ্রোহের সৃষ্টি করে, যাকে রোধ করা বা ঠেকিয়ে রাখা অভিজাত শ্রেণীর পক্ষে দুরূহ হয়ে ওঠে। এই প্রকার সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন হয়েও নিজেদিকে

শোধরাবার চেষ্টা না করে উন্নত সম্প্রদায় তাদের শক্তি, সামর্থ্য ও সম্পদের উপর নির্ভরশীল হয়ে তাদিকে দমিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হয়; কারণ সাশ্চর্য্যে তারা দেখতে পায় দলে দলে সকলে বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করছে। এই প্রকারে বিদ্রোহীরাই সমস্ত বিশ্ব গ্রাস করতে উদ্যত হয় এবং তাদের শাসনে সর্ব্বত্র ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। এই সঙ্কট কালে অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে এবং তাদের শক্তি অসুর দমনের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত দেখে নিজেদিকে সংশোধিত করবার বা আত্মশুদ্ধির জন্য একান্তভাবে ধর্ম্ম ও ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অবশেষে নিজেরাও বেঁচে যায় এবং জগৎকেও রক্ষা করতে সমর্থ হয়। পুরাকালে বহুবার এইরূপ হয়ে গেছে এবং আজ যা হচ্ছে বা হতে চলেছে তা পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি। একে একটা অভিনব বা অপূর্ব্ব বস্তু ভেবে আনন্দে উৎফুল্ল হওয়ার কোন হেতু নাই। ধর্ম্মকে গলা টিপে মেরে ফেলে অন্নবস্ত্রের অভাব মেটাবার জন্য এই যে আসুরী আন্দোলন সুরু হয়েছে, এতে সাময়িকভাবে কতকটা সাফল্য হয়ত লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মহীনতাকে প্রশ্রয় দিয়ে কোন জিনিসই টিকতে পারে না। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়ে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়ে যে জাতি স্থির সিদ্ধান্ত করে গেছেন—'ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ'—অপরের নাচনে নেচে সে জাতি দেহ এবং ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব হয়ে যদি পশুত্বের অভিনয় করে, তবে এর চেয়ে পীড়াদায়ক আর কি হতে পারে? আর্য্যঋষিরা আমাদের এই কথাই শিখিয়েছেন যে অন্নবস্ত্রের অভাব স্বীকার করে ধর্ম্ম বজায় রাখার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, কিন্তু ধর্ম্মহীন জীবন যাপন করে অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস করার কোন গৌরব নাই। অন্য কোন কিছুর সাহায্য নিরপেক্ষ হয়ে একমাত্র ধর্ম্মই মুমূর্ষু জাতির মধ্যে চেতনার সঞ্চার করতে

পারে—সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান করে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়—এই কথাই তাঁরা শাস্ত্র-গ্রন্থাদির মধ্যদিয়ে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করে গেছেন—'ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্' —এই তাঁদের অবিসংবাদী সিদ্ধান্ত।

ধর্ম্ম অন্তরের বস্তু। অতএব Communismএর মধ্যেও ধর্ম্মের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার কোন বাধা নাই—ইত্যাকার যুক্তি দিয়ে অনেকের চোখঠারার কোন অর্থ হয় না। শাসন পদ্ধতির মধ্যে যদি ধর্ম্মসাধনের কোন সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকে, বহিরঙ্গ সাধনকে যদি উৎসাহ প্রদান করা না হয়, তবে ব্যক্তিগতভাবে অন্তরঙ্গ সাধনের উৎসাহও ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে এবং তার ফলে একটা ধর্ম্মবিমুখতাই জনগণের মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে।

জগতের নাড়ীনক্ষত্র ঋষিরা জানতেন। তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত দ্রষ্টা। পৃথিবীর সুখ, সম্পদ এবং স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁরা যে উপায় নির্দ্দেশ করে গেছেন, তা ছাড়া অন্য পথ নাই। বর্ত্তমান যুগে জগতে যে অসংখ্য রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে, ধর্ম্মান্ধতাই তার কারণ। এই সত্যটা অস্বীকার করে জগৎকে বাঁচাবার জন্য সনাতন ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করে যে নূতন ধর্ম্ম বা মতবাদ মাথা তুলবার চেষ্টা করছে, তা'তে তোমাদের অন্তরের যোগ রয়েছে জেনে আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। যাদের নিজেদের ঘরের সম্পদে ছাতা পড়েছে, তাদের পক্ষে পরের দুয়ারে ভিখারী হয়ে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্য একটা উদ্ভট অর্ব্বাচীন ধর্ম্মকে নিয়ে মেতে উঠার চেয়ে মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয়তর বলে আমি মনে করি। ঐ শোন কুরুক্ষেত্রের বিশ্ববিধ্বংসী রণ কোলাহলের মধ্যে আজিও ধ্বনিত হচ্ছে পাঞ্চজন্য শঙ্খ-নিনাদ—'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।'

বেশী লিখে লাভ নাই। আত্মস্থ হতে চেষ্টা কর, সমস্ত মোহ কেটে যাবে।

(কিরকেন্দ বাজারের জনৈক M. B. B. S. ডাক্তারকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্ খাপা, নাগপুর

১২।১১।৬২

বাপুদেবেষু—

তুমি প্রশ্ন করেছ, আমিষাশীর পক্ষে ভগবল্লাভ সম্ভব কিনা ; যদি সম্ভব হয়, তাহলে নিরামিষের নিষ্ঠার ওপর আমরা এত গুরুত্ব আরোপ করি কেন ? এই প্রশ্নের সঙ্গে আরও বলেছ, কর্ম্মই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে কর্ম্মশক্তি যাতে বৃদ্ধি পায়, তাই করা উচিত নয় কি ?

তুমি একজন চিকিৎসক। কোন্ খাদ্য মানুষের সত্যিকার প্রয়োজন, সেটা সাধারণের চাইতে তোমারই জানবার কথা। কাজেই তোমার এই প্রশ্নে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন থেকেই আরম্ভ করা যাক। মানুষের কর্ম্মই যে ধর্ম্ম, তা'তে কোনও সন্দেহ নেই। আমার পূজ্যপাদ গুরুদেবের "শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ" গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই তুমি পড়েছ, আর তা'তে একথা বিশদভাবেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রেও এই কথার, অর্থাৎ কর্ম্মই যে ধর্ম্ম, তার সত্যতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে যে কথাগুলি যোগ করে তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি উত্থাপন করেছ, তা'তে দেখছি, তুমি ধরে নিয়েছ যে আমিষ আহারেই মানুষের কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ নিরামিষ আহারে যেন তা সম্ভব নয়। তুমি চিকিৎসক হয়ে একথা বললে কি করে, তাই ভাবি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নায়ক হিটলার যে নিরামিষাশী ছিলেন, একথা কি তুমি জান না ? না কি তার কর্ম্ম-শক্তিকে তুমি অস্বীকার কর ? মহাত্মা গান্ধীর বিস্ময়কর কর্ম্মজীবনটীও প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ে। আসমুদ্র-হিমালয় সমগ্র ভারতের জন-জাগরণ ও জন-আন্দোলনের প্রাণস্পন্দন এই নিরামিষাশী মানুষটীর মধ্যেই তোমরা

দেখেছ। যদি বল, এসব দুই একটা ব্যতিরেক মাত্র, আর এই ব্যতিরেক দ্বারা বিপরীতটার সত্যতাই প্রমাণসিদ্ধ হয়, তাহলে আমি তোমাকে আর একবার তোমার দেশেরই রাজপুতদের ইতিহাসটা পড়ে দেখতে বলবো। পৃথিবীর কোন্ দেশের মেয়েরা জহর-ব্রত করতে পেরেছে? পৃথিবীর কোন্ দেশের ইতিহাসে রাণা প্রতাপের মত বীর ক'টাই বা দেখেছ? এরা তো সবই নিরামিষাশীর দল।

যদি খাদ্য-প্রাণের কথাই ধরো, তবে তোমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে যে ক'টা খাদ্য-প্রাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে ক'টা ভিটামিন, প্রোটিন, অথবা ফ্যাট্, কার্ব্বো-হাইড্রেটের উল্লেখ করা হয়েছে, নিরামিষ খাদ্যে তার কোন্‌টার অভাব আছে বল দেখি?

দেখ, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করলে শাস্তি পেতেই হবে। আর প্রকৃতির সঙ্গে সদ্ভাব বা সামঞ্জস্য রক্ষা করে চললে সব দিকেই কল্যাণ হবে। মানুষের শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধিটাই বাঞ্ছনীয়। অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সংঘটন করতে হলে প্রকৃতির সঙ্গে সদ্ভাব বা সামঞ্জস্য রক্ষা করা চলে না। আমিষ আহারে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী করে তোলা হয়। আজ বিজ্ঞানের যুগে একথা তো সর্ব্ববাদীসম্মত যে, অস্বাভাবিক বৃদ্ধি অকাল মৃত্যুরই কারণ। বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে মাটী থেকে স্বভাববিরুদ্ধ বর্দ্ধিত পরিমাণে ফসল ফলানো হচ্ছে, সে মাটীর উর্ব্বরতা শক্তিও সেই পরিমাণে দ্রুত হ্রাস হয়ে আসছে। এও তোমাদের বৈজ্ঞানিকেরই মত। মাংসাদি আমিষ-আহারে দেহের স্নায়ুকোষগুলিকে দ্রুত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চঞ্চল ও উত্তেজিত করে, অল্প সময়ের মধ্যে তাদের দিয়ে সমস্ত শরীরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটানোর চেষ্টায় মানুষের পরমায়ুও দিন দিন হ্রাস পেতে বসেছে। এতো statisticsএর সাহায্য না নিয়েও স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। অথচ আমাদের দেশের বিধবাদের পরমায়ু একটা লক্ষ্য করবার বিষয় নয় কি?

দীর্ঘ পরমায়ু ও সুস্থ শরীর সকলেরই কাম্য। ধর্মজীবনে এর প্রয়োজন কতখানি তা তো বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু দেহের ভিতর আহারের মধ্যদিয়ে ক্রমাগত যদি নানা রোগের জীবাণু ও বিষ সঞ্চারিত করা হয়, তাহলে সেটা সম্ভব কি? পুষ্টিতত্ত্ববিদ্ ডাঃ হেগ্ বলেছেন, "মাংসে Purin Bodies বা Uric Acid থাকে। ইহা দেহে সঞ্চারিত হইয়া নানাবিধ রোগের সৃষ্টি করে। তবেই দেখ, আমিষ আহারে অকাল-মৃত্যুকেই ডেকে আনা হয় কিনা। তোমার কর্ম্ম করবে কে? মানুষটা বেঁচে থাকলে তবে না কর্ম্ম? সত্য কথা বলতে কি, আজকাল Blood Pressure, Coronary Thrombosis প্রভৃতি ভয়াবহ রোগের প্রাদুর্ভাব ও ক্রম-প্রসার দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠছি।

বর্ত্তমান যুগের চিন্তানায়ক জি. বি. স'এর পরমায়ু ও প্রতিভা দুটোই লক্ষ্য করবার বিষয়। ইনি একজন নিরামিষাশী, তা তুমি নিশ্চয়ই জান।

দেখ, বহুকারণে প্রাচীন ঋষিগণ ও আধুনিক মনীষীবৃন্দ আহারশুদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দেহের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করবার উপায় নেই। তাই দেহকে অশুদ্ধ রেখে মনকে শুদ্ধ করবার চেষ্টা একান্তই দুরূহ। ধর্ম্মজীবন লাভ করতে হলে, ইষ্টের পথে চলতে গেলে, সাত্ত্বিকগুণ যাতে পুষ্ট হয়ে ওঠে, তা তোমায় করতেই হবে। তোমাদের ইংরেজী ভাষাতেও দেহটাকে ভগবানের মন্দির বা Temple বলা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি, তামসিক আহারে এই দেবতার মন্দিরটাকে কি শুচি শুদ্ধ রাখা সম্ভব? ডাঃ সিসিল ওয়েভ জন্‌সন্ বলেছেন, "যারা অত্যধিক মাংসাহারী, তাদের প্রকৃতি অধিক উগ্র, নিষ্ঠুর ও হিংস্র হয়।" এমন উগ্র, নিষ্ঠুর, হিংস্র প্রকৃতি নিয়ে বাসুদেবের উপাসনা কি করে করবে?

ধর্ম্মের পথ—প্রেমের পথ। এ পথের পাথেয় শুচিতা, পবিত্রতা, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, বিনয়, দৈন্য, নিরহঙ্কার, নিরভিমান, চিত্তের অচঞ্চল—একাগ্রতা।

সাত্ত্বিক আহারে বা নিরামিষ আহারে এই সব গুণগুলির বিকাশে ও পরিপুষ্টি সাধনে বিশেষ সহায়তা করে। কিন্তু আমিষ আহারে ঠিক এইগুলিরই বিপরীত ঘটে না কি?

মাংসাদি আহার দৈহিক কোষগুলিতে এমন একটা দহনশীল চঞ্চল উত্তেজনার সৃষ্টি করে যে, চিত্তের প্রশান্তি ও ধৈর্য্যকে বিপর্য্যস্ত করে সাধন-প্রয়াসীকে নোঙ্গর-বিহীন জাহাজের মত অকূলে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমিষ আহারে স্নায়ুগুলি অনিয়ন্ত্রিত ও ছন্দহীন হয়ে তার যে এই রকম সর্ব্বনাশ সাধন করবে তা'তে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

অবশ্য যে সব দেশে মাছ মাংস ব্যতীত অন্য খাদ্য সংগ্রহ করা যায় না, কিংবা যে সব দেশ অতি শীত প্রধান, সে সব দেশের কথা স্বতন্ত্র। তবে একথাও মনে রাখা উচিত যে, এমন সব দেশে প্রকৃতির বিধানও স্বতন্ত্র। প্রকৃতির সাধারণ বিধান যে সমতা-রক্ষা, সে সব দেশে সে সাধারণ নিয়ম ব্যাহত হয় না। সেখানে আমিষাহারের ক্ষতিটুকু প্রকৃতিদেবীই পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবহাওয়ার দ্বারাই খণ্ডন করে দেন।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ-নিরামিষাশী ছিলেন না সত্য, কিন্তু তিনিও মুক্তকণ্ঠে বলে গিয়েছেন, "আমরা খাইতে চাই তাই খাইয়া থাকি। আমি নিজে একজন নিরামিষ-ভোজী না হইতে পারি, কিন্তু আমি নিরামিষ ভোজনের আদর্শটী বুঝি। যখন আমি মাংস খাই, তখন আমি জানি অন্যায় করিতেছি। ঘটনা বিশেষে আমি উহা খাইতে বাধ্য হইলেও আমি জানি উহা অন্যায়। আমি আদর্শকে নামাইয়া আমার দুর্ব্বলতার সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব না।"

এই প্রসঙ্গে তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কেও তুমি অনুরূপ প্রশ্ন করতে পারতে। তা যখন করনি, তখন আমিই তদ্বিষয়ে একটী কথা বলে রাখতে চাই, যাতে

ভবিষ্যতে এদিক দিয়েও তোমার চিত্ত না বিভ্রান্ত হয়। মনে রেখো, তান্ত্রিক সাধনার মূল কথা—ত্যাগের উদ্দেশ্যে গ্রহণ, গ্রহণের উদ্দেশ্যে গ্রহণ নয়। তন্ত্রের ত্রিবিধ সাধনের এই মূল কথাটী তোমার সম্ভাব্য সন্দেহের নিরসন করবে।

আশা করি, এর পর আমিষাহারীর পক্ষে ভগবৎ-লাভ সম্ভব কিনা, এ প্রশ্ন আর তুলবে না। পত্রের অল্প পরিসরে তোমার প্রশ্নের উত্তরে এর বেশী বলা সম্ভব নয়।

তোমার কুশল কামনা করি। আমার শরীর একপ্রকার।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

ভুবনেশ্বর

৭।৪।৫০

প্রীতিভাজনেষু,

প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভের পক্ষে ভাবুকতা প্রধান অন্তরায় মাঠাকুরাণী ঠাকুরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন "যদি ধর্ম্মধনে ধনী হ'তে চাও, তবে বড় কৃপণ হয়ো।" যেটুকু সত্য লাভ করা যায়, তা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অতি গোপনে রাখবার চেষ্টা চাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী আলোচনা করে ডঃ বড়ুয়া মত প্রকাশ করেছিলেন: ..."ব্রহ্মচারিজীর জীবন অপূর্ব্ব পাথর চোয়া জল, কোন হেল দোল নাই...।" আধ্যাত্মিক সমস্ত শক্তির আধার হয়েও সমস্ত ভাবের বন্যায় ভিতরটা উদ্বেলিত হয়ে উঠলেও আমি চাই যে সমস্তটা গোপন করবার ও সাধারণের মত চলবার শক্তি আমার সকলে অর্জ্জন করুক। অবশ্য প্রাণের আবেগে সকল কথা

গুরুকে না জানিয়ে উপায় থাকে না এবং এটা সেই লীলাময়েরই লীলা, তবু আমি চাই যে, সমস্ত গোপন রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।··· আমি আর দশজনের মত সাধারণ জীব মাত্র, রোগে শোকে নিজেই জর্জ্জরিত। যাঁর শক্তিতে জগৎ চলেছে, সেই সর্ব্বশক্তির আধারের শ্রীচরণে আপনাদের সমর্পণ করে আমি নিশ্চিন্ত আছি। যতই সমস্ত সদ্‌গুণ তাঁতে আরোপ করে তাঁকে সদ্‌গুরু রূপে বরণ করতে পারবেন, ততই নিজের উন্নতি পরিলক্ষিত হবে, তাঁর শ্রীচরণের প্রসাদ লাভে কৃতার্থ হবেন।

যে স্বপ্নে দেবদেবী গুরু প্রকাশিত হন, তা স্বপ্ন নয়, জীবনের অবস্থা—সেসব লিখে রাখবেন। গোসাঁইজী সাক্ষাৎ ৺জগন্নাথ তাতে আর সন্দেহ কি ?

হ্যাঁ, গুরুগিরির মজা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে আমাকে পরীক্ষা করেন, আবার সইয়ে তো তিনিই নেন। তাঁর ইচ্ছার জয় হোক। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁর ইচ্ছায় বাতাসে এঁটো পাতার মত পড়ে থাকতে পারি—যে কোন আস্তাকুড়ে নিয়ে ফেলুন ক্ষতি নাই।

···আমি এখন ভালই বোধ করছি, কোন গ্লানি নাই। পৌষ মাস পর্যন্ত নানা দুর্দ্দশার ভিতর দিয়ে যেতে হবে। নামই একমাত্র অবলম্বন—চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন।

"অবনত ভারত চাহে তোমারে—
এসো সুদর্শনধারী মুরারী ॥"

সকলের মঙ্গল হোক্। ইতি—

আঃ ব্রহ্মচারী।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

ভুবনেশ্বর

৯।৯।৫১

স্নেহাস্পদেষু,

সুদীর্ঘ পত্রে তোমার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থার ছবিটী বেশ সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সদ্‌গুরু সঙ্গ ৫ম খণ্ডে ১৯৩ পৃষ্ঠার উপদেশ ভাল করে পড়বে। বিপদে অধৈর্য হলে বিপদ ততই চেপে ধরে, অধীর হলে উপায় গ্রহণে ব্যাঘাত হয়। ধীর স্থির হয়ে সাধন করে যাও, চিত্ত যত স্থির হবে ততই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান পরিষ্কার ফুটে উঠবে। ভগবানের নির্দ্দেশ অন্তরে জেনে সেই মত কার্য করতে পারলে সমস্ত মঙ্গল হবে।

সংসারে সকলে আসে নিজের প্রয়োজনে, কার্য শেষ হলে কারো অপেক্ষা করে না এই নিয়ম। শোক চাপতে নাই, প্রাণ খুলে নির্জ্জনে বসে কাঁদবে, সমস্ত ব্যথা ঠাকুরের শ্রীচরণে নিবেদন করবে—নামের মত জুড়াবার বস্তু আর কিছু নেই।...মায়ীর গুণগ্রাম যতই স্মরণ করবে তোমার কল্যাণ হবে, চিত্ত পবিত্র ও কোমল হবে—তার আত্মাকে আহ্বান করে পাঠ ইত্যাদি শোনাবে। শোক বিষম জিনিষ—সময়ে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—ঠাকুরের নাম কর, শীতল হাওয়ার মহৌষধ ঐ নাম। মায়ীর আত্মার কল্যাণ কামনায় মাসিক শ্রাদ্ধ বেশ নিষ্ঠা সহকারে করবে, তাতে তোমারও প্রভূত কল্যাণ হবে। ভবিষ্যৎ নিয়ে অত মাথা ঘামাবে না—ভগবান বলেন "যে করে আমার আশ তার করি সর্ব্বনাশ—তাতেও যদি না ছাড়ে আশ, তারে করি দাসের দাস।" ভগবানকে লাভ করতে হবে, সুতরাং মাঝখানে কোন বন্ধনের কথা ভাবলে চলবে কেন? "তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে"—এই অবস্থা আমাদের আদর্শ। বন্ধনগুলি ঠাকুর

যতই কাটান, ততই মঙ্গল, কিন্তু আমরা মায়ামোহ বশে সহ্য করতে পারিনা বলেই যা কষ্ট। 'বক্তৃতা ও উপদেশ' খুব পড়বে—ভগবানকে ধরে থাক, তিনি সময় মত মনের দুর্ব্বলতা দূর করবেন।

…রাণী আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল তা জানি এবং তার সে আকাঙ্ক্ষা আদৌ অপূর্ণ ছিল না। তোমরা বাইরে থেকে তাকে যা দেখেছো সেটা তার প্রকৃত স্বরূপ নয়—বাইবে শরীরের ভোগ হয়েছে, কিন্তু অন্তরে তার ছিল অপার আনন্দ। বহু জন্মের কঠোর সাধিকা, সামান্য ভোগক্ষয়ের জন্য এসেছিল—আত্মা নির্ম্মল হয়ে পরমানন্দে আছে।

…প্রায় প্রত্যেক আত্মাকেই মৃত্যুর পর এক বৎসর পিতৃলোকে প্রেত শরীরে থাকতে হয় এবং এই সময় শ্রাদ্ধাদি কার্যে যে সব অর্পিত হয়, তাই সূক্ষ্মভাবে আত্মার তৃপ্তিসাধন করে। এক বৎসর পর শ্রাদ্ধাদি কার্যের পরে গয়ায় পিণ্ড দেওয়া বিধি এবং সেই সময় প্রেতাত্মা মুক্তি পেয়ে তার সাধনোচিত ধামে চলে যায়, এটা শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা।

…সকলকে নিয়ে প্রতি রবিবার বা সপ্তাহে কোন একদিন বৈঠক করতে পারলে ভাল হয়। এসব বিষয়ে অগ্রণী হলে মনটাও স্থির থাকবে।…সকল দিক সামঞ্জস্য রেখে যতটা সম্ভব আদেশ পালনে ব্রতী হবে।

সকল বিষয়ে তোমার চেয়ে তোমার সম্বন্ধে আমার ভাবনা কম নয়। ঠাকুর সহায় হউন।

নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমারই ঠাকুর

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

ভুবনেশ্বর
৮।১০।৫১

প্রীতিনিলয়েষু,

পত্রাদি না পেয়ে একটু উদ্বেগ ভোগ করছিলাম বৈকি। সাধন ভজন নিয়ে উভয়ে একপ্রকারে দিন কাটাচ্ছেন জেনে কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম। ...শারীরিক অবসাদাদি দূর করবার জন্য একটু ওষুধ খাওয়া বোধহয় যুক্তিসঙ্গত। ...আমার নিজের গতিবিধি সব অনিশ্চিত—তাছাড়া, অভিভাবক সঙ্গে না থাকলে আশ্রমে কোন স্ত্রীলোককে রাখা সঙ্গত হবে কি ?

...বাবা তাকে ব্রহ্মচর্যের পথে ত্যাগের পথে চালাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন, তখন তার শরীরের অবস্থা শোচনীয় দেখেছিলেন বলে ; কিন্তু এখন আর তার সে ব্যাকুলতা নেই, তাকেও সে ভাবের ভাবুক দেখি না। ...দেশ ও দশের সেবায় এক বিপদ আছে, সেটা হচ্ছে প্রভুত্বপ্রিয়তা, কর্ত্তৃত্বলোভ। লোকে স্বাভাবিকভাবে মান্য করতে আরম্ভ করে আর কর্মীর মধ্যে কর্ত্তৃত্বলোভ বাড়তে থাকে। কর্ত্তৃত্বলোভ তাকে সাধনমন্ত্র একরকম ভুলিয়ে দেয়, নেতৃত্বের নেশা তখন তার কুশাগ্র নন্দী অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকেও ভোঁতা করে দেয়। তার দূরদৃষ্টির অত্যুজ্জ্বল প্রভাকে মলিন করে দেয়, তার স্বচ্ছ হৃদয়বৃত্তিকে আবিল করে দেয়, তার আকাশের মত উদার চিত্তকে ঈর্ষা বিদ্বেষের হলাহলবর্ষী কৃষ্ণমেঘজালে আচ্ছন্ন করে দেয়। কর্ত্তৃত্বের লোভ তাকে তখন এমনই অন্ধ করে যে, যে গৃহযুদ্ধ জাতীয়তার সর্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ শত্রু তাকেই সে পরম বন্ধু ব'লে ডেকে এনে আলিঙ্গন দেয়, স্বার্থান্ধ হয়ে নিজের লোকদেরই সর্বনাশ সাধনে তৎপর হয়—এইভাবে

নিজের সর্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে দশেরও সর্বনাশ করে। এরূপ সঙ্কটস্থলে কর্মীর বন্ধু ও হিতাহিতকাঙ্ক্ষীদের উচিৎ হবে তাকে বহির্মুখ কর্মপন্থা ত্যাগ করে ভগবৎ সাধনার যোগে অন্তর্মুখ হওয়ার জন্যে উপদেশ দেওয়া। কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কর্তৃত্বের অভাবে দেশের তেমন ক্ষতি হয় না, জাতি জাহান্নামে যায় না; কিন্তু কোন প্রভাবশালী কর্মী যদি নিজ কর্তৃত্বের নেশায় মত্ত হয়ে নীচ পন্থার আশ্রয় নেয়, হীন ষড়যন্ত্রের পথে পদসঞ্চার করে, তাতে দেশের ঘোরতর দুর্গতির সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক কর্মীর উচিত হবে ভগবৎ সাধনাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু করা—নামকে প্রকৃত অবলম্বন করতে পারলে কর্তৃত্ব-লিপ্সা কর্মীকে নিরয়গামী করবে না, ভ্রাতৃবিরোধের কলঙ্কময় কাহিনীর লজ্জা থেকে সে রক্ষা পাবে। যে ধর্মপথে চলে সে নিজের স্বার্থ অপেক্ষা দশের স্বার্থ বড় করে দেখে, ত্যাগের ক্ষমতা তার বর্দ্ধিত হয়, তার ভোগলুব্ধতা সঙ্কুচিত হয়। যা ঐক্য সাধনার বিরোধী, পরশ্রী কাতরতার প্রশ্রয়কারী, খলতার বর্দ্ধনকারী, তা কখনও ধর্ম নামে অভিহিত হতে পারে না। সাবধান করে দেওয়ার সৎসাহস থাকা উচিত।

শ্রীশ্রীসদগুরুবাণী বইখানার শেষদিকে যেসব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে ঐগুলি খুব প্রয়োজনীয় হলেও পুস্তকের মূল বিষয়ের সহিত ঐগুলির তেমন সম্বন্ধ নাই; কাজেই ঐগুলি যদি নূতন প্রচেষ্টায় (গুরুতত্ব ও নামসাধন রহস্য) সন্নিবেশিত করেন এবং আর একটু বিস্তারিতভাবে লেখেন তবে বোধহয় ভাল হয়।···আমি আজকাল বাইবেল ও কোরাণ নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত। কাজেই অন্যদিকে মন দেওয়ার সময় কম, শরীরটাও খুব অনুকূল নয়।

···শিষ্যের যদি না থাকে গুরুর উপর নির্ভর, আর গুরুর যদি না থকে শিষ্যের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, তাহলে উভয়ের মধ্যে কখনও প্রকৃত প্রেম জন্মিতে পারেনা এবং সেক্ষেত্রে যেমন শিষ্যকে দিয়ে একদিকে গুরু জগৎকল্যাণ করাতে অসমর্থ হন, অপরদিকে তেমনি শিষ্য গুরুর জীবন, কর্ম, চিন্তা ও বাক্য

হতে মনুষ্যত্ব গঠনের, জীবনোৎকর্ষ বিধানের ও লোক কল্যাণ সাধনের উপাদান সংগ্রহে অসমর্থ হয়। শিষ্য যদি গুরুতে নির্ভর রাখে, তাতে গুরুর প্রচ্ছন্ন সাত্বিকীশক্তিগুলি, সঙ্গোপিত কল্যাণপ্রভাবগুলি শিষ্যের মঙ্গলের জন্য অদৃশ্য ও অপার্থিবভাবে কার্যকরী হয়। আর গুরু যদি শিষ্যের ভবিষ্যতে খুব বিশ্বাস রাখেন তাতে শিষ্যের অসীম কল্যাণ, তাতে শিষ্য অসাধ্য সাধনে সক্ষম হয়। কিন্তু এটা মনে করা ভুল যে বিনা সাধনায় বিনা অধ্যবসায়ে আপনাআপনি এই নির্ভরতা এসে যাবে। বহু চেষ্টায়, বহু সাধনায় আত্মসমর্পণের অমোঘ শক্তি জাগ্রত হয়, বিশ্বাস ও নির্ভরতার চিরস্থায়ী আসন রচিত হয়।

গুরুতত্ব লিখছেন, বড় কঠিন বিষয়—চর্বিত চর্বণ না করেন। সাধনবলে বলীয়ান হতে হবে, আগে প্রজ্ঞা-চক্ষু উন্মীলিত করে নিতে হবে। প্রজ্ঞা-চক্ষু কখনও ভুল দেখে না, এজন্য উহাই পথ নির্দেশের নির্ভরযোগ্য গুরু।

ব্রহ্মই গুরু—জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সেই গুরুর প্রকাশ বা বিভূতি। সর্বত্র তাঁর গতি ও স্থিতি, সর্বভূতে তিনি বিরাজমান। আহার্যরূপে তিনি আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন, জলরূপে তৃষ্ণা নিবারণ করেন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রূপে আমাদের প্রাণ রক্ষা করেন—তিনি অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ। দৃষ্টির দৈন্য দোষে আমরা মানুষকে গুরু বলে গ্রহণ করি। এবং ব্রহ্মের প্রাপ্য পূজা মানুষকে দান করি। যার ভক্তি হয় সে মানুষকেই গুরু বলে মান্য করুক, পূজা করুক—যদি অকপট হয় তবে তাতেই তার মোক্ষপ্রাপ্তি হবে; কিন্তু নির্দিষ্ট একটী মানুষকে কষ্ট কল্পনা করে ব্রহ্ম বলে ধারণা করতে যাওয়া প্রকৃত ব্রহ্মবাদের বিরোধী। জগদ্‌গুরুর প্রকাশই সর্বভূতে, সুতরাং মানুষও গুরু তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু একমাত্র মানুষটাই গুরু নন, সর্বভূতাত্মা সর্বভূত তোমার গুরু। সেই পরম গুরুর সাক্ষাৎ কৃপালাভের জন্য আজ জগৎ জাগ্রত হোক, সর্বপ্রকার হীন সাম্প্রদায়িকতার হীন পরিবর্দ্ধন হ'তে মুক্ত হ'য়ে আজ সকলে বজ্রকণ্ঠে বলতে

শিখুক—সত্যই আমাদের গুরু। সকলে সত্যকে আশ্রয় করুক, সত্যের জয় জয়কার সকলের দ্বারা ঘোষিত হোক। যিনি সত্যদ্রষ্টা তাঁকেই গুরু বলে মানা যায়, যাঁর কাছে নতি স্বীকার করলে কারো স্বাধীনতার শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়না, যাঁর কাছে আত্মসমর্পন করলে আত্মশক্তির জাগরণ ঘটে তাঁকেই মানতে হবে—শিষ্যের প্রাণমন মথিত করে স্বাধীনতার বজ্রঝঙ্কার যিনি তুলতে পারবেন, যাঁর গভীর অভয় হুংকারে লক্ষযুগের লৌহশৃঙ্খল চূর্ণ হয়ে খসে পড়বে, সকল সংস্কার সকল মলিনতা ঘুচবে, যাঁকে মানলে চিত্ত আত্মনিষ্ঠ ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্যনিষ্ঠ হবে তিনিই গুরু !!!

…সকলের কল্যাণ কামনা করি।

ইতি—

আঃ ব্রহ্মচারী

(গলিগ্রামের জনৈকা শিষ্যাকে লিখিত)

……মায়ী,

একখানা চিঠি লিখতে যদি একমাস সময় দরকার হয় তবে এমন চিঠি নাই বা লিখলে, এমন লেখাপড়া নাই বা শিখলে।

সাধনের অবস্থায় ধৈর্য না থাকলে অনেক উৎপতে ঘটে—গুরুর আদেশ প্রাণপণ করে প্রতিপালনের নামই ধৈর্য। চিত্র দর্শন, বাণী শ্রবণ ইত্যাদি আমাদের সাধনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়। আদেশ প্রতিপালন ব্যতীত কর্তব্য বলিতে কিছুই নাই। প্রতি কার্যের লক্ষ্য যদি আদেশ প্রতিপালন হয়, তবে অহঙ্কার অভিমান নষ্ট হয়, আত্মবলী হয়—তা ছাড়া সমস্ত সৎ বা অসৎ কার্যই অভিমান বৃদ্ধির চেষ্টা মাত্র। অলৌকিক দর্শন বা অদ্ভূত শ্রবণ যদি ইষ্টবস্তু ভুলিয়ে দেয়, লক্ষ্যআদেশ পালনে নাম-গ্রহণে অমনোযোগী

করে ফেলে, তাহ'লে তাহা ধর্ম্মবিরোধী অনিষ্টকর প্রলোভন মাত্র। আসক্তি সাধনে হ'লেও তাও বদ্ধতা—সাবধান!

অন্যান্য বই পড়া বন্ধ ক'রে শুধু 'সদ্‌গুরু সঙ্গ' গ্রন্থ কয়েকমাস পড়—গিয়ে পরীক্ষা নেব। (অমুকের) ভার তুমি নিয়েছিলে এবং তুমিই জেদ করে তাকে সাধন নেওয়ায়েছিলে—এখন তার জন্য আমাকে মধ্যে মধ্যে ভীষণ উদ্বেগ ও জ্বালা ভোগ করতে হচ্ছে কেন? লেখাপড়া করছে কি? মাঝে মাঝে সৎ উপদেশ দিয়ে আত্মগ্লানি আনবার চেষ্টা করবে।

ভাল আছি। ভাল চাই।

—তোর ঠাকুর

৭।৫।৫০

(কলিকাতার জনৈকা নাম-সাধিকাকে লিখিত)

কলিকাতা

২১।৫।৫২

স্নেহের……মায়ী,

তোমার ওখানকার আত্মীয়স্বজনেরা তোমাকে ভুল বুঝছেন এবং মাঝে মাঝে বাক্যবাণে বিদ্ধ করছেন জেনে মর্ম্মাহত হলাম। সংসার ও সাংসারিকতাই যাদের কাছে মুখ্য, তাদের কাছ থেকে এর বেশী কিছু আশা করতে পার না। যারাই আদর্শ জীবনের পক্ষপাতী তাদের নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। ভগবানের পরম মঙ্গলময় নামকেই একমাত্র বন্ধু-জ্ঞানে তাঁর শরণাপন্ন হও। শরীর-স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না, শরীর সুস্থ ও সবল না থাকলে সাধন-ভজন সব বিড়ম্বনা।

মান-লজ্জা-ভয় ত্যাগ করে রীতিমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে—চোখ সম্বন্ধে আদৌ অবহেলা করা উচিত হবে না।

শিষ্যের যদি গুরুর উপর অসীম নির্ভর না থাকে, আর গুরুরও যদি শিষ্যের উপর অগাধ বিশ্বাস না থাকে, তাহলে উভয়ের মধ্যে প্রকৃত প্রেম জন্মাতে পারে না এবং শিষ্যকে দিয়ে একদিকে যেমন গুরু অসাধ্য সাধন করিয়ে নিতে পারেন না, জগৎকল্যাণ করিয়ে নিতে অসমর্থ হন—তেমনি শিষ্য অপরদিকে গুরুর জীবন, কর্ম্ম, চিন্তা ও বাক্য থেকে মনুষ্যত্ব গঠনের, জীবনোৎকর্ষ বিধানের ও লোককল্যাণ সাধনের উপাদান সংগ্রহে অসমর্থ হয়। যেখানে গুরু-শিষ্যের মধ্যে এই পারস্পরিক নির্ভর ও বিশ্বাস অখণ্ড সত্তায় বিদ্যমান, সেখানে গুরু নানকের এক একটা সংগুপ্ত ইচ্ছা ইতিহাসের বুকে স্মৃতিচিহ্ন অঙ্কন করবার সামর্থ্য লাভ করে, শিখ বীরেরাও গুরুজীর জয় গাইতে গাইতে অবহেলে অপমান লাঞ্ছনা নির্যাতন সহ্য করতে সমর্থ হয়—কারাবরণ, মৃত্যু বরণকে গ্রাহ্য করে না। তা' বলে মনে কর না এই বিশ্বাস ও নির্ভরতা সহজাত সংস্কারের মত সকলের জীবনে বিনা অধ্যবসায়ে আপনা আপনি প্রতিষ্ঠিত হবে। বার বার অবিশ্বাস করে অনেকের অন্তরে চিরস্থায়ী বিশ্বাস আসে—লক্ষবার নির্ভর হারিয়ে অনেকের জীবনে পূর্ণ নির্ভরের, পূর্ণ আত্মসমর্পণের অমোঘ শক্তি জাগ্রত হয়।

সৎ শিষ্যের লক্ষণ হ'চ্ছে গুরুর ভালবাসায় অকপট বিশ্বাস—সদ্‌গুরুর প্রধান লক্ষণ হ'চ্ছে তাঁর অফুরন্ত···প্রেম, পক্ষপাতহীন অনাবিল ভালবাসা।

···সকলে তোমার জন্য ব্যথিত ও সকলেই নিয়ত তোমার মঙ্গল কামনা করে।······

আশিস লও। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক তোমারই ঠাকুর।

———

ওঁ গুরু

৬০, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১২।৬।৫২

স্নেহের······মায়ী,

নানা ব্যাপারে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে ঝুড়ি ঝুড়ি চিঠির উত্তর এক রকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে—তোমার মাও একখানা চিঠি লিখেছেন।

তোমার শরীর যখন অসুস্থ তখন উপযুক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন আছে এবং উপযুক্ত চিকিৎসক যেমন বলবেন সেইমত আহারেরও পরিবর্ত্তন করা উচিত হবে। কোন বিষয়ে কোন সংস্কার না থাকাই ভাল—ধর্ম্ম অন্তরের জিনিস, অন্তরের অন্তরে রাখারই চেষ্টা চাই। সংসারে সকলকে সন্তুষ্ট করা এবং সকলের সাংসারিক সংস্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা সকল সময় সম্ভব হয় না; তবু সকল দিক বিচার করে যতটা সম্ভব খাপ খাইয়ে চলবার চেষ্টা করবে।

গুরুভক্তি জিনিসটা একটা সামান্য ব্যাপার মনে করোনা—জগতের সকল ভক্তির পাত্রের প্রতি ভাবের সামঞ্জস্য রেখে যে গুরুভক্তি, সেটাই খাঁটি। গুরুদেবকে ভক্তি করব বলে পিতা-মাতা স্বামীকে অভক্তি করতে হবে, বা আমাদের সাধন পন্থায় যাঁরা নাই এমন সব মহাত্মাদের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে, একে গুরুভক্তি বলে না। নিজের গুরুদেবকে অনেকে অবতার ব'লে মনে করে, চাই কি স্বয়ং পরমেশ্বর বলেও বিশ্বাস করে; কিন্তু তাই বলে যারা তোমার মত মনে করে না তাদের পাষণ্ডী নাস্তিক মনে করবার কোন কারণ নাই। গুরুভক্তির পেমাণ আত্মোৎসর্গে—জগতের কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার না করে গুরুবাক্য পালনের জন্য যে হাসিমুখে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে রক্তাঞ্জলী দিতে পারবে, সেই গুরুভক্ত! উচ্ছ্বাসের

অধীরতাকেই গুরুভক্তি বলে না, প্রকৃত গুরুভক্তি বহুকালব্যাপী সুধীর তপঃসাধনাতেই আসে।······(অমুক)'কে চিঠি লিখতে পার—তার মন খুব দুর্ব্বল, তাই নানা অত্যাচারে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা যাছে।··· তার দাদু এসে সব কথা বলেছিলেন, কিন্তু নিজেদের দোষ দেখবার করো অবসর নাই—নিজেরাই তার সর্ব্বনাশ করছেন, ভবিষ্যৎ জটিল করে তুলছেন।······

ভাল আছি—ভাল চাই। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদ তোমার ঠাকুর।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্।

কলিকাতা,

১৭।৬।৫২

নিত্যাশীর্ভাজিনীষু,

তোমার পত্র পড়ে মনে হ'ল নানা দিককার নানা কথায় তোমার মন দুর্বল হয়ে পড়েছে। সর্বশক্তিমান ভগবানের নাম যার প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে অবলম্বন থাকে, সর্বজয়ী নামে যার বিশ্বাস থাকে, সর্ব-বিপদ ভঞ্জন নামকে যে প্রধান আশ্রয় ব'লে জানে—তার কোন অবস্থাতেই ভয় পাবার কিছু নেই। প্রহ্লাদের জীবন দেখ! কোন পরীক্ষাতেই সে নামে বিশ্বাস হারায় নাই, ভগবান তাকে সকল বিপদে রক্ষা করলেন। নিজের কর্তব্যে ত্রুটি না থাকে সেই আত্মবিচার থাকা চাই, নিজের দোষ সংশোধনে সদা তৎপর থাকা উচিত; কিন্তু যেখানে নিজের বিবেক নির্মল থাকে সেখানে নিজের পথে লৌহের মত দৃঢ় থাকতে হবে। সহস্র ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করেও নিজের ব্রতে নিজের সংকল্পে দৃঢ় থাকা চাই। ক্লৈব্য সকলেরই আসে,

অর্জুনেরও এসেছিল; কিন্তু ভগবান সাধককে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্যে সকল চেষ্টা করেন। তোমরা ভগবানের আশ্রিত, তাঁকে লাভ করবার উদ্দেশ্যেই তোমাদের যতকিছু—সুতরাং সাংসারিকতার দিক তাকিয়ে নিজের সংকল্পচ্যুত হবে কেন? "যে করে আমার আশ, তার করি সর্বনাশ"—সর্বনাশ এখন কিছুই হয় নাই, পরীক্ষায় দৃঢ় থাকবে। "তাতেও যদি না ছাড়ে আশ, তারে করি দাসের দাস"—সংকল্পে দৃঢ় থাকলে, সকল পরীক্ষায় অবিচলিত থাকলে নিশ্চয় তিনি আশ্রয় দেন। তুমি নিজেকে এত সহায় শূন্য মনে করোনা, তিনি সর্বদা তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন।···

যার পক্ষে যা প্রয়োজন তা পরিষ্কার করে লিখে থাকি। শুভ অশৌচে মাত্র ফুল দিয়ে (তুলসী চন্দন নয়) পূজা করা বিধি,—মৃতাশৌচে পূজা করা নিষেধ, তবে নিত্য নাম প্রাণায়াম করা উচিত। বাতাসা জল দিয়ে ঘর বন্ধ করে অন্যত্র যাওয়া চলে, ফটো নিয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। তোমার পক্ষে সকল অশৌচ মধ্যে পূজা করা চলতে পারে (তোমার অবস্থা বুঝে), কিন্তু সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ নাই বা করলে?

সর্বদা তোমার জন্যে মনটা উদ্বেগ ভোগ করে। ধীর স্থির হও, সকল অশান্তি ভগবানের নামের চরণে উৎসর্গ করে নিজেকে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত মনে কর।

নিত্যাশীর্বাদক তোমারই ঠাকুর।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

ভুবনেশ্বর

২৫।৮।৫২

পরম কল্যাণভাজিনীষু,

তোমার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাল হচ্ছে জেনে সুখী হ'লাম। নিয়মমত চিকিৎসা করিয়ে যাবে, কোন প্রকারে চিকিৎসকের উপদেশ অবহেলা করবে না।

সাধন ভজন করলে যে সকলের সকল প্রকার উন্নতি হয়, এটা তোমার জীবনে প্রমাণিত দেখতে চাই।

সদ্‌গুরু-বাক্যে, তাঁর মুখনিঃসৃত মন্ত্রে এক অত্যাশ্চর্য শক্তি লুকিয়ে থাকে,—যার অংশমাত্রই দীক্ষাকালে কেউ কেউ টের পায়, কেউ কেউ বা দীক্ষাকালে আদৌ অনুভব করে না। কিন্তু এই প্রচ্ছন্ন শক্তির বিস্ময়কর প্রভাব অবিশ্বাসী শিষ্যকে তার ইচ্ছার অগোচরে ক্রমশঃ ঠেলে নিয়ে আসে সাধন নিষ্ঠার দিকে, গুরুদ্রোহী শিষ্যকেও তার অজ্ঞাতসারে গুরুপাদপদ্মে নির্ভরশীল করে তোলে। সদ্‌গুরুর দীক্ষা সুপাত্রে পড়ুক, অপাত্রে পড়ুক, পবিত্র বা অপবিত্র আধারে পড়ুক, শ্রদ্ধাবান বা হুজুগাকৃষ্ট শিষ্যে পড়ুক—এই অব্যর্থ শক্তি সর্বত্র তার নিজের কাজ করবেই করবে। সদ্‌গুরু ইট-কাঠ, গাছ-পাথর যে কোন বস্তুর কানে মহামন্ত্র ঢেলে দিন না কেন, একদিনে হোক দশদিনে হোক এই সমস্ত বস্তুকে প্রাণবন্ত হ'তেই হবে—গুরুবলে বলীয়ান হ'য়ে এরাও জগতে অসাধ্য সাধন করে যাবে। তোমার স্বামীর ভাগ্য নিতান্ত মন্দ, সুকৃতি-হীন—তাই তোমার সৎপ্রচেষ্টার প্রতি তিনি উপেক্ষা করেছেন, বিরোধিতা করেছেন ; নইলে তাঁর জীবনেও অপূর্ব পরিবর্তন সাধন সম্ভব হ'ত। জগতে সকলে আসে নিজের প্রয়োজনে, কাজ ফুরালেই চলে যেতে বাধ্য হয়—সুতরাং অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা কর। সংসার ও সাংসারিকতা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত করবার অবসর না পায়—ভগবান তোমার সহায়!

সন্ধ্যাকালে ঘরে ঘরেই প্রদীপ জ্বলে—এ দৃশ্য রোজ আমরা কে না দেখছি! কিন্তু অন্তরভরা অমাবস্যার জমাটবাঁধা অন্ধকার গভীর নিশীথের বিভীষিকারাশি সৃষ্টি কচ্ছে—তার দিকে লক্ষ্য করছি কৈ ? "জ্বাল দীপশিখা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে!" বাইরে প্রদীপ জ্বেলে কী হবে! সে প্রদীপ তো কিছুক্ষণ পরেই নিভে যাবে—ভিতরে প্রদীপ

জ্বালাই শ্রেয়। এমন প্রদীপ জ্বালো, যে প্রদীপ আর কখনও নিভবে না— মোহ-তমসার নিবিড় পরাক্রম ভগবানের নামের বাতি জেলে পরাহত কর। লক্ষ যুগের অন্ধকারও একটী মাত্র প্রদীপ শিখাতে দূর হয়—কিন্তু এমন শিখা জ্বালো যা আর নিভবে না, যা কিছুতেই নিষ্প্রভ হবে না। শিখা মাত্রই চঞ্চল, কিন্তু এখন শিখা জ্বালো যা অচঞ্চল, সুস্থির। নাম চালাও অবিরাম, অবিশ্রাম, নিরবধি—নাম চালাও অহর্নিশ, অনুক্ষণ, অফুরন্ত।

চারিদিকের আবর্জ্জনা এসে মলিন করে দিচ্ছে। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক।······আশীষ লও।

আঃ তোমার ঠাকুর।

জয়গুরু

কলিকাতা

১৯।১২।৫২

জয় মা আনন্দময়ী,

সংবাদ জ্ঞাত হলাম। পুত্রের কথা ব'লে নিশ্চয় কোন কটাক্ষ করিনি— ব্যথা পেলে কেন? সকল স্নেহ-ভালবাসা, সকল আদেশ-উপদেশ, সকল শাসন-নির্যাতন যে একমাত্র সেই মঙ্গলময়ের ইঙ্গিতেই আসছে—একথা যে উপলব্ধি কর না, আমি লিখেছি কি? জল্পনা-কল্পনা দ্বারা মানুষ নিজেই নিজের ক্ষতি করে—সাবধান হবে। মনই মানুষের সংসার—বাইরের সংসার ছাড়া খুব কঠিন নয়, কিন্তু ভিতরের সংসার ছাড়া বড় কঠিন। এই মনের লয় যত করতে পারা যায়, ততই সংসার বন্ধন শিথিল হ'তে থাকে। ভগবৎ চৈতন্যের সম্মুখে হৃদয়স্থ অন্তর-দেবতা গুরুর সন্নিকটে মনকে যত ধরে নিতে পারা যায়, তাঁর প্রকাশের সম্মুখে মনকে যত ছেড়ে

দেওয়া যায়, ততই মন ক্ষীণ হতে থাকে। ক্রমে মন যে বাস্তব বস্তু নয়, মন যে অসৎ—এই রকম মনের অসত্তা জ্ঞান ফুটে ওঠে; মনের অসত্তা জ্ঞান পুনঃ পুনঃ অনুভব করতে পারলে সমস্ত সংসার বন্ধনই ছিন্ন হয়, ব্রহ্মসত্তা সমুদ্ভাসিত হয়ে পড়ে। যতদিন দেখবে মন বিষয়ে আসক্ত থাকতে ভালবাসে, স্বস্তি বোধ করে—ততদিন বুঝবে তোমার বন্ধন বেশ দৃঢ়ভাবেই আছে। যখন দেখবে তুমি নির্বিষয় হ'তে পাচ্ছ, তখনই বুঝবে তোমার বন্ধনপাশ ছিন্ন হ'চ্ছে এবং তখনই জেনো মধুময় অন্তর্দেবতার, শ্রীভগবানের, সঙ্গে তোমার মাঝে মাঝে মধুমিলন হ'চ্ছে, মিলনের অমিয় রসধারা মাঝে মাঝে তোমার অন্তরে বর্ষিত হ'চ্ছে। জীবন্মুক্তির দুয়ারও তোমার জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে।

জীব-হৃদয়ের গভীর তলদেশে যে শুদ্ধ চৈতন্য রয়েছে, সেই চৈতন্যই সমস্ত আনন্দের সমস্ত সৌন্দর্য্যের মূল, সমস্ত সৌন্দর্যের উপাদান। সেই সৌন্দর্য্যের সাগরে ডুব দিলে যে কী মাধুর্য পাওয়া যায়, তা প্রকাশ করবার মত ভাষা কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি। জীব জানে না যে, এই যাবতীয় সৌন্দর্যের একটি বিন্দুও বাহিরে নাই—সমস্ত আনন্দের, সমস্ত সৌন্দর্যের প্রেরণা আসছে হৃদয়স্থ সুন্দরতম আনন্দময় পুরুষ শ্রীভগবান বাসুদেবের কাছ থেকে। যদি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরতম বস্তুকে দেখতে চাও—যাঁর সৌন্দর্যের হ্রাস নাই বৃদ্ধি নাই, সে সৌন্দর্য অনন্তকাল ধরে নিয়ত মুগ্ধ নেত্রে দেখলেও প্রতিক্ষণেই নতুন বলে বোধ হবে, সে সৌন্দর্যের একটিবার দর্শনে, সেই সুন্দরতম পুরুষের একটিবার অঙ্গস্পর্শে হৃদয়স্থ ভাবচিত্রগুলি ধীরে ধীরে শ্রীমণ্ডিত হয়, সুন্দর হয়, প্রাকৃতিক কোন সুন্দর দৃশ্য আর প্রাণকে মুগ্ধ করতে পারে না—সেই অন্তর্দেবতাকে, সেই সমগ্র সৌন্দর্যমণ্ডিত সনাতন পুরুষকে যদি একটিবার প্রাণভরে হৃদয়ভরে দেখে নিতে চাও, সেই সৌন্দর্যের আকর্ষণীশক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে যদি নিজেও সুন্দরতম হতে চাও, সুন্দর হয়ে

সেই সুন্দরতম পুরুষের সেই অন্তর্দেবতার বুকে তোমার বুকখানাকে মিলিয়ে নীরবে সেই সৌন্দর্যের মধুরসকে সম্ভোগ করতে চাও—তা'হলে ফিরিয়ে দাও তোমার চোখের দৃষ্টিকে, মনের চিন্তাকে, প্রাণের আকর্ষণকে, জীবনের গতিকে, ঐখানে ঐ দহর পুরে, ঐ অন্তস্থলের গভীর তলদেশে। পাবে দেখতে, পারবে ভোগ করতে, সমর্থ হবে জীবনকে ধন্য করতে—গাও প্রাণ খুলে "সত্যং শিবং সুন্দরম্", গাও উচ্চকণ্ঠে "সুন্দরম্—সুন্দরম্—অতি সুন্দরম্।"

চেষ্টা থাকলে ভগবান সহায় হবেন এবং তোমার আকাঙ্ক্ষা অবশ্য পূর্ণ হবে।

এখানকার সব কুশল।

৬০, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৪।১২।৫২

পরম কল্যাণভাজিনীষু,

তোমার পত্রে তোমার মনের দৃঢ়তা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হচ্ছে বুঝে খুব সুখী হয়েছি। তোমার পুত্র ধ্যানানন্দজী তোমার সন্তপ্ত প্রাণে শান্তির খোরাক জোগাচ্ছেন দেখে আনন্দ হয়। ভগবানের পথে যে আন্তরিকভাবে চলতে চায়, তাকে প্রয়োজন মত ও সুযোগমত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সাহায্য করে।

ভগবানকে লাভের বহু পথ—যে যে পথে সুবিধা বুঝবে চলবে। ভগবান সর্ব্বময়, তাই সব কিছুতেই তাঁর পূজা চলে—তিনি ভাবময়, তাই ভাবুক জন শুধু ভাবের ভিতরেই তাঁর অর্চ্চনা করেন—তিনি অভাবময়, তাই শূন্যবাদী শূন্যের ভিতরেই তাঁর অর্চ্চনা করেন—তিনি বস্তুময়, তাই বস্তুবাদী

বস্তুর ভিতরেই তাঁর অর্চ্চনা করেন—তিনি প্রাণময়, তাই প্রাণবাদী প্রাণের ভিতরেই তাঁর অর্চ্চনা করেন—তিনি রূপময়, তাই সাকারবাদী পরিমিত বিগ্রহের ভিতরে তাঁর অর্চ্চনা করেন—তিনি অরূপ, তাই নিরাকারবাদী বিগ্রহ ব্যতীতই তাঁর অর্চ্চনা করেন—তিনি রসময়, তাই রসিক জন শান্ত, দাস্য, মধুর, বাৎসল্যাদি রসের ভিতরে তাঁর অর্চ্চনা করেন। সর্ব্বময়ের পূজা সর্ব্বভাবেই হয়; সুতরাং যে অবস্থাতেই পড় না কেন, তোমার প্রাণের ঠাকুরকে তোমার প্রাণপুরে অর্চ্চনা করবার পথে কোন বাধাই থাকতে পারে না।

গুরুতত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞান সুদৃঢ় রাখবে। গুরুর দেহ, নাক-কান, চোখ-মুখ—এসব কি গুরু? যিনি নিত্য চৈতন্যস্বরূপ তিনিই গুরু—যিনি অন্ধকার দূর করেন তিনিই গুরু। কে অন্ধকার দূর করে—আলো, না, আলোর বাহক? আলোই গুরু, লণ্ঠনটা গুরু নয়—লণ্ঠনটার ভিতর দিয়ে তুমি আলোর প্রকাশ দেখতে পাও, তাই লণ্ঠনটার এত আদর এত যত্ন—আলোহীন লণ্ঠনকে কে যত্ন করে? নিত্যানন্দময় পরব্রহ্মই শ্রীগুরু—তিনিই ইষ্ট, তিনিই নাম, তিনিই বিশ্বরূপে প্রকাশিত, তিনিই জ্ঞেয় রূপে অপ্রকাশিত। তিনিই মনুষ্যদেহ হয়েছেন, কিন্তু মনুষ্য দেহটাই তাঁর সবটুকু নয়, মনুষ্যদেহ সসীম, তিনি অসীম—দেহ ক্ষুদ্র, তিনি ভূমা। এই সসীম দেহে অসীমের স্পর্শ আছে, এই ক্ষুদ্র দেহে ভূমার লীলা হচ্ছে—তাই এ দেহের মান, দেহের গৌরব। মানবগুরু উপলক্ষ্য, পরম-গুরু লক্ষ্য, মানব-গুরু পন্থা-প্রদর্শক, পরম-গুরু পথ, লক্ষ্য ও প্রদর্শক সবই একাধারে—সেই নামকেই আশ্রয় কর!

...গুরুর আদর, ভালবাসা ও তাঁর তিরস্কারকে সমভাবে গ্রহণ করার যোগ্যতা শিষ্যের থাকা উচিত, কাজেই...ওদের প্রতি শাসন চালানো প্রয়োজন হয়েছে।...শরীরটা তেমন ভাল থাকছে না, নানা উপসর্গ—

তোমার চোখ, মাথা ইত্যাদি উপেক্ষার বস্তু নয়, চিকিৎসায় অবহেলা করবে না।

মঙ্গলময় পরিণতিতে তোমার কল্যাণ করবেন, বেশী চিন্তা করো না— শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার সহায় থাকুন।

———

(ইংলণ্ডে বেদান্ত-প্রচার কার্য্যালয়ে স্বামী অব্যক্তানন্দজীকে লিখিত)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণম্

কলিকাতা।

১।৪।৫৬

বাসুদেবেষু,

মহারাজ, আপনার পত্র পেয়ে খুব সুখী হ'লাম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি যে বিশ্বকল্যাণ ব্রত গ্রহণ করেছেন তা তাঁরই কৃপায় সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠুক।

আপনি লিখেছেন যে অদূর-ভবিষ্যতে ভারতে সমাজ-বিপ্লব আসবে। আমি তো এখন থেকেই তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। শুধু তাই নয়, এরই মধ্যে চারিদিকে পাগলা ভোলার প্রলয়-নাচন শুরু হয়ে গেছে। অবশ্য আপনি ঠিকই বলেছেন এতে ভয় পাবার কিছু নেই। শিবহীন দক্ষ যজ্ঞের ফলস্বরূপ যেমন সতীর দেহত্যাগ হয়েছিল, ধর্ম্মহীনতার ফলে যদিও তেমনিভাবেই আমাদের সমাজ প্রাণহীন হয়ে পড়েছে, তবুও একথা ভুললে চলবে না যে, যে সমাজ-রূপ সতীদেহকে স্কন্ধে ধারণ ক'রে শিবরূপী মঙ্গলময় ভগবান তাণ্ডব-নৃত্য শুরু করেছেন—ভুললে চলবে না যে তিনিই আবার সুদর্শনধারী বিষ্ণুরূপ ধারণ করে সমাজ-রূপ সতীদেহকে ছিন্নভিন্ন বা বিনষ্ট করছেন—আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি সেই প্রাণহীন সমাজ-

দেহের উপরই প্রতিষ্ঠিত হবে আধ্যাত্মিকতার সুউচ্চ হর্ম্ম্য—ঠিক যেমন ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ভূ-লুণ্ঠিত ছিন্ন-ভিন্ন সতী দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একান্ন পীঠস্থান। ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ণকারী-শঙ্খধ্বনির ন্যায় সমাজ-বিপ্লব আধ্যাত্মিকতার অমৃতধারাকে স্বীয় পশ্চাতে আহ্বান করে আনছে—দিবালোকের মতই এ তথ্য আমার কাছে সুস্পষ্ট।

সাম্যবাদ নব-কলেবরে বিদেশে আত্মপ্রকাশ করলেও এ বস্তু আমাদের ভারতমাতার নিজস্ব ভাণ্ডারের জিনিষ,—বেদান্ত ধর্ম্মের এক প্রাণহীন সংস্করণ। বাহিরের আকার ও আকৃতিতে সাম্যবাদের সামান্য কাঠামো-মাত্র থাকলেও তাকেই অবলম্বন ক'রে এ বস্তু এখানে খাড়া থাকবে; কিন্তু বর্ত্তমানে প্রচলিত সাম্যবাদে এই আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম্মের একান্ত অভাব: বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী ও প্রেম—বাহিরের বস্তু নয়, অন্তরের ধন। আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পরস্পরের মধ্যে যদি একটা আন্তর যোগসূত্র স্থাপন করা না যায়, তাহলে বাহিরের কোনও বস্তুর দ্বারাই তা' সম্ভব হবে না। বেদান্ত ধর্ম্মের যা প্রধান উপজীব্য এবং আধুনিক সাম্যবাদে যা'র একান্ত অভাব—সেই আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে এতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হ'বে; তবেই পৃথিবী স্বর্গতুল্য হবে। নচেৎ বর্ত্তমান প্রচলিত সাম্যবাদের দ্বারা জগতের কোনও কল্যাণ সাধিত হ'বে ব'লে আমি মনে করি না।

আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক সাম্যবাদ—যা আপনারা আজকাল প্রচারের চেষ্টা করছেন—বেদান্ত ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। বস্তুতঃ এই আধ্যাত্মিক সাম্যবাদকে বেদান্ত ধর্ম্মেরই এক নবীন সংস্করণ বলা যেতে পারে। সাম্যবাদের প্রতি যাঁদের ঝোঁক, অথচ ধর্ম্মহীনতার জন্য যাঁরা একে গ্রহণ করতে পারছেন না, তাঁরা আপনাদের প্রচারিত এই আধ্যাত্মিক সাম্যবাদের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হবেন। কিন্তু এমন লোকও অনেক আছেন যাঁরা ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতাকে সাম্যবাদের মূল আত্মা বা প্রাণবস্তু রূপে না ভেবে,

তার অন্তরায় বলে মনে করবেন এবং গলায় ফাঁস লাগার ভয়ে এর মধ্যে মাথা গলাতে চাইবেন না। এই প্রকার লোকদের দলে টানা অত্যন্ত দুরূহ কাজ হ'লেও নিরাশ হওয়া চলবেনা। ভগবানের কাজ, তিনি নিজেই করাবেন; আমি আপনি তো নিমিত্তমাত্র। তাঁরই কাজ মনে করে কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও অদম্য উৎসাহে এই কাজে অগ্রসর হ'তে হবে। তাহ'লেই তাঁর সহায়তা পাওয়া যাবে এবং কাজও বহুল পরিমাণে সহজ হয়ে আসবে।

আমাদের প্রচারকার্য্য আমাদের শ্রীগুরু ও পরম-গুরু নির্দ্দেশিত পথেই চলে আসছে; তবে শারীরিক কারণে কাজ ঠিকমত এগোতে পারছে না। আশা করি আপনি কুশলে আছেন।

(লণ্ডনে আইন-শিক্ষারত জনৈক ছাত্রকে লিখিত)

কলিকাতা
ইং ৩।১০।৪৯

প্রিয়বরেষু,

কয়েকদিন হ'ল তোমার মা তোমার সম্বন্ধে সবকিছু আমায় বলেছেন। মায়ের কোমল প্রাণের ক্ষীণ আশা, আমার কথায় তুমি তোমার নিজস্ব মহত্তম দিক্‌গুলোর পরিচয় পাবে এবং তদনুসারে কাজ করতে সচেষ্ট হ'বে। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে তোমার মা তোমার জন্যে কত গর্ব্বিতা; তাঁর স্থির বিশ্বাস তাঁর সন্তান কোনও রকম অন্যায় কিছু করতে পারে না। শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও এই বিশ্বাস আজও তাঁকে খাড়া করে রেখেছে। তাঁর সকল শক্তির মূল উৎসই এই। তাই আর কিছুর জন্যে না হলেও শুধু

তোমার মায়ের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে আজ আমাকে এই কলম ধরতে হয়েছে।

এ কথা অবশ্য বিশ্বাস করা শক্ত যে তুমি আমার কথাকে ধ্রুবসত্য বা অকাট্য যুক্তি বলে গ্রহণ করবে। তোমার বিদ্যাবত্তা বাগ্মিতা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিচ্ছটামণ্ডিত। সুতরাং তোমার জীবনের মূল লক্ষ্য বা বর্ত্তমান যৌবনের সন্ধিক্ষণে তোমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার আর কি বলার থাকতে পারে? তোমার নিজের জীবনের এবং যাঁদের কাছে তোমার এই জীবনের জন্য ঋণী তাঁদের অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু নিচয় সম্বন্ধে অবশ্যই তুমি সচেতন। প্রকৃতির বিধানে তোমার হৃদয়, তার আশাআকাঙ্ক্ষা এবং তা চরিতার্থ করা সম্পর্কেও তোমার জ্ঞান অনেকের চেয়ে বেশী। অতএব কখন, কেমন করে, ও কেন তোমার হৃদয়াবেগকে যুক্তিগ্রাহ্য করতে হ'বে বা কূটযুক্তিজালকে হৃদয়-সুষমায় আপ্লুত করতে হবে, তার নির্দ্দেশনা দেওয়া বা সে সম্বন্ধে কোনও অভিমত প্রকাশ করা সমীচীন ব'লে আমি মনে করি না। এক কথায়, তুমি যখন তোমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে মায়ের মতামত চেয়ে উদার হৃদয়বৃত্তির পরিচয় দিয়েছো তখন আমার দিক থেকে তোমাকে বলার আর কিছুই নেই; বরং তোমার প্রশংসনীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও বেচারা মায়ের জন্য তোমার কোমল হৃদয়াবেগ আমার প্রশংসার্হ। তুমি যদি এমন কাউকে পেয়ে থাকো যে তোমার সুখে-দুঃখে সকল সময় তোমার পাশে থাকবে এবং তোমার সুখ-দুঃখের সমান অধিকারিণী হ'বে,—তা'তে তোমার দিক থেকে আমি দোষণীয় কিছুই দেখতে পাই না। বরং সত্যই যদি কেউ তোমার প্রতি এমনভাবে অনুরক্ত হয় এবং তুমিও তার প্রতি অনুরূপ-ভাব পোষণ কর, তাতে আমি সোৎফুল্ল কণ্ঠে ব'লবো—দেখ, এই একজোড়া সুন্দর জীবন যারা মানব সমাজের মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করেছে। কিন্তু বৎস, এর মধ্যে একটা গুরুতর প্রশ্ন

রয়ে গেছে। প্রাচ্য প্রতীচ্যের বিরাট বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী এই মহাসমুদ্রের অপরপারে কি এতটা সত্যই সম্ভব? সত্যই কি তোমরা দু'টিতে একাত্মভাবে উদ্বুদ্ধ? যাই হোক, বাহ্য বিষয় ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুটি বস্তুর একাত্মিক মিলন আদৌ সম্ভব কি না সে প্রশ্নের জবাব সৃষ্টির বিবর্ত্তনবাদের (theory of evolution) পটভূমিকায় তোমাকেই দিতে হবে। বাহ্য কোনও বস্তুই যে জীবনের তথা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয় তা তো তোমার মত জ্ঞানবান ও কৃষ্টিসম্পন্ন সন্তানের নিশ্চয়ই অজানা নয়। বাহ্য সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণ, তা সে যতই বলবান হউক না কেন, ক্ষণস্থায়ী বিভ্রান্তকারী মোহ ব্যতীত কিছুই নয়। তাদের অবদমিত ক'রে জীবন যুদ্ধে প্রকৃত জয়লাভ করতে হলে ইস্পাতের মত দৃঢ়চেতা হ'তে হবে। তোমার মধ্যে সে শক্তি ও সাহস আছে বলেই আমার বিশ্বাস। আমি বিশ্বাস করি বাহ্য জগতের সতত পরিবর্ত্তনশীল ও স্বল্পস্থায়ী সকল আকর্ষণকে উপেক্ষা করে জীবনের মূল সত্যকে,—তা সে যতই কঠোর, যতই নির্ম্মম হোক না কেন—উপলব্ধি করার মত সৎসাহস তোমাতে বিদ্যমান।

পার্থিব সমৃদ্ধির সহজ তুচ্ছ আনন্দভোগের জন্যে তোমরা তৈরী হওনি বলেই আমার মনে হয়। যোগ্যা জননী ও মহীয়সী দেশমাতৃকার আশীর্ব্বাদধন্য সন্তান তোমরা। তোমরাই তো তোমাদের উচ্চ বংশ মর্য্যাদা ও দেশের সুমহান আদর্শের সমুজ্জ্বল আলোকবর্ত্তিকা জগতের সামনে তু'লে ধরবে। এই পবিত্র কর্ত্তব্যের পথিকৃৎ হয়ে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করলে তো চলবে না। মহান আদর্শ পালনে নিজেকে মহৎ হ'তে হয় এবং তার জন্যে চাই পরার্থে নিঃসঙ্কোচ ত্যাগস্বীকার। ত্যাগ ছাড়া জগতে কোনও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় নি, হতে পারে না; তোমারই দেশের সুসন্তান স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শও লক্ষ্যের কথা নিশ্চয়ই তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। আমি তোমাকে সেই পথের

পথিকরূপেই দেখতে চাই। শ্রীগুরুর শ্রীচরণে তাঁর জীবন ছিল সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত। নিজের জন্যে বা অন্য কিছুরই জন্যে তার সামান্যতম অংশও অবশিষ্ট ছিল না। তাই তাঁর সকল কাজই শ্রীগুরুর সন্তুষ্টবিধানে সম্পাদিত হ'ত। আর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ সৃষ্টি ও সৃষ্টবস্তুর কল্যাণ ছাড়া আর কিছু যে চিন্তা পর্য্যন্ত করতে পারতেন না সে কথা বলাই বাহুল্য। তোমার মা তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু। তাঁর মুখে এক টুকরো হাসি ফোটাতে তোমার কোনও ত্যাগই ত্যাগপদবাচ্য হওয়া উচিত নয়।

এখন তোমার সামনে দু'টি পথ। তোমাকেই স্থির সিদ্ধান্ত করতে হ'বে কোন্ আহ্বানে তুমি সাড়া দেবে। রক্ত মাংসের রূপজ মোহের পঙ্কিল আকর্ষণে না তোমার ইহজীবনের ও পরজীবনের, ক্ষুদ্র তুমি ও বৃহৎ তুমি'র চিরন্তন মঙ্গলকর তথা জগতের তাবৎ বিষয়বস্তুর অবিনশ্বর কল্যাণকর সেই পরম শাশ্বতের আহ্বানে। তোমার সিদ্ধান্তের এই পরম মুহূর্তটিই তোমার সমস্ত জীবনের অনন্ত-মুহূর্ত্ত,—মাহেন্দ্রক্ষণ। তবে তোমার ভবিষ্যৎ জীবন গঠনাগঠনের এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণার্থে কোনও রকম অভিমত ব্যক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার প্রকাশ তোমাদের সকল অবস্থায়ই তোমাদের আশীর্ব্বাদকরূপে এবং তোমার সর্ব্ববিধ সুখ-সমৃদ্ধি ও পরমোন্নতির জন্যে আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা সতত বিরাজমান :

জীবনের এই পরমলগ্নে প্রকৃত ও সঠিক পথ বেছে নেওয়ার মত সুবুদ্ধি শ্রীভগবান তোমায় দিন এই কামনা করি।

———

৬০, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৬।১২।৪৯

কল্যাণবরেষু,

তোমার কার্ডখানিতে তোমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পরিচয় পেয়ে অতিমাত্র দুঃখিত হলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি—তুমি সুস্থ হও এবং উৎসাহ সহকারে বিদ্যার্জ্জনে মনোযোগী হও। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আমরা সদাই অপরাধী—তিনি যদি অপরাধ নিতেন তবে আমরা ধোঁয়া হয়ে উড়ে যেতাম। মনে কোনপ্রকার দুর্ব্বলতা আসতে দেবে না, তুমি যা করেছ তার জন্য তোমার কোন অপরাধ হয় নি। গুরুগীতার যে অংশটুকু বলে দিয়েছি তা মুখস্থ করে নেবে ও সকলকে লিখে দিয়ে মুখস্থ করবার কথা বলবে। কষ্ট হলে প্রাণায়াম খুব অল্প সময় করবে, সর্ব্বদা নাম করবার চেষ্টা করবে। তোমরা স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান হয়ে বিদ্যায় উন্নতি লাভ করলে আমার মুখোজ্জ্বল হবে।

সকলকে আমার স্নেহ-ভালবাসা ও আশীষ জানাবে—মাভৈঃ!

ভুবনেশ্বর
৩০।৩।৫০

স্নেহের……

তোমার প্রাণের কথা জেনে সুখী হলাম। জল্পনা ও কল্পনা ত্যাগ করা চাই—আমাদের প্রতি শুধু আদেশ শ্বাসে শ্বাসে নাম করা, তারপর যা কিছু প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধ সত্য হবে তাই ধরে চলা। সংসার-দুর্গের মধ্যে থেকে সাধন করাই নিরাপদ। আমাদের সাধন ঋষিদের সাধন—ঋষিরা সব গৃহীই ছিলেন। জনক রাজার মত হতে হবে, নিরাসক্ত হয়ে চলাই প্রকৃষ্ট

সাধন। স্বামী-স্ত্রীতে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে—সংসারের খুঁটিনাটি ব্যয় সম্পর্কে স্ত্রীর উপর নির্ভর করতে হবে; তাতে ব্যয়বাহুল্য মনে হ'লেও ধীরভাবে সহ্য করতে হবে, অথবা সম্পূর্ণ ক্রোধশূন্য হ'য়ে বন্ধুভাবে বুঝিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে। নাম করে যাও, নামের সময় বাড়াবার চেষ্টা কর। জীবনে অনেক কিছু বুঝবার আছে, নামানন্দ সম্ভোগ করে ধন্য হতে পারবে।

গীতা মাত্র মূল পাঠ করবে—সাধন করতে করতে প্রকৃত অবস্থা লাভ হ'লে প্রত্যেকটি অক্ষরের অর্থ আপনিই হৃদয়ে স্ফুরিত ও প্রকাশিত হবে; তখনই প্রকৃত অর্থ হৃদয়াঙ্গম হবে। অধিক পাঠেও শুষ্কতা আনে—নামের দিকেই জোর দেবে।

...মঙ্গল হোক।

ভুবনেশ্বর
৩০।৩।৫০

...মায়ী,

...রাম যখন খামে চিঠি দেয় তখন তুই এক কলম লিখতে পারিস নে? শরীরটা ভাল না থাকলে সাধন ভজনই বা করবি কী করে—সংসারের গুরুভারই বা বহন করবি কেমনে? —আমি তো পথের ভিখারী—এই দুর্দ্দিনে সকলকে বারবার চিঠি লিখি কেমন করে বলতে পারিস? তোরা ঠাকুরের আদরের নাতনী, তোরা যদি ঠাকুরকে বলে আমার জন্য কিছু অর্থ চেয়ে নিতে পারিস তবে একটী আশ্রয় ক'রে ১০।১২টী ব্রহ্মচারী তৈরী করে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। আমার যে আকাশবৃত্তি, আমার যে কিছু প্রার্থনা করবার উপায় নেই। তাছাড়া আমার বাবা আমার প্রতি বড় নির্ম্মম, বড় কঠোর—একটু এদিক ওদিক করলেই চাবুক! তাই আবার পড়ে পড়ে

মার খাচ্ছি—খুব কলিকে ভুগছি। তোরা কেমন আছিস মধ্যে মধ্যে জানাবি।

ঠাকুর মনের সুখে রাখুন।

ভুবনেশ্বর

৮।৫।৫০

স্নেহের······

তোমার শরীর ও মন ভাল নেই লিখেছো। কিন্তু শুষ্কতা আসা যে জীবন গঠনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তা সদ্‌গুরু সঙ্গ গ্রন্থগুলি বারবার ক'রে পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। সাধনভজন করলেই যে সঙ্গে সঙ্গে একেবারে স্বর্গ হাতে এসে পড়বে এমন কোন মানে নেই। সমস্ত প্রতিকুল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করেও ঠিক সময়মত নিয়মমত নাম ও প্রাণায়াম করতে হবে। ভাল লাগলে করব, নইলে করব না—এমন উপদেশ দেওয়া হয়নি। পুরুষকার যদি কার্য না করে তবে প্রকৃত আত্মপরিচয় হয় না। পুরুষকার কৃষকের কার্যের ন্যায়—কৃষক ভূমি প্রস্তুত করে, শস্য রোপণ করে, এই পর্য্যন্ত তার কাজ; তারপর আর তার ক্ষমতা নেই। আকাশ থেকে বৃষ্টি না হলে সে জলসেচন করেও কিছু করতে পারে না। আন্তরিক উদ্যমই তপস্যা—ইহা প্রযুক্ত হলেই মেঘ থেকে জল বর্ষণের ন্যায় কৃপাবর্ষণ হয়। কাজেই জমি প্রস্তুত করবার জন্য উঠে পড়ে লাগ—অন্তরের কু-অভ্যাস সব দূর না হলে ধর্ম্ম কিছুতেই লাভ হয় না। বহুদিনের কু-অভ্যাস মানুষ ইচ্ছা করলেই দূর করতে পারে না, তা দু-একদিনের কর্ম্মও নয়—এ সব দূর করতে যে সময়টুকু লাগে ততটুকু সময় কেউ ধৈর্য্য ধরে থাকতে চায় না, খুব শীঘ্রই একটা কিছু পেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া, সকলে আবার নিজের নিজের রুচি মত ধর্ম্ম চায়—কাজেই

ধর্মলাভ আজকাল বড় কঠিন হয়ে পড়েছে। ধৈর্য্য ধরে নাম করে যাও, সময়ে শান্তি পাবে, সরসতা অব্যাহত থাকবে।

এ মাসের শেষে কলকাতা যাব মনে করছি।······তোমার শাশুড়ী লিখেছেন যে আমার সঙ্গে চন্দননগরে দেখা করতে আসবেন, কিন্তু আমি চাই না যে আমাদের গুরু ভ্রাতাদের সম্মেলনে আমার শিষ্যরা উপস্থিত কেউ আসে। কারণ আমাদের আশ্রমের উন্নতিকল্পে আমরা (সাধুরা) গৃহস্থদের সঙ্গে সংগ্রাম করছি এবং তাঁরাও বিদ্বেষবশে বিরুদ্ধ প্রচার করছেন। কাজেই সেখানে এসে কেউ শান্তি পাবে না, আমারও সংকোচ বোধ হবে। তুমি শাশুড়ীকে লিখে দিও আমাকেই বরং সেখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন—তাহ'লে সেখান থেকে কাটোয়া হ'য়ে তোমাদের ওখানেও ঘুরে আসতে পারব।

চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন—সকলে অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। নামই একমাত্র অবলম্বন, সান্ত্বনা ও সহায়।

···সকলের কল্যাণ কামনা করি।

কলিকাতা
২৮।৩।৫৪

বাসুদেবেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে সমস্ত জ্ঞাত আছি। জিতেনের বোনের বিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছে আশা করি। মা বিবাহটা দেখতে পেলেন না এই যা দুঃখ। মৃত্যুর সময় ভগবান গুরুদেব অবশ্য আশ্রিতজনকে দেখা দেন, কর ধ'রে থাকে এ আর বিচিত্র কী? বোবাকে যে বিবাহ করবে সে কি সকল দিক দিয়ে উপযুক্ত হতে পারে? লীলার ভাগ্যগুণে দাম্পত্য জীবন সুখের হ'লেই হল।

আমাকে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রশ্ন করবার মতলব করেছেন তা বুঝে পূর্ব্বেই নিজের মূর্খতার কথা জানিয়ে আপনাকে বিরত করবার চেষ্টায়

ছিলাম—কিন্তু বুজরুকি ক'রে আর কয়দিন গুরুগিরি করব, তাই ধরা পড়তেই হবে দেখছি! গুরুনিষ্ঠা প্রবন্ধটী আমার খুব মনের মত না হ'লেও (আরো সুন্দরভাবে সংক্ষেপে আরো অনেক কথা সদ্‌গুরু সঙ্গ থেকে দিতে পারতাম) ঐ ভাবেই পাঠিয়ে দেব। দাঁতের যন্ত্রণা, দাঁত তোলা, আবার ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি নিয়ে বিব্রত থাকতে হয়েছে।

আমি নিজে মূর্খ, শাস্ত্রজ্ঞানহীন—হঠাৎ অশোক শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল এবং আপনার প্রশ্ন সম্বন্ধে আলাপ করলাম। কিন্তু তিনি সময় চাইলেন ভাল করে দেখবেন বলে। যাক—

৺গুরুপূর্ণিমা সম্বন্ধে আমি ঠাকুর থাকতেই একবার আলোচনা করেছিলাম, কিন্তু কোন মীমাংসায় আসিনি। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের কাছে কথাটা তুলে দেখব মনে করছি।

প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্যগণ নির্গুণ সাকার বলতে বুঝেছেন হেয় গুণ রহিত সাকার। নির্গুণ হেয়গুণ রহিত, কিন্তু কল্যাণগুণ রহিত নয়। কল্যাণ-গুণকে তাঁরা ব্রহ্মের গুণরূপে ব্যাখ্যা করেন না, কল্যাণগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ। এ কারণে বৈষ্ণব বা শৈব, বিশিষ্টাদ্বৈত—দ্বৈতাদ্বৈত, ভেদাভেদ বা দ্বৈত মতে নির্গুণ সাকার স্বরূপ ব্রহ্ম স্বীকার্য। অদ্বৈত বেদান্তের পরব্রহ্ম নির্গুণ ও নিরাকার—ঈশ্বর সগুণ, কখনও মূর্ত কখনও অমূর্ত, কাজেই বৈষ্ণবমতে বা শৈবমতে পরমাত্মা ও অদ্বৈত মতে পরমাত্মা (এমন কি ঈশ্বরও) সমস্তরের নন—কল্পনাভেদ স্বীকার্য্য। তবে আপনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন—জড়ের মধ্যে চৈতন্যের সুষুপ্তি—উহাতে আপাত-ব্যাখ্যা সম্ভব; কিন্তু সে দৃষ্টিতে দেখলেও নির্গুণ ও সাকার দুইটী বস্তুর পরিচয় একত্র ব্যামিশ্রভাবে বলা যেতে পারে—জড় সাকার, আর চৈতন্য নির্গুণ। কেবল সৌষুপ্ত অবস্থা কেন, যে কোন পরিচ্ছন্ন জীবকেই নির্গুণ-সাকার বলা চলে। তবে দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক—পরিচ্ছেদকে দেহাদির দৃষ্টিতে সাকার, আর অপরিচ্ছিন্ন

চৈতন্যের স্বরূপে নির্গুণ—এই রকমে ব্যাখ্যা কথঞ্চিৎ চলে। তবে যাহাই সাকার তাহাই নির্গুণ—এরূপ ধারণা অদ্বৈত মতে হয় না।

একটী অপ্রাসঙ্গিক কথা, ন্যায়-বৈশেষিক মতে উৎপত্তিশীল দ্রব্যমাত্রেই উৎপত্তিক্ষণে সাকার, কিন্তু নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়—দ্বিতীয় ক্ষণ হ'তে সগুণ ও সক্রিয়।

এইসব শাস্ত্রের কচকচির সময় ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন: "ও সব ভুলে নাম করে যাও—'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' অন্তরে উপলব্ধি করলেই হল, সুন্দরভাবে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করবার পথ ত্যাগ কর···।" আমিও আমার আশ্রিতগণকে এই অনুরোধ করি যে, নাম করাকেই সকলের উপর ধরে থাক—সব জানা, সব বোঝা, সব পাওয়া সার্থক হবে।

সকলের কল্যাণ কামনা করি।

(হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্কলার ডেভিড মিলারকে লিখিত)

৬০ সিমলা ষ্ট্রীট, কলি-৬
১৫।১১।৬৫

প্রিয় মিলার,

তোমার গত ১৩ই তারিখের চিঠি পেয়ে অত্যন্ত প্রীত হ'লাম এবং আরও বেশী সুখী হ'লাম তোমার বাবার অস্ত্রোপচার নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়েছে জেনে। ঠাকুর তাঁকে সুখী ও দীর্ঘজীবি করুন।

দৈনন্দিন বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও অন্তরে অন্তরে তুমি যে এখানকার কথা সকল সময় স্মরণ কর, তা অত্যন্ত সুসংবাদ। এটা তোমার আমাদের সঙ্গে অন্তরের মিলনের গভীরতার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। অতএব তোমার ওপর বিশ্বাস না রাখতে পারা বা নিরুৎসাহ হওয়ার কোনও প্রশ্নই আর ওঠে না। তুমিও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বৎ জনের হাতে আমার লেখা বইগুলো দিতে পারোনি বলে দুঃখিত হ'য়ো না। সুযোগ ও সুবিধামত ওখানকার ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করো।

একথা তুমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারো যে ওখানে বা অন্য কোন জায়গায়ই আমার লেখা বইয়ের প্রচারের জন্যে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। আমার একমাত্র ইচ্ছে, যে বাইরে হাজার রকমের বৈচিত্র্য থাকলেও অন্তরের দিক থেকে পৃথিবীর সকল মানুষই যেন এক ভূমিতে অবস্থান করে অর্থাৎ এক প্রাণ হয়। আমার রচনাবলী যা ছত্রে ছত্রে ভগবান বিজয়কৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের অমর জীবনাদর্শের লৈখিক রূপ মাত্র, তাদের জীবনী শক্তিতে একটা সাড়া জাগালেও জাগাতে পারে। এখানে প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে ভগবান বিজয়কৃষ্ণের শিক্ষা ও অনুভূতি অতিমানস হলেও যীশুখৃষ্ট ও শ্রীচৈতন্যের ভাবধারার সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ এবং পৃথিবীর সকল স্তরের আতঙ্কগ্রস্ত মানুষকে সার্ব্বজনীন প্রেম ও সত্যের ভিত্তিতে পুনরুজ্জীবিত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

কিন্তু তোমার পক্ষে বোধ হয় আমার বাংলা রচনা ইংরাজীতে অনুবাদ করান দুরূহ হবে। সেইজন্য ভাবছি আমি নিজে লিখে অনুলিপি তোমাকে পাঠাব যাতে তোমার সহায়তায় ওটা ওখানে প্রকাশ করা যায়। আমার কাজের সুবিধের জন্যে এ বিষয়ে তোমার মতামত অনতিবিলম্বে জানাবে।

অত্যন্ত সুখের বিষয় যে আমার বাংলা রচনা পড়ার জন্যে তুমি বাংলা শিখতে সমুৎসুক হয়েছো। আমার চিন্তাধারা জাতির শিখরে আজ যে দুর্দ্দিনের ঘনঘটা—প্রকৃত কল্যাণের খাতিরে অবশ্য যা সতত আহ্বানীয় তারই পরিপ্রেক্ষীতে সঙ্ঘ ও তার মুখপত্র 'বিবর্ত্তন' মারফৎ প্রচারিত হচ্ছে।

কাঠিয়াবাবা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাব। তোমার অন্তরের পিপাসা মেটাতে তাঁর মহৎ শিক্ষা ও কঠোর সাধনা সম্পর্কিত একটা ইংরাজী পুস্তিকা পাঠাতেও চেষ্টা করছি।

উপস্থিত আমার শরীর একটু ভাল। গাঙ্গুলী ও আমার অন্যান্য ছেলেরা তোমার প্রীতি ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ এবং কৃতজ্ঞ। তারা সকলে ভাল আছে।

পরের চিঠিতে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ কর।

পারের কড়ি সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত

'নেশন' বলেন—

This is a collection of letters written by Brahmachari Ganganandaji to some of his disciples and admirers mainly on topics relating to Sadhana or culture of the inner self. The author of these letters was initiated by the late Sri Sri Kuladananda Brahmachari, the well known spiritual guru who had his initiation from the late Sri Sri Bejoy Krishna Goswami. People who are not initiated to Hindu Sastras will also find in these letters much food for reflection. Modern materialism has been eating into the heart of the society. The necessity at the present moment, of books like the one under review, which tend to turn the eye from outward things into the inner self can not be over emphasised.

The letters are written in a very charming style and they show a depth of vision and universality of outlook without any secterianism.

'অমৃতবাজার পত্রিকা' বলেন—

The volume under review contains letters written by Brahmachari Ganganandaji to his disciples and admirers. The book has definitely an inspirational value of those who want to lead a holy life and have a glimpse of the infinite in this existence. You will have solutions to many of your spiritual problems too.

'যুগান্তর' বলেন—

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী তাঁহার অখংখ্য ভক্ত ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসু শিষ্যদের নিকট সময়ে সময়ে যে সব পত্র লিখিয়াছেন, তাহারই আংশিক সংগ্রহ আলোচ্য পুস্তকখানি। পত্রের রচয়িতা শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রশিষ্য এবং ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য। অধ্যাত্মসাধনার বিশেষ একটি ধারার তিনি বর্ত্তমানে ধারক ও বাহক। এতৎসত্ত্বেও পত্রের কোথাও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব ব্যক্ত হয় নাই। অধ্যাত্মসাধনায় গুরুভক্তি, নিষ্ঠা, বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য্য, ইত্যাদির স্থান যে কতখানি, পত্রে বিশেষভাবে তাহাই অভিব্যক্ত। ভাষা ও ভাবের উপর পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারীজীর প্রকৃতই প্রভূত অধিকার রহিয়াছে। জিজ্ঞাসু পাঠক এই পত্রাবলীতে প্রশ্নের উত্তর পাইবেন।

'আনন্দবাজার' বলেন—

এই পুস্তকে গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের লিখিত অনেকগুলি পত্র স্থান পাইয়াছে। পত্রগুলি উপদেশ ও সাবধানবাণী স্বরূপে ব্রহ্মচারীজীর বিভিন্ন শিষ্যের নিকট লিখিত। পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, যে সব প্রশ্নের উত্তরে এই সব পত্র লিখিত হইয়াছিল সেগুলি কোন না কোন সময়ে প্রত্যেকের মনেই উদিত হয়। সুতরাং সর্ব্বসাধারণের নানা সমস্যার সুমীমাংসারূপে এই গ্রন্থখানি আদর লাভ করিবে, আশা করা যায়। আধ্যাত্মিক জগতে সামান্য কিছু অনুভব করিয়াই অনেকে বিশেষ কোন কাজে প্রবৃত্ত হইতে গিয়া প্রতারিত হন, অনেক সময় অন্যকেও প্রতারিত করেন। ইহাদের কথাও ব্রহ্মচারীজী সহজ কথায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। সাধারণ গৃহস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধনপথের পথিক পর্য্যন্ত সকলেই এই পুস্তকের সহায়তা লাভ করিতে পারেন।

'প্রবর্ত্তক' বলেন—

ঠাকুর শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীশ্রীগঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী বিভিন্ন সময়ে তাঁহার শিষ্য ও অনুরাগীগণকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন

তাহার মধ্যে কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ সাধক-হৃদয়ে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হয় এই পত্রগুলিতে তাহার সুন্দর মীমাংসা করা হইয়াছে। পত্রগুলির ভাষা অতি প্রাঞ্জল—সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহুবিধ জটিল বিষয় অতি সরল ও সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিশেষভাবে ধর্ম্মার্থীগণের উদ্দেশ্যে লিখিত হইলেও সকল শ্রেণীর পাঠকই বইখানি পাঠ করিয়া সমধিক উপকৃত হইবেন। ব্রহ্মচারীর উদার আদর্শ, অসাম্প্রদায়িক ভাব এবং চরিত্রমাধুর্য্য তাঁহার প্রত্যেক পত্রে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

লিখনভঙ্গীর জন্য পত্রগুলি সাহিত্যপ্রসাদমণ্ডিত হইয়া পুস্তকখানি পত্রসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিবে। আমরাও ইহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

'উদ্বোধন' বলেন—

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী তাঁহার অসংখ্য ভক্ত ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসুদের নিকট যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন আলোচ্য গ্রন্থখানি ঐ পত্রগুলির আংশিক সংগ্রহ। পত্রের লেখক শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রশিষ্য এবং ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর সাক্ষাৎ শিষ্য। ইহাতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ মনোভাব নাই। ধর্ম্মভাব জাগরণ, সত্যের প্রতি অনুরাগ, ব্রহ্মচর্য্য-পালন, এই যান্ত্রিক যুগে অধ্যাত্মবাদের আবশ্যকতা প্রভৃতি গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্য।

'শ্রীসুদর্শন' বলেন—

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপথে চলিয়া যাঁহারা জীবনে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী তাঁহাদের অন্যতম; শুধু তাহাই নয়, গোঁসাইজী যে জ্ঞানের আলো জ্বালাইয়াছিলেন, সেই আলোকবর্ত্তিকা তুলিয়া ধরিয়া তিনি অজস্রের জীবন-পথ আলোকিত করিয়াছেন। তাহার জলন্ত প্রমাণ বর্ত্তমান গ্রন্থ। পত্রে পত্রে তাঁহার হৃদয়বত্তা, নিরহঙ্কার অন্তরের আনন্দ-স্পন্দন, সমবেদনা-মধুর সারগর্ভ উপদেশাবলী স্তরে স্তরে বিন্যস্ত

হইয়াছে। সাংসারিক ও ধর্ম্মজীবন সম্পর্কে বহু মূল্যবান উপদেশ এই পত্র সঙ্কলনে গ্রথিত হইয়াছে। গল্পচ্ছলে অতি কঠিন তথ্যও যে অতি সহজে প্রকাশ করা যায়, তাহা এই পত্রাবলীতে বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ধর্ম্মাথীমাত্রেরই এই গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য।

'আজ ও কাল' বলেন—

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের কাছে বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজীর লেখা চিঠিপত্রের সংগ্রহ হ'লো "পারের কড়ি।"...

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী তাঁর পূর্ব্বাপর মহাত্মাদের ন্যায় অজ্ঞান অবিশ্বাসী মানবমনে ভগবৎজ্ঞান ও ভক্তির আলো দেবার চেষ্টা করেছেন এই সব পত্র সমষ্টিতে, সুতরাং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই বই পড়তে পারেন এ বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়। ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজীর এই পত্র সমষ্টি "পারের কড়ি"র আমরা বহুল প্রচার কামনা করি। পরিশেষে এইটুকুই বলবার, অন্যান্য ধর্ম্মের বইয়ের মত এ বইও জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে বিচার বিবেচনা করার নয়।...এ বই শুধু ভক্তের আন্তরিক ভক্তি দিয়ে গ্রহণ করার, এ শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার।

'প্রণব' বলেন—

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীউ ও শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর আদর্শ ও সাধন-রহস্য সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য গ্রন্থকার তাঁহার শিষ্যবর্গকে যে সব উপদেশমূলক পত্রাদি লিখিয়াছেন সেইগুলিই সঙ্কলন করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারীজীর শিষ্যবর্গ গ্রন্থখানি পড়িয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন। অন্যেও ইহা হইতে বহু সদুপদেশ পাইবেন।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সাধন সঙ্ঘের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী

যোগিরাজ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ—

ঠাকুর শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ৪·০০

Jogiraj Kuladananda (বর্দ্ধিত ইংরেজী সংস্করণ) ৬·৫০

সদ্‌গুরু অবতার ভগবান বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর নিত্যসঙ্গী, অন্তরঙ্গ শিষ্য, নীলকণ্ঠ শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ সর্ব্বজনপূজ্য পুণ্যশ্লোক সিদ্ধ মহাত্মা। গ্রন্থকার ঠাকুর শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁহার প্রিয় সুযোগ্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শিষ্য। তিনি তাঁহার ও অন্যান্য ভ্রাতা-ভগ্নীর শ্রীগুরু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ অনেকগুলি ঘটনা আলোচ্য পুস্তকখানিতে সঙ্কলন করিয়াছেন। এই স্তরের সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জীবনে অসাধারণত্ব কিছু থাকিবেই। কিন্তু এই সব অসাধারণত্বেরও একটা রীতি আছে। প্রত্যুত এগুলি সাধারণ যোগবিভূতির মত নয়। এগুলি অপরকে বিস্মিত বা অভিভূত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত হয় না। ফলতঃ যোগাঙ্গ সাধকদের জীবনেই কর্ম্ম হিসাবে বিভূতির বিস্তার সম্ভব হইতে পারে। যাঁহারা যোগারূঢ় বা যোগসিদ্ধ তাঁহাদের পক্ষে সেগুলি কর্ম্ম নয়—শম অর্থাৎ শ্রীভগবানে নিষ্ঠাই সেইগুলির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, ভগবৎ শক্তিই প্রদীপ্ত হয়। অহঙ্কারের উর্দ্ধে আত্মার সেখানে ক্রিয়া। প্রেম, মৈত্রী এবং কৃপাই তাঁহাদের অন্তরের উৎস হইতে এইরূপে পরিস্ফূর্ত্ত হইয়া পরিবেশককে পবিত্র করে এবং চিন্ময়-রসে সকলের চিত্ত উজ্জ্বল করিয়া সনাতন ও সার্ব্বভৌম সত্যের সন্ধান দেয়। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জীবন এবং আচরণই অধ্যাত্ম শাস্ত্রের টীকা ও ভাষ্য।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অধ্যাত্ম-রসপিপাসু নরনারীমাত্রেই উপকৃত হইবেন, ভরসা পাইবেন এবং আনন্দ লাভ করিবেন।

নীলকণ্ঠ (শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের বিস্তৃত জীবনী)—
ঠাকুর শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ— ১ম খণ্ড ৭৲, ২য় খণ্ড ৬৲।

ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীকে ভবজ্বালা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পতিতপাবনী প্রাণগঙ্গা আনয়ণ করেন ভগবান বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। সেই পূতধারার সার্থক ধারক নীলকণ্ঠ শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। সেই সুরধুনীর সার্থক বাহক ঠাকুর শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। গোস্বামী প্রভু ও নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারিজীর সুযোগ্য প্রতিভূরূপে সেই অমৃতধারা অপূর্ব ভাব-ব্যঞ্জনায় তিনি পরিবেশন করেছেন এই মহাগ্রন্থের মাধ্যমে।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আছে ব্রহ্মচারিজীর দুর্জ্জয় সংগ্রাম ও অমর্ত সাধনার বিচিত্র রূপায়ণ, আর দ্বিতীয় খণ্ডে আছে তাঁর মহাসিদ্ধি ও সদ্‌গুরু জীবনের লীলামৃত। ধর্ম্মজীবনের প্রতিটী নিগূঢ় সমস্যা ও তার সহজ সমাধান এই গ্রন্থের মহাসম্পদ। সংশয়াচ্ছন্ন অন্তরের সব জিজ্ঞাসা, আর্তপ্রাণের সব চাওয়া-পাওয়ার সন্ধান মিলবে এখানে। নীলকণ্ঠ মহাদেবের ন্যায় আকণ্ঠ হলাহল প্রাণ করে ব্রহ্মচারিজী যে অমৃত বর্ষণ করেন, সেই লীলাতত্ত্বের স্বাক্ষর বহন ক'রে এই মহাগ্রন্থ ধর্ম্মজগতের অমূল্য সম্পদ।

Saint Bijoykrishna—Brahmachari Gangananda 2·00

A unique contribution to the cause of social, political and spiritual culture. A short life sketch of Bhagaban Bijoy-krishna Goswami is a desideratum for the non-Bengali Indian and the English speaking world. The value of the work has been greatly enhanced by the addition of a short life-sketch of his prominent disciple Srimat Kuladananda

Brahmachari Maharaj as well as by the preface and foreword written by competent leaders of Sri Sri Sadguru Sadhan Sangha, a centre of moral, intellectual and religious culture.

ভগবান বিজয়কৃষ্ণ বলেন— ০·৬০

ভগবান বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও অমৃতবাণী সম্বলিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কুলদানন্দ— ১·৫০

নীলকণ্ঠ শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবন গাথা ও উপদেশ।

Gospel from Sri Sri Sadguru Sanga—

Srimat Gangananda Brahmachari Maharaj 2·00

Sri Sri Sadguru Mahima is the selected passages of "Sri Sri Sadguru Sanga", the immortal contribution of Srimat Kuladananda Brahmachari Maharaj to the literature of the world. This book is translated from Sri Sri Sadguru Mahima.

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু মহিমা— ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড—প্রত্যেকটি ৬০ পয়সা

"শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ" গোস্বামীজীর জীবনী সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকে। আলোচ্য পুস্তক তিনটী উক্ত গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া নিত্য পাঠ্যরূপে লিখিত।

উতরাই—(পারের কড়ির হিন্দী সংস্করণ) মূল্য ৪·০০

সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী মাসিক পত্রিকা "কল্যাণ"এর সম্পাদক শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দারজীর সপ্রশংস ভূমিকাসহ—ভারতের বহু সাধু মহাত্মা মনীষীগণ কর্ত্তৃক এবং বিখ্যাত পত্রিকা সমূহে উচ্চ প্রশংসিত।